কোচবিহারের ইতিহাস

লেখক ঃ ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

KOCHBIHARER ITIHAS

(History of Cooch Behar with up-to-date description)
by Bhagabati Charan Bandyopadhyay, edited by Dr. Nripendra Nath Paul and published by Anima Prakashani 141 Keshab Ch. Sen Street, Calcutta-700009, West Bengal on September 1987

প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩৯৪

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীনীরজ বিশ্বাস

মুদ্রাকর : শ্রীকুশধ্বজ মান্না, মান্না প্রিণ্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬

বিষয়-সূচী

লেখকের সম্পাদিত ও অনূদিত কয়েকটি বই ঃ

ভারতের রূপকথা

গোসানী মঙ্গল

ক্যাম্বেলের চোখে কোচবিহার

চণ্ডীকার ব্রতকথা (যুগ্মভাবে)

মহারাজ বংশাবলী

মৈষাল বন্ধু

কোচ কিংস অব কামরূপ

সবিনয় নিবেদন

অতীত কাহিনীকে ধরিয়া রাখিবার কেন্দ্রবিন্দু হইল ইতিহাস। বাঙ্গলা ভাষার অভিধান গ্রন্থে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিতেছেন যে—ইতিহাস [ইতিহ্ (পরম্পরাগত উপদেশ) + অস্ (হওয়া) + অ (ধি)-যাতে পরম্পরাগত উপদেশ আছে] বি, পূর্ব বৃত্তান্ত; পুরাবৃত্ত; প্রাচীন কথা; ইতিবৃত্ত history; অতীতের কাহিনী; যা হইয়া গিয়াছে তার যথাযথ চিত্র। কিন্তু সেই প্রাচীন ঘটনাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা না থাকিলে কালের করাল গ্রাসে একদিন সব উপাদান হারাইয়া যায়। ইহাই তো স্বাভাবিক। প্রাচীন তথ্য আমাদের হাতের কাছে থাকিলে বর্তমানের সংগে তুলনা করিবার সুযোগ ঘটে এবং বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ইতিহাসকে পূর্ণতা দানের প্রয়াস করা চলে। ইতিহাস হইল জাতির গর্বের বস্তু। লোকশিক্ষার প্রচুর উপাদান আমাদের এই পুরাতন কথায় ছাড়াইয়া আছে। ইতিহাস রচনার ধারাকে বহু ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। আমি এইখানে কেবলমাত্র কোচবিহারের আঞ্চলিক ইতিহাসের কিছু উপাদান তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের দেশে ইতিহাস লিখিবার ব্যাপক প্রচার খুব বেশী দিন পূর্বে হয় নাই, এমত অবস্থায় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার অবস্থা আরও করুণ। কোচবিহার রাজ্যের কয়েক শত বৎসরের অতীত কথা আজ অবধি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় নাই। খণ্ড খণ্ড চিন্তাকে একত্রিত করিয়া দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক যথাযথ চিত্র আমাদের কাছে তুলিয়া ধরা হয় নাই।

আমি এই গ্রন্থের প্রথমাংশে কোচবিহার চর্চার প্রাচীন দলিল "কোচবিহারের ইতিহাস" পুনর্মুদ্রণ করিলাম। বইখানির লেখক ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮২ সনে প্রথম কোচবিহার স্টেট প্রেস হইতে মুদ্রিত এই বইখানি প্রকাশের পর কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আপত্তি দেখা দেওয়ায় ১৮৮৪ সনে ইহার দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। লেখক কোচবিহার রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। গ্রন্থটিতে লেখকের বিস্তৃত ভূমিকা হইতেই তৎকালীন ইতিহাস রচনার সমস্যা বিষয়ে একটি চিত্র পাওয়া যায়। আমার সংগৃহীত বইটিও দ্বিতীয় সংস্করণ। লেখকের বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াও কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। একজন চাকুরীজীবীর

স্থায়ী ঠিকানা নিরূপণ করা কষ্টকর। তিনি এইখানে রাজকর্মচারী হিসাবে আসিয়াছিলেন এবং তাহার পর কোচবিহার ছাড়িয়া চলিয়া যান। তৎকালীন চিন্তাভাবনার সংগে বর্তমানে অনেক কথারই অমিল চোখে পড়ে। আমি অপরিবর্তিত অবস্থায় বইটি পুনঃ প্রকাশ করিলাম। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এই বইখানিতে কি লেখা হইয়াছিল তাহা সর্বসাধারণের বিচার বিশ্লেষণের জন্যই পুনঃ প্রকাশ করা হইল। এই বইখানিতে কোচবিহারের পুরাতন অনেক তথ্যই পাওয়া যাইবে। তৎকালীন কোচবিহারের অবস্থা, জলবায়ু, নদনদী, অধিবাসী, জীবজন্তু, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি আমরা পাইতে পারি। কোচবিহারের সুশৃঙ্খল ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই বইটি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয়াংশে 'সংযোজন' অধ্যায়ে আমার কিছু চিন্তা-ভাবনার ফসল রহিয়াছে। তবে তাহা কোন বিশেষ বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা নহে। যেইখানে যে তথ্য পাইয়াছি তাহা সংরক্ষণের জন্য তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে। এই অধ্যায়ে প্রবন্ধগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতিপূর্বেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। লেখাগুলির বিষয়ে কিছু কিছু পাঠকের উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া সংকলিত আকারে তুলিয়া ধরিলাম। আমি ঐতিহাসিক নই। সেইজন্য পরিবেশিত তথ্যগুলির মূল্যায়ণ কেবলমাত্র একটি দিক্ হইতেই করা যাইবে না। এই অধ্যায়ে কোচবিহার বিষয়ক যেমন বেশ কিছু হালকা অথচ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আছে তেমনি গুরু-গম্ভীর বিষয় সমাবেশেরও চেষ্টা করিয়াছি। এককথায় বিষয়গুলির মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা রহিয়াছে। আমার এই সংগৃহীত তথ্যগুলিই শেষ কথা নয়। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যেইখানে যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, এই টুকরো সংবাদ-গুলির মধ্য হইতেই কিছু কিছু তথ্য আগামী দিনে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সহায়ক হইবে।

আমার এই গ্রন্থটি সম্পাদন এবং সংযোজনের কাজে বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক ও আমার দীক্ষাচার্য ডঃ সুবোধরঞ্জন রায় স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা ও প্রয়োজনীয় উপদেশদানে প্রচেষ্টার যাত্রাপথকে সুগম করিয়াছেন। কোচবিহার হইতে প্রকাশিত 'পৌণ্ড্রদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতরুণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় বিভিন্ন সময়ে আমাকে তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া এবং

নির্বাচনী ফলাফলের বেশ কিছু অংশ তাঁহার পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমার প্রচেষ্টার উৎসাহদাতা সাহিত্যিক শ্রীনীরজ বিশ্বাস প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বহুবিধ গুণের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। ইহা ছাড়াও কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কোচবিহার গ্রন্থপ্রকাশনা সমিতি সহ বহু ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট তথ্য ও সহায়তার জন্য হাত পাতিয়াছি। প্রয়োজনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদির সাহায্য লইয়াছি। এইখানে তাহার বিস্তৃত তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রহিল।

আঞ্চলিক ইতিহাসের বাজার সীমিত হওয়া সত্ত্বেও অণিমা প্রকাশনীর পক্ষে সহৃদয় শ্রীদ্বিজদাস কর ও শ্রীজগবন্ধু সাহা যেইভাবে পরম প্রিয়ের মত আগাইয়া আসিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাই।

পুস্তকখানি তথ্যানুসন্ধানী, গবেষক, জ্ঞানপিপাসু, সুধীমহল এবং কোচবিহার অনুরাগীদের মনে যদি কিঞ্চিৎ সাড়া জাগাইতে পারে, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে বলিয়া মনে করি।

হাজরাপাড়া
কোচবিহার

নৃপেন্দ্রনাথ পাল

মূল গ্রন্থ

HISTORY OF COOCH BEHAR

By

BHAGAVATI CHARAN BANERJEE

Sub-Deputy Superintendent of Schools
in Cooch Behar.

কোচবিহারের ইতিহাস

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

COOCH BEHAR

Printed at the Cooch Behar State Press
1884.

TO HIS HIGHNESS
THE MAHARAJAH
NRIPENDRA NARAYAN
BHUP-BAHADOOR
OF
COOCH BEHAR

The work
is most respectfully Dedicated

By

His obliged and grateful Servent.

THE AUTHOR

বিদ্যোৎসাহী কোচবিহারাধিপ

শ্রীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর

মহোদয় সমীপেষু।

মহারাজ! অদ্যাপি কোচবিহারের কোনও একখানি ইতিবৃত্ত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত না হওয়াতে, এতদ্দেশীয়দিগের একটী বিশেষ অভাব আছে বলিতে হইবে। আমি এই অভাব দূরীকরণ মানসে, প্রচুর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছি। যদিও অকিঞ্চিৎকরত্ব নিবন্ধন, ইহা ভবদীয় গৌরবান্বিত নামের সংশ্রব লাভে নিতান্তই অযোগ্য, তথাপি কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সামান্য উপহারও সজ্জনগণ আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং স্পর্শ মণি সংযোগে নিতান্ত অনুপাদেয় বস্তুও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বসাধারণের নিকট আদৃত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাস ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই, আপনার চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গ করিলাম।

বিনয়াবনত

শ্রীভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

LIST OF BOOKS AND AUTHORS CONSULTED.

1. Colonel Dalton's Descriptive Ethnology of Bengal.
2. Doctor Latham's Ethnology of India.
3. Mr. Brian Hodgson's Essay on Koch, Bodo and Dhimal tribes.
4. Dr. Francis Buchanan's History of Kamroop and Rungpur &c. &c.
5. W. W. Hunter's statistical returns of Cooch Behar, Rungpur and Jalpaigury, &c. &c,
6. Captain T. H. Lewin's account of Cooch Behar.
7. Turner's Bhootan.
8. Robinson's Assam.
9. Mr. E. Glazier's report on Rungpur.
10. Journals of the Royal Asiatic Society and Asiatic Society of Bengal.
11. Asiatic Researches.
12. Annual administration reports of Cooch Behar from 1864-65 to 1882-83.
13. Major Jenkins' report on Cooch Behar.
14. Messrs Lawrence Mercer and John Lewis Chauvet's report on Cooch Behar.
15. Selected records of Bengal Government.
16. Aitchison's treaties of India.
17. Mr. Scott's sketch of Bhutan.
18. Thomas. A. Becket's report on the settlement of Cooch Behar.
19. Rajopakhyan or History of Cooch Behar translated in English by Mr. Robinson.
20. A Bengali History of Darjiling.
21. A Bengali History of Bijni.
22. A Geography of Bengal by Baboo Dina Nath Sen.
23. Sir Richard Temple's remarks on the administration of Cooch Behar, dated 6th July 1875.
24. The Cooch Behar Gazette.

&c. &c. &c.

বিজ্ঞাপন।

প্রায় তিন বৎসর গত হইল আমি "কোচবিহারের বিবরণ" নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা এতদ্দেশীয় পাঠশালা সমূহের ছাত্র বৃন্দের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে প্রণয়ন করি। তদ্দর্শনে এ রাজ্যের দেওয়ান, শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর মহোদয়, আমাকে কোচবিহারের একখানা সুশৃঙ্খল ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেন এবং আমিও তদনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। কিন্তু কিছুকাল পরে এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়ি যে, প্রায় এক বৎসরকাল আর ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। পরে পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়া এখন তাহা মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইলাম।

ভারতবর্ষের মধ্যে এরূপ রাজ্য অতি বিরল, বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাহার যথাযথ ইতিহাস লিখিত হয় নাই। এমনকি বঙ্গদেশের অধিকাংশ জমিদার পরিবারের নিজ নিজ বংশাবলী সম্বলিত ইতিহাসও দেখিতে পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, কোচবিহার একটী বহুকালের স্বাধীন রাজ্য কিন্তু বাঙলা কি ইংরেজী ভাষায় তাহার সম্যক্ বিবরণ এ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। রাজোপাখ্যান নামে একখানা ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই এবং তাহাও অকিঞ্চিৎকর কাল্পনিক উপন্যাসেই পরিপূর্ণ, তৎপাঠে দেশের প্রকৃত অবস্থা কিছুই অবগত হওয়া যায় না। আমি এই অভাব নিবারণ মানসে এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এ রাজ্যে আমি যে কার্য্যে আছি, সেই কার্য্যের স্বভাবেই আমাকে দিবারাত্রি স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে হইতেছে। কোচবিহারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান ও তাহার অধিবাসীদিগকে দেখিয়াছি। অসূর্য্যস্পশ্য পথে গতিবিধি করিয়া, জঙ্গলময় অনেক স্থানও দেখিয়াছি। পৌরাণিক কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অনেক দেখিয়াছি। যে স্থানে যে বিবরণ পাইয়াছি, সংগ্রহ করিতে ত্রুটী করি নাই। স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া ৪।৫ বৎসরের পরিশ্রমে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। যে কোনও পুস্তকে কোচবিহার সম্বন্ধীয় কোন ঘটনা উল্লিখিত আছে, তাহাও অধ্যয়ন করিতে ত্রুটী করি নাই। যাহা জানিয়াছি পাঠকগণের নিকট তাহা উপস্থাপিত করিলাম। তাঁহারা হয়ত পড়িবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় চাহিবেন, তাহা আমার এই পুস্তকে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যাহা আছে তাহা একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই, আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এ রাজ্যের দেওয়ান, শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর মহোদয়, বিশেষ যত্ন না করিলে, আমি এই কার্য্যে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। আমি যখন যে প্রকারের সাহায্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাই তিনি অম্লান বদনে প্রদান করিয়াছেন। সেই সদাশয়ের আন্তরিক যত্ন, উদ্যোগ এবং উৎসাহই আমাকে সম্যক প্রোৎসাহিত করিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি এবং এ রাজ্যের ফৌজদারী আহেলকার শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, অপরিসীম পরিশ্রম সহকারে পুস্তকখানা আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন। ইঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

এতদ্ব্যতীত আমার কতিপয় বন্ধু কর্ত্তৃক আমি যে উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য আর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যক করে না।

কোচবিহার
১৫ই মাঘ, ১২৮৯ সন

শ্রীভগবতী চরণ শর্ম্মা।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

কোচবিহারের ইতিহাস দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এবারে অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে, মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ অনেকগুলি বর্ণগত অশুদ্ধি ছিল, তাহা এবারে সংশোধন করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হইলে, এ দেশীয় অনেক লোক কোন কোন অংশ প্রচারিত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। বিশেষতঃ যে অংশে, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি এবং অধিবাসীদিগের বিবরণ বিবৃত হইয়াছিল, তাহাতেই অনেককে আপত্তি উত্থাপন করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিতে পারি যে, কোন ব্যক্তি, কি সম্প্রদায় বিশেষকে অপমানিত করা দূরে থাকুক, তাহাদের অসন্তুষ্টি উৎপাদন করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই ইংরেজীর অনুবাদ। শ্রীযুক্ত কুমার গোবিন্দ নারায়ণ সাহেবের অভিপ্রায় মত, আমরা এবারে সেই সকল অংশ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য এবার পুস্তকের মূল্য বার আনা নির্দ্দিষ্ট করা গেল।

৩১ আষাঢ়
১২৯১ সন

শ্রীভগবতী চরণ শর্ম্মা।

উপক্রমণিকা।

অনাবশ্যক বোধেই হউক অথবা অনভিজ্ঞতার জন্যই হউক, হিন্দু কি মুসলমান রাজত্বকালে বোধ হয় ভারতবর্ষ কি তদন্তর্গত কোনও প্রদেশের যথাযথ ভৌগোলিক কি ঐতিহাসিক সমীচীন বিবরণ কিছু লিখিত হইয়াছিল না, অথবা লিখিত হইয়া থাকিলে, কালে তাহা বিলোপ হইয়াছে, কিন্তু অধুনা তত্তাবদবধারণ একরূপ সুদূর পরাহত। যে সময়ে প্রাচীন হিন্দুগণ, আধুনিক হিন্দুদিগের ন্যায় পরকীয় কঠিন শাসনে নিতান্ত হীন তেজ, হীন প্রাণ ও হীন সাহস হইয়া না পড়িয়াছিল, যখন তাঁহারা অধীনতার দৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধপদ হইয়া, একমাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থলে, নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতে বাধ্য ছিলেন না; যাঁহারা ভুজবীর্য্যে বলদর্পিত প্রবল শত্রুকেও অকাতরে সুদূরে বিতাড়িত করিতে পারিতেন, স্বাধীনতার প্রবলোৎসাহে যাঁহাদের স্বাধীন আর্য্য মনের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত ছিল, বস্তুতঃ ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল, বিদেশী নির্দ্দয় হস্তে দৃঢ় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল না, তখন হিন্দুস্থানে বিদ্যার বিমলজ্যোতিঃ প্রতিভাত হইয়া হিন্দুগণের যশঃ সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়াছিল। এমন বিষয় নাই যাহাতে হিন্দুগণ হস্তক্ষেপ না করিয়াছিলেন। অথচ যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই এতদূর পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, কোনও কালে কোনও দেশে এতাদৃশী অবাঙ্মনসকীর্ত্তিতা সমুন্নতি প্রদর্শিত হয় নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্র সংক্রান্ত অভাবনীয় বিষয় নিচয়ের গূঢ়তম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, তৎসমস্তের যে অতি পরিষ্কার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই জ্ঞানালোক সম্প্রোজ্জ্বল ঊনবিংশ শতাব্দীরও মহদালোচনীয় স্থল হইয়া রহিয়াছে। উহা যে কত পুরুষানুক্রমিক তথ্যানুসন্ধিৎসা ও অভিজ্ঞতার ফল, তাহা অধুনাতন লোকের মনে ধারণা করাও দুষ্কর। এরূপ তীক্ষ্ণ মনীষা সম্পন্ন হিন্দুগণ যে ভুগোল ও ইতিহাসে একবারেই মনোযোগ বিধান করিয়াছিলেন না, মন এরূপ বিশ্বাস করিতে চাহে না। বোধ হয় তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব ও উন্নতি সময়ে, উভয় বিষয়েরই বিলক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল, তাঁহারা ঐ উভয়বিধি বিদ্যাতেই সম্যক কৃতবিদ্য ছিলেন এবং ধ্রুব বিশ্বাস হয়, তত্তদ্বিষয়ক পুস্তকেরও অভাব ছিল না। কিন্তু হিন্দু বিদ্বেষী মুসলমান রাজগণের, অসারতা, মূর্খতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও হিন্দুশ্রীকাতরতায় তৎসমস্ত অগ্নিসাৎ বা জলসাৎ হইয়াছে। স্বাধীনতার বিলোপে হিন্দুমনের নিস্তেজস্কতা প্রতিপাদিত হইলে, আর কেহও কোন বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে সাহস

পাইতেন না এবং অনেক স্থলে বিশেষ প্রয়াসেও উহা সুসম্পাদিত হইয়া উঠিত না, কেহ কোন গ্রন্থ লিখিতেন না, কাজেই বিলুপ্ত পুস্তকাবলীর শূন্য স্থান আর পরিপূরিত হইল না। গ্রন্থ না লিখিবার অন্যবিধ কারণও ছিল। পুস্তক প্রস্তুত হইলেই তাহা মুসলমানগণের অত্যাচারে বিনষ্ট হইবে নিশ্চয় জানিয়া, কেহই পুস্তক লিখার অনর্থ পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত হইতেন না। বিশেষতঃ ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি মানসিক উৎকর্ষতার বিশেষ পরিচায়ক নহে বলিয়া, তাঁহারা উহাতে কতক কতক ঔদাসীন্যই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক যে কারণেই হউক হিন্দুগণের প্রণীত ঐরূপ কোন গ্রন্থ দেখা যায় না।

বিলাসী মুসলমান রাজগণের রাজত্বকালে বিদ্যার তাদৃশী আলোচনা ছিল না, কাজেই কোনও বিষয়েই গ্রন্থের বহুল প্রচার দেখা যায় না। আরব ও পারস্য দেশে যে সকল পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তৎ পাঠেই তাঁহারা একরূপ তৃপ্ত থাকিতেন। এবং সে সমস্ত পুস্তক পাঠই বিদ্যালোচনার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন। প্রকৃত বিদ্যানুরাগী সদাশয় আকবর সম্রাটের সময়ে, একখানা ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তৎসাময়িক যুদ্ধ বৃত্তান্তই বাহুল্যরূপে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং যেখানে কোনও প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটনা হয় নাই, তাহার উল্লেখ মাত্রও নাই। তৎ পাঠে বাস্তবিক কোন প্রদেশ বিশেষের বিশেষ বিবরণ কিছু অবগত হওয়া যায় না। কিম্বদন্তী পরম্পরায় ও লৌকিক গাথায় অনেক দেশের অনেক বিবরণ পর পর পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। সত্য হউক মিথ্যা হউক তদনুসরণ করিয়াই, কতক পৌরাণিক বিবরণ জানা গিয়া থাকে। সম্প্রতি ইংরেজ মহাত্মাগণের অযাচিত প্রসাদে অনেক দেশেরই অধুনাতন অনেক বিবরণ অবগত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহারাও আমাদের মত অনভিজ্ঞ। সকলকেই জনশ্রুতি মূলে সম্ভাবনায়, মন স্থির করিতে হইয়াছে। সুতরাং পৌরাণিক ইতিহাস সম্বন্ধে, দৃঢ়তার সহিত কিছুই বলা যাইতে পারে না। তদ্বিষয়ে দৃঢ় উক্তি কেবল ধৃষ্টতা প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে দেশেরই বিবরণ লিখিতে যাওয়া যাউক না কেন, প্রবাদ আছে পূর্ব্বকালে এস্থানে এমন ছিল, ঐ স্থানে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল ইত্যাদি লিখিতে হইবে। নিশ্চয়তার সহিত কিছুই লেখা যাইতে পারে না। উপরোক্ত কারণ বশতঃই দ্বিতীয় খণ্ডে "কাল্পনিক সময়" এই শিরোনাম প্রদত্ত হইয়াছে।

PART—I

GENERAL DESCRIPTION

প্রথম খণ্ড

সাধারণ বিবরণ

কোচবিহারের ইতিহাস

অবস্থান।

কোচবিহার ২৫°৫৭´৪০" এবং ২৬°৩২´৩০" উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৮° ৪৭´ ৪০" হইতে ৮৯° ৫৪´ ৩৫"। ১৮৮১ সনের গণনায় লোকসংখ্যা ৬০০২৪৬ স্থির হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩১০৭৮৯ পুরুষ এবং ২৯০১৫৭ স্ত্রীলোক। রঙ্গপুর এবং জলপাইগুড়ীর অন্তর্গত ছিট সমূহ সহিত পরিমাণ করিলে এ রাজ্যের পরিমাণ ফল ১৩০৭ বর্গ মাইল।

থানার নাম	পরিমাণ	ছিটের পরিমাণ	মোট
হল্‌দিবাড়ী	৬৫ বর্গ মাইল	২৪.১১ বর্গ মাইল	৮৯.১১ বর্গ মাইল
মেকলীগঞ্জ	১০৩ "	১.৫ "	১০৪.৫ "
মাথাভাঙ্গা	৩৪২ "	৩.১ "	৩৪৫.১ "
দীনহাটা	২৬৭ "	৩.৩ "	২৭০.৩ "
সদর	৩০৯ "	০ "	৩০৯ "
তুফানগঞ্জ	১৮৯	০ "	১৮৯ "
			১৩০৭.০১ বর্গ মাইল

কোচবিহারের উত্তর সীমা ভোটান্ত প্রদেশ,* পূর্ব্ব সীমা ভোটান্ত প্রদেশ, গোয়ালপাড়া ও রঙ্গপুর। শোণকোষ এবং গদাধর নদী অনেক স্থান পর্য্যন্ত এ রাজ্যের সীমাস্থলে অবস্থিত। দক্ষিণ সীমা রঙ্গপুর, পশ্চিম সীমা জলপাইগুড়ী ও রঙ্গপুর।

---

* এই প্রদেশ পূর্ব্বে ভোটান রাজ্যের অধিকৃত ছিল। ১৮৬৪।৬৫ সনের যুদ্ধে ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা জলপাইগুড়ী জেলার অন্তর্গত।

ভূমির প্রকৃতি।

কোচবিহারে কোন পর্ব্বত নাই, ইহা সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। নদনদী প্রসবিনী হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বিধায় এ প্রদেশ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদনদী দ্বারা পরিপূর্ণ। এখানকার মৃত্তিকা বালুকাময় অথচ অত্যন্ত উর্ব্বরা। কঠিন মৃত্তিকা একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিলেই হয়। নদীগর্ভ নিরবচ্ছিন্ন বালুকা ও প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ। বালুকা মিশ্রিত হওয়ায় মৃত্তিকার কাঠিন্য একবারে নাই। কাজেই কর্ষণ কার্য্য অতি সহজে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকা শিথিল হওয়াতে নদী প্রবাহ নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এজন্য এ প্রদেশে মরা নদীর সংখ্যা অধিক। অনবরত প্রবাহ পরিবর্ত্তন করাতে নদীর উভয় পার্শ্বস্থ স্থান সমূহ বালুকাপূর্ণ ও অনুর্ব্বর, তথায় শস্যাদি জন্মে না, নিয়তই অন্যান্য জঙ্গলে আবৃত থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে প্রায় সমুদয় নদীর উভয় তীরেই কেশে ও নল খাগড়ায় পরিপূর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে কেশেবন ধবলবর্ণ ফুল সমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যায়; এই সকল স্থান ১০।১৫ বৎসরের মধ্যেই জঙ্গলের গলিত পত্র ফুল ও ফলের প্রভাবে উর্ব্বরা হইয়া শস্যোৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়। কোচবিহারের উত্তর পশ্চিম ভাগ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগ ক্রমশঃ গড়ে প্রতি মাইলে ১ ফুট নিম্ন সুতরাং নদনদী সমস্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব বাহিনী।

এদেশের প্রাকৃতিক গঠন সম্বন্ধে কাপ্তান লুইন সাহেব নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতি পুরাকালে ভারত মহাসাগর হিমালয়ের পদতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, মধ্য আসিয়ার মালভূমি হইতে অনেক নদনদী হিমালয় পর্ব্বতস্থ গুহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পর্ব্বতস্থ অনেক পদার্থ নিম্নে আনয়ন করতঃ সমুদ্রগর্ভে বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ সৃজন করে। এইরূপে সমুদ্র গর্ভ যখন ব-দ্বীপে পরিণত হয়, তখন স্থানে স্থানে বালুচরের সন্নিবেশ বশতঃ একমাত্র নদী স্রোতেই বহুস্রোতে বিভক্ত হয়। এই সকল ব-দ্বীপ বর্ষাকালে ডুবিয়া যাইত, তন্নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নূতন মৃত্তিকা সংস্থাপিত হওয়াতে ঐ সকল স্থান অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছিল। নদী সকল পার্ব্বতীয়প্রদেশের নিকট অত্যন্ত বেগবতী থাকে, এই নিমিত্ত কোচবিহারের নদী সকলের গতি কোনক্রমেই রোধ করা যায় না এবং প্রত্যেক বৎসর নূতন নূতন স্থান দিয়া প্রবাহিত হয় কখন বা ঘটনাক্রমে পূর্ব্বস্থানে থাকে। তীরবর্ত্তী বালুকা ও মৃত্তিকাতে নদীর গতি কোনপ্রকারে প্রতিরোধ করিতে পারে না, এই নিমিত্ত কখন্ কোন্ স্থান নদীগর্ভস্থ হয় তাহার কোন স্থিরতা থাকে না; বৃক্ষাদিও এই কারণে অধিক বড় হইতে পারে না, যেহেতু

অধিক কাল বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই নদীগর্ভস্থ হইয়া যায়। আমাদের বিবেচনায় এই মত সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত নহে। ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, চট্টগ্রাম নগর হইতে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জিলার মধ্য দিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে ঢাকা পর্য্যন্ত, তৎপর ঢাকা হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত এবং ঐ স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে কাটোয়া পর্য্যন্ত, পরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে সরিয়া বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়া বালেশ্বর নগর পর্য্যন্ত এক রেখা কল্পনা করিলে, ঐ রেখাই পূর্ব্বে সমুদ্র তট ছিল এমত অনুমিত হয়। তাঁহারা এই বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ ইহাও বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন কোন হিন্দু শাস্ত্রে দক্ষিণাংশস্থিত কোন স্থানের নামের উল্লেখ নাই। আর প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ভূগোলবিদ্ পণ্ডিতেরা ঐ রেখার উত্তরস্থিত গৌড়, রাজমহল, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি কতকগুলি নগরের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, যে বাণিজ্যার্থ অর্ণবপোত সকল ঐ সমুদয় স্থানে আগমণ করিত। বিশেষতঃ সমুদ্র তট হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত স্তর সংস্থান প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলেও কাপ্তান লুইনের মতের পোষকতা করা যাইতে পারে না। এ প্রদেশের ন্যায় ইহার দক্ষিণ দিকের ভূমি বালুকাময় নহে। আমাদের বিবেচনায় ইহার একমাত্র কারণ এই যে, পর্ব্বতান্তর্গত প্রস্তরগুলি বৃষ্টি ও জল-প্রপাতের বেগে চূর্ণীকৃত হইয়া নদীর জলের সঙ্গে সমভূমিতে অনবরত আনীত হইয়া, নানা প্রকার আটাল মাটী ও বালুকা রূপে পুরাতন স্তর সমুদয়ের উপরে সংস্থাপিত হইয়াছে ; এ প্রদেশের স্থানে স্থানে পুরাতন মৃত্তিকাও প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু নদী-সমূহের তলভাগ, পার্শ্ব অথবা নিকটবর্ত্তী স্থানে ভূপৃষ্ঠোপরি কেবল নূতন মৃত্তিকা লক্ষিত হইয়া থাকে।

জলবায়ু।

কোচবিহারের জলবায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর নহে। নদ নদী সকল নিরবচ্ছিন্ন বালুকা ও প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ থাকায় জল অতিশয় শীতল ও পরিষ্কার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বৎসরে তিন চারি মাসের অধিককাল গভীর ও প্রভাব শালিনী না থাকিলেও বার মাসই কথঞ্চিৎ চলিতে থাকে। তাহা বদ্ধ জল নয়, স্রোত বিশিষ্ট এবং স্ফটিকের তুল্য পরিষ্কার। তন্নিকট বাসী জন সমূহ ঐ জল দ্বারা পানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। নদীর জল যে স্থানে ৪।৬ অঙ্গুলীর অধিক গভীর নহে সে স্থান অঙ্গুলি দ্বারা খনন করিলেই অল্প সময়ের মধ্যে অধিক

পরিমাণ জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সকল স্থান নদী হইতে বহু দূরে অবস্থিত, তজ্জনপদ বাসী লোকেরা আপন আপন বাটীতে অথবা গ্রামের মধ্যে যে যে স্থানে সর্বাপেক্ষা নিম্ন তথায় কূপ খনন করিয়া লয়। অল্প পরিমাণ খনন করিলেই জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জল পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, বৃহদায়তন দীর্ঘিকা বা অন্যান্য কৃত্রিম জলাশয় অপেক্ষা উল্লিখিত কূপ জলই উৎকৃষ্ট। এই সকল গ্রাম্য কূপ মৃন্ময় বা কাষ্ঠময় পাট অথবা ইষ্টক কিম্বা প্রস্তর দ্বারা রচিত হয় না। উহা এদেশে চুয়া নামে খ্যাত। বোধ হয় চোয়ান শব্দ হইতে চুয়া নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। বর্ষাকালে সমস্ত নদ-নদীই সমধিক বেগশালিনী হইয়া পড়ে। এই কালে প্রায়ই হিমালয় পর্ব্বতে অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে নদীগর্ভ পূর্ণ থাকে ও জলস্রোত প্রবল বেগবিশিষ্ট হইয়া উঠে। এই সময়ে জল বালুকা মিশ্রিত হওয়াতে কিছুকাল না রাখিয়া পান করা যায় না।

কোচবিহারে উত্তরের বায়ু বিরল, দক্ষিণের বায়ু নাই বলিলেই বলা যায়। বোধ হয় গগনস্পর্শী হিমগিরি উক্ত উভয় বায়ু সঞ্চারের অন্তরায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগের বায়ু সমধিক প্রবল এবং পর্য্যায়ক্রমে প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত একাদিক্রমে পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ পূর্ব্ব বায়ু ভোগ করিলে গাত্র বেদনা ও কখন কখন জ্বর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পশ্চিম বায়ু বসন্তের প্রারম্ভে বহিতে আরম্ভ করে। এই বায়ুর প্রবাহ দ্বারা শীতের তিরোভাব এবং গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়। গ্রীষ্মকালে পশ্চিম বায়ু কখন কখন অতিশয় উষ্মভাব ধারণ করে। চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত না হওয়াতে বাতাবর্ত্ত ও ঘুর্ণি বায়ু প্রায় দৃষ্ট হয় না।

সাধারণতঃ বিবেচনা করিতে গেলে কোচবিহারে শীত ও গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতু নাই। আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত শীত ও চৈত্র হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের অধিকার। চৈত্র এবং বৈশাখ মাসেও রাত্রি যোগে অল্প পরিমাণ শীত অনুভব হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে রোমজ বা কীটজ বস্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক করে। শীতকালে মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকাল হইতে বেলা আট ঘটিকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সূর্য্যোদয় অনুভব করা দুঃসাধ্য হয়। প্রাতে ভ্রমণ সচরাচর কষ্টকর ও পীড়াজনক হইয়া পড়ে। বসন্তকাল এস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্পকাল স্থায়ী। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতু বসন্তের আদি ও অন্ত কাল আপন আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছে। ফাল্গুনের অর্দ্ধ ও চৈত্রের অর্দ্ধ এই এক মাস কাল বসন্তের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বসন্তের প্রধান চিহ্ন দক্ষিণ বায়ু এখানে নাই। শীতের শেষ এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভ ও আম্র বৃক্ষের মুকুলোদগম প্রভৃতি দ্বারা বসন্ত অনুভব করিয়া লইতে হয়। এখানে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু প্রায় সম সাময়িক। বৈশাখ মাস হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি দিনই বৃষ্টি হইয়া থাকে। ওদিকে হিমালয় হইতে ভূরি পরিমাণ জলরাশি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত নদ নদী প্লাবিত করিয়া দেয়। আবার মাঠ ঘাট সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর অবিরত বর্ষণ শীল মেঘ প্রভাবে প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু এ প্রদেশের উচ্চতা এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশের ক্রম নিম্নতানিবন্ধন ভূরি পরিমাণ জলরাশি কোন স্থানেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারেনা, একত্র হইবা মাত্রই দক্ষিণ প্রদেশে প্রতি নিয়তই সরিয়া যায়। বর্ষাকালে মৃত্তিকা এত অধিক আর্দ্র হয় যে তাহার উপর গমনাগমন দুষ্কর হইয়া উঠে। নিয়ত পাদুকা ব্যবহার না করিলে পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। এদেশের ভদ্র মহিলাগণও কাষ্ঠ পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাটীতে শয়ন করিলে নিশ্চয়ই পীড়িত হইতে হয়। এজন্য এদেশের আপামর সাধারণ সকলেই উচ্চে শয়ন করে। যাহাদের তক্তপোষ (চৌকি) কিংবা খাট প্রস্তুত করিবার শক্তি নাই তাহারাও বাঁশের মাঁচা করিয়া তদুপরি সচরাচর শয়ন করে। এই সময়ে এ প্রদেশের পতিত স্থান সমূহ নানাবিধ উদ্ভিদ্ ও গুল্মলতায় পরিপূরিত হয়। নদীতীর, কেশে ও জঙ্গলে অরণ্যানী হইয়া যায়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে অত্যন্ত বৃষ্টি হইলেও গ্রীষ্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব থাকে। গড়ে প্রতি বৎসর ১২৫.৩২ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া থাকে।

জানুয়ারি .৭ ফেব্রুয়ারী .৬, মার্চ্চ .৭৭, এপ্রিল ৭.৪২, মে ১৪.৪৫, জুন ৩৭.১৭, জুলাই ২৪.৫৬, আগষ্ট ২২.৪৩, সেপ্টেম্বর ১৬.৭৭, অক্টোবর ৪.১৫, নভেম্বর .১, ডিসেম্বর .২।

জীবজন্তু।

হিমালয় ও তন্নিম্ন প্রদেশস্থ যে অরণ্যানী পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তুর আবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত, তাহা কোচবিহারের অনতিদূরেই অবস্থিত। সুতরাং বাসোপযুক্ত স্থান পাইলেই নানা প্রকার জীবজন্তু এস্থানে আসিয়া বাস করিবে আশ্চর্য্য কি? নানা জাতীয় ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, মৃগ, মহিষ অত্রস্থ অরণ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেশে, নল খাগড়া প্রভৃতি জঙ্গল বর্ষাকালে ও শীতের প্রারম্ভে যাবতীয় পতিত ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং ঐ সময়ে বন্য

জন্তুরও অভাব থাকে না। কোচবিহারের পূর্ব্বোত্তর সীমানায় অনেক পতিত ভূমি আছে তথায় ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সচরাচর দেখা যায়। মেচ, গারো প্রভৃতি যে সকল বন্য জাতির চিরদিন জঙ্গলে বাস করা অভ্যাস তাহারা ব্যতীত ঐ সকল প্রদেশে অন্য লোক প্রায় বাস করিতে পারে না। কোচবিহারে বন্য হস্তী দৃষ্ট হয় না। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ বিশিষ্ট অরণ্যানী এখানে নাই সুতরাং বন্য হস্তীর সমাগম অসম্ভব। এই রাজ্যের উত্তর সীমায় অত্যল্প ব্যবধানেই বন্য হস্তী দৃষ্ট হইয়া থাকে। গো, মেষাদি গৃহপালিত পশু বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও যেরূপ এখানেও সেইরূপ, তৎসম্বন্ধে কোনও তারতম্য লক্ষিত হয় না। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে যে সকল পক্ষী দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোচবিহারেও সচরাচর তাহাই দৃষ্ট হয়। টিয়াপাখী এখানে অতি সুলভ। বৃহৎ বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ মাত্রই টিয়াপাখীর আবাস স্থান। কবুতর, হাঁস ও কুক্কুট গৃহপালিত পাখীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। হিন্দু মাত্রের বাটীতেই কবুতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। হাট ও বাজারে বহুবিধ কবুতর ও হংস ক্রয় বিক্রয় হয়। কবুতরের মাংস অনেক লোকেই সচরাচর ভক্ষণ করে; এবং স্বকপোলকল্পিত দেব-দেবীর তুষ্টি সাধন জীবিত কবুতর দ্বারাই হইয়া থাকে। কোন রূপ বিপদে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকিলে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া গৃহস্থেরা কবুতর উড়াইয়া দেয়। এ স্থানের প্রায় জঙ্গলেই ময়ূর পাওয়া যায়। অনেক পক্ষী বৎসরের সকল সময় এখানে অবস্থিতি করে না, শীতের আধিক্যের প্রারম্ভেই অনেক পক্ষী হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া কোচবিহারে আইসে। আবার কোচবিহারে শীত প্রবল হইলে দক্ষিণ দেশে গমন করে। মুনিয়া নামক এক জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী এখানে বর্ষার অনতি পূর্ব্বে বহু সংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পাখী দেখিতে অতি সুন্দর, ইহার পাখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বিন্দু বিশিষ্ট।

মৎস্য কোচবিহারে সুলভ নহে। এস্থানের অধিকাংশ নদ নদী বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস জল পূর্ণ থাকে, তৎপরেই শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়। সুতরাং নদীতে প্রায়ই মৎস্য থাকে না। পুষ্করিণীতে মৎস্য পোষিত ও সংরক্ষিত হইবার প্রথা এ প্রদেশে বড় প্রচলিত নাই। শীতকালে নূনখাওয়া প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক মৎস্য আনীত হয়। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এস্থানে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের নূতন মৎস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আচিম, ভোটখড়ি, গতা, গোটী, রামধুতুরা, বরলী, চোয়াতর, নালসা, ডেকরা, কুঙ্গরি, মুগরুস, উরুয়া, নালিশ, পুঠীতর, শীলঠোকা, পীঠকাটা, নাওয়ানি, ছিপরা, পোগাল, হাড়িখাই, তোয়া, চাকা।

বর্ষাকালে অন্যান্য দেশাগত শুষ্ক মৎস্য এদেশীয় ইতর লোকে যথেষ্ট পরিমাণ আহার করে। এদেশে মৎস্যের এক প্রকার চূর্ণ পিণ্ডাকারে পাওয়া যায়, এদেশীয় ইতর লোকেরা উহা মোলা* বলে এবং আগ্রহের সহিত আহার করে।

বৃক্ষ।

এই রাজ্যে বৃহদায়তনের নানা জাতীয় বৃক্ষ বিশিষ্ট কোন অরণ্যানী দৃষ্টি-গোচর হয় না। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এ রাজ্যবাসী প্রজাগণের বৃক্ষাদিতে কোন স্বত্ব ছিল না, সুতরাং প্রজাগণ বৃক্ষাদি রোপণে মনোযোগ দিত না। আম্র, কাঁঠাল এবং সুপারি বৃক্ষই এখানে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। বাঁশ বাগান এদেশীয় প্রজার বিলক্ষণ আয়ের সম্পত্তি। বাঁশ কোচবিহারবাসিগণের বহুল প্রয়োজন সাধন করে। বাড়ী ঘর, শয়নের খাট, বসিবার চৌকি, দ্রব্যাদি বহনের টুকরি, বিছানার দরমা, তৈল ও অন্যান্য জলীয় বস্তু রাখিবার ভাণ্ড, পাকের কাষ্ঠ, ও যষ্টি, একমাত্র বাঁশের সাহায্যেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার মাকলা বাঁশের প্রধান গুণ এই যে তাহাতে ঘুণ ধরে না; সুতরাং অন্যান্য স্থানের বাঁশের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে যেমন কতকদিন পর্য্যন্ত বাঁশ জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, এখানে তাহার প্রয়োজন করে না। অন্যান্য প্রকারের বাঁশও এখানে পাওয়া যায়, মফস্বলে মাকলা বাঁশ গড়ে শতকরা তিন টাকা এবং রাজধানীতে ৫।০ হইতে ৬৲ টাকা দরে বিক্রী হয়।

সুপারি বৃক্ষ এখানে বহু সংখ্যক দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ফল বড় ভাল হয় না। শুষ্ক সুপারি এ দেশীয়েরা প্রায়ই ব্যবহার করে না। কাঁচা সুপারি জলে ভিজাইয়া পরে মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া রাখে। অভ্যাসের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সুপারি মাটীর নীচে প্রোথিত থাকিয়া যতই দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়, ততই মানব মণ্ডলীতে তাহার সমাদর বৃদ্ধি পায়। দুর্গন্ধ বিশিষ্ট কাঁচা সুপারি পয়সায় ২।৩টী করিয়া বিক্রী হয়। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে যেরূপ পান আছে সে জাতীয় পানের চাষ এখানে অতি বিরল। এখানে আম্র ও সুপারি বৃক্ষের উপর একরূপ বন্য পান জন্মিয়া থাকে উহার নাম গাছপান। যে স্থানে সুপারি বৃক্ষ আছে পানের গাছ তাহার উপর প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এ দেশের সমুদয় লোকেই এই গাছপান ব্যবহার করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে পানের আবাদও হয়। বৃহদায়তন আম্র বৃক্ষের

* মোলা অর্থাৎ সীদল।

সংখ্যা এখানে অধিক বটে, কিন্তু আম্র একরূপ অখাদ্য বলিলেই হয়। আম্র মাত্রই প্রায় টক ও কীটপূর্ণ। এখানে এক প্রকার কাঁচা মিঠা আম জন্মে তাহাকে ভোগরাম বলে। অপক্ক অবস্থায় এই আম খাইলে টক লাগে না, পাকিলে পান্‌সা হইয়া যায়। কাঁঠাল গাছ এখানে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; যথেষ্ট ফল হয় এবং ফল বিশেষ সুখাদ্য। শিশু গাছ এ প্রদেশে বৃহদায়তন বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোচবিহারে শালবন অতি বিরল। কয়েকটী মাত্র শালবন দৃষ্ট হয়; উত্তর তেলধার নামক স্থানে দুইটী তাহাতে ন্যূনাধিক ১৬০০০ বৃক্ষ আছে। সুপ্রসিদ্ধ গোসানিমারীর শালবনে অন্যূন ৩০০০ বৃক্ষ হইবে। ভৈষকুচী আউটপোষ্টের অধীন গারদের হাটের পূর্ব্ব ও উত্তরাংশে চকচকা ও খাগড়াবাড়ী নামক তালুকে দুইটী শালবন আছে, তাহার প্রত্যেকটীতে সহস্র শাল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শালবন একবার এক স্থানে হইলে ক্রমে ক্রমে স্বীয় দলবল বৃদ্ধি করিতে থাকে, প্রতি বৎসর নূতন নূতন চারা জন্মিবায় ক্রমেই বনের আয়তন বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় উল্লিখিত বৃক্ষ সমূহের মধ্যে ১৫৯ জাতীয় বৃক্ষ এখানে দেখা গিয়া থাকে।

মান্যতম ডিপুটী কমিসনর স্মিথ সাহেবের যত্নে এরাজ্যের রাজ পথের পার্শ্বে অনেকগুলি শিশু বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। অনেক বৃক্ষই শৈশবাবস্থায় আছে। অন্যূন ২৫০০ শিশু বৃক্ষ রাজপথের পার্শ্বে দেখা যায়। সম্প্রতি শিশু বৃক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। রাজধানীর এক ক্রোশ পশ্চিম ও দুই ক্রোশ দক্ষিণ দিকে দুই স্থান মনোনীত করিয়া তন্মধ্যে শিশু বৃক্ষের চারা সংরক্ষিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত নীলকুঠীর নিকটেও একস্থানে চারা রক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০০০ চারা রক্ষিত হইতেছে। শিশু বৃক্ষের আয়তনও এদেশে বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১৮৭২-৭৩ সনে যে বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে তাহা ১৮৮২ সনে আয়তনে গড়ে ২২ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩ ফুট ১ ইঞ্চি বেষ্টন বিশিষ্ট হইয়াছে। গড়ে প্রতি বৎসব লম্বায় ২ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং বেষ্টনে ৪ ইঞ্চি বৃদ্ধি পায়।

নদীর বিবরণ।

১। তিস্তা বা ত্রিস্রোতা তিব্বত দেশ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে সম্মিলিত হইয়াছে। এ রাজ্যের উত্তর পশ্চিমস্থ বক্সীগঞ্জ নামক স্থানে রাজ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব বাহিনী হওত, মেকলীগঞ্জের নীচ দিয়া যাইয়া,

ঝাড় সিংহেশ্বর নামক স্থানে এ রাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে। ত্রিস্রোতা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ১৫৬॥ ক্রোশ, তন্মধ্যে তিব্বত দেশে ১০ ক্রোশ, শিকিম রাজ্যে ৪৮॥ ক্রোশ, শিকিম ও ভূটানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ৫ ক্রোশ, ভূটান ও দারজিলিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ১০ ক্রোশ, ভূটান ও দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ৫ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া দিনাজপুর জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রবেশের স্থান হইতে ১৫ ক্রোশ ব্যবধানে সমদ্বিধারে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, এক ধার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গমন করিয়াছে, উহার নাম আত্রাই, অপর ধারের নাম তিস্তাই রহিয়া গিয়াছে। দ্বিধারের সঙ্গম স্থান হইতে ২॥ ক্রোশ ব্যবধানে এ-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ৪ ক্রোশ প্রবাহিত হওত, রঙ্গপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; উক্ত জেলায় ৫৫ ক্রোশ প্রবাহিত।

তিস্তা নদীতে বৃহৎ বৃহৎ চরা আছে, ইহার উত্তর ভাগ ক্রমশঃই শিলাখণ্ডে পরিপূরিত। ইহার জল পরিষ্কার, শীতল ও স্বাস্থ্যকর। কালী পুরাণে কথিত আছে, ভগবতী শিবভক্ত জনৈক অসুরের সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অসুর অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসাতুর হইয়া স্বীয় উপাস্যদেব মহাদেবের নিকট পানীয় প্রার্থনা করাতে তিনি ভগবতীকে পানীয় প্রদানের আদেশ করেন। ভগবতী অগত্যা আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য হইয়া হৃদয়দেশ হইতে তিনটী জলধারা বাহির করিয়াছিলেন; তাহাতেই এই নদীর নাম ত্রিস্রোতা হইয়াছে। তৃষ্ণা নিবারণার্থ নদীর উৎপত্তি হওয়াতে উহার অপর নাম তৃষ্ণা বলিয়াও উল্লিখিত আছে। শাখানদী বুড়া তিস্তা, বক্সীগঞ্জের নিকট হইতে নির্গত হইয়া, সামিলাবসের নিকট এরাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহার তীরে দেওয়ানগঞ্জ।

২। সিংমারী, হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ক্ষেতির অন্তর্গত মোরঙ্গার-হাট গ্রামের নিকট এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গাপুর নামক গ্রামে ধল্লা বা বড় তোর্ষার সহিত মিলিত হইয়াছে, অনন্তর রঙ্গপুরে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। সঙ্গমস্থলকে বাঘুয়ার মোহনা বলে। এই নদী কোচবিহারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে খ্যাত। যথা—মুজনাই, দানখানা, জলধাকা, মানসাই। প্রধান প্রধান উপনদী যথা—(ক) ধল্লা, পাণিশালা নামক গ্রামে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জলপাইগুড়ীর অন্তর্গত পাটগ্রামের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া, মহিষমুড়ীর নিকট পুনরায় এরাজ্যে প্রবেশ করতঃ, শিবপুর বাউরার নিকট সিংমারীতে পতিত হইয়াছে। (খ) সুটুঙ্গা, কামাতচাঙ্গারাবান্ধা নামক

গ্রামে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মাথাভাঙ্গার দক্ষিণে সিংমারীতে পতিত হইয়াছে।

৩। বড় তোর্ষা বা ধল্লা। হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া লাফা-বাড়ী নামক গ্রামে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, পরে দুর্গাপুরের নিকট সিংমারীর সহিত মিলিত হইয়া, মোগলহাটের নিকট এরাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে। উপনদী টানাটানী, ভোটান্ত প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া খট্টিমারীর দক্ষিণ দিকে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। শাখানদী বুড়া তোর্ষা, কানিবিল নামক স্থানের উত্তরভাগে বড় তোর্ষা হইতে নির্গত হইয়া, ভেলাকোপা হাটের দক্ষিণ দিকে কালজানীতে পতিত হইয়াছে। কোচবিহার নগর এই নদীতীরে অবস্থিত। ইহার উপনদী ঘড়ঘড়িয়া, নিকিরহাটের নিকট এরাজ্যে প্রবেশ করতঃ মহিষবাথানের পূর্ব্ব দিকে বুড়া তোর্ষায় পতিত হইয়াছে।

৪। কালজানী ভোটানের পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বাক্সার নীচ দিয়া প্রবাহিত হওত, খোল্টা নামক স্থানে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ঝাউকুঠার নিকট এরাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে। উপনদী যথা—(ক) ছোট গদাধর, খাসবস তালুকের নিকট এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিলিখুড়ির অনতিদূরে কালজানীতে পতিত হইয়াছে। (খ) বড় রায়ডাক, ঘেংটীমারীর নিকট এ-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিলিখুড়ির নিকট কালজানীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর শোণকোষ নাম ধারণ করতঃ বহুদূর গমন করিয়াছে এবং বড় গদাধরের সহিত মিলিত হইয়া ২।৩ মাইল প্রবাহিত হওত, নূনখাওয়ার নিকট ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। দীপোনদী চিকলিগুড়ী নামক স্থানে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া খেড়বাড়ীর নিকট বড় রায়ডাকে পতিত হইয়াছে।

৫। বড় গদাধর, এরাজ্যের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া, ছাটভলকা নামক তালুকের পূর্ব্ব দিকে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, কতিপয় মাইল মাত্র এরাজ্যে প্রবাহিত হওত, বক্সীগঞ্জ হাটের পূর্ব্ব দিকে এ-রাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে। উপনদী ছোট রায়ডাক, রামপুরহাটের উত্তরে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সাহেবগঞ্জ হাটের দক্ষিণে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। তাহাদিগকে উল্লিখিত কোনও নদীর সহিত মিলিত হইতে দেখা যায় না। তাহাদের উৎপত্তি ও পতন স্থান নির্ণয় করাও সহজ নহে। তন্মধ্যে সানিয়াজান, চেনাকাটা, গীদারি, ছোট মানসাই, সন্ন্যাসীকাটা প্রভৃতি প্রধান।

শিল্প।

শিল্পকার্য্যে কোচবিহার-বাসিগণ অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। কেবলমাত্র দুইটী বিষয়ে ইহাদের শিল্প নৈপুণ্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম এণ্ডি কাপড় দ্বিতীয় মেকলী। এণ্ডি নামক একরূপ কীট আছে, ভেরেণ্ডার পত্র আহার করাইয়া তাহার শরীর পোষণ করে। পনর দিবস মধ্যেই কীটগুলি বড় বড় হইয়া দেহ বিনির্গত সূত্র দ্বারা বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসাগুলি সূত্রময়, কীটগুলি রেসম কীটের ন্যায় আপন সূত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। পরে বাসা-গুলি গরম জলে সিদ্ধ করতঃ কীট মরিয়া গেলে, বাসা হইতে সূত্র বাহির করিয়া লয়; এই সূত্র দ্বারা একরূপ মোটা বস্ত্র বয়ন করে তাহাকেই এণ্ডি বলে। এণ্ডি কাপড় সুদৃঢ়, মোটা, দীর্ঘকাল স্থায়ী ও শীত নিবারক। যতই ধৌত করা যায় ততই সৌবর্ণ ও কোমলতা প্রাপ্ত হয়। কোচবিহারস্থ কৃষকগণের মধ্যে যাহারা বাটীর দেওয়ানিয়া অর্থাৎ কর্ত্তা তাহাদের গাত্রে এণ্ডি কাপড় প্রায়ই দৃষ্ট হয়। মেকলী কোষ্ঠা দ্বারা প্রস্তুত হয়। সচরাচর যেরূপ চট পাওয়া যায় ইহা তাহা হইতে সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার। এদেশের ব্যবহারোপযোগী কয়েক প্রকারের কাপড়ও এদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে॥ বলরামপুরের ভদ্রমহিলাগণ যে সকল বস্ত্র বয়ন করেন তাহা অতি উত্তম। এদেশীয় লোকে বাঁশের দ্বারা অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাহাতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করে।

মহরমের সময় যে সকল ডাহা (চৌকি) প্রস্তুত হয়, তাহাতে কাগজের যে সকল কারুকার্য্য দেখা যায়, তাহা অতিশয় সুদৃশ্য।

এদেশে কুম্ভকারের সংখ্যা অতি অল্প। মৃৎপাত্র প্রস্তুত করার উপযোগী মৃত্তিকাও সচরাচর ঘটে না। যে সকল মৃৎপাত্র প্রস্তুত হয় তাহাও নিতান্ত ভঙ্গ প্রবণ। দক্ষিণ দেশ হইতে অনেক মৃৎপাত্র এদেশে আনীত হইয়া থাকে। এদেশে এমন মৃত্তিকা প্রায়ই দেখা যায় না, যদ্দারা ভাল ইষ্টক প্রস্তুত হইতে পারে। অল্প কয়েক স্থানের মৃত্তিকা মাত্র ইষ্টক নির্ম্মাণের উপযোগী।

কয়েক বৎসর হইল এখানে একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এদেশীয় অনেক লোক বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া কথঞ্চিৎরূপে চৌকি, চেয়ার, টুল, মেজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। অদ্যাপি কেহ তদ্বিষয়ে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই। বিদ্যালয়টী আরও কয়েকদিন স্থায়ী হইলে ভাল সূত্রধরের অভাব থাকিবে না, ভরসা করা যাইতে পারে।

বাণিজ্য।

কোচবিহার হইতে যে সকল উৎপন্ন দ্রব্য বাণিজ্যার্থে স্থানান্তরে প্রেরিত হয় তন্মধ্যে তামাক, কোষ্ঠা, সর্ষপ-তৈল এবং ধান্যই প্রধান। ঐ সকল বস্তু এ-রাজ্যে ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেশের লোকের প্রয়োজন সাধিত হইয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তাহাই স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। নানাবিধ বস্ত্র, লবণ, নানা প্রকারের বাসন, শর্করা, মসল্লা এমন কি এদেশীয় লোকের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বস্তুই, ন্যূনাধিকরূপে দেশান্তর হইতে বাণিজ্যার্থে আনীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এস্থানে যে সকল বস্তু আমদানী ও রপ্তানি হইত তাহা নৌকাযোগেই হইত। বর্ত্তমান সময়েও তামাক, তৈল এবং অল্প পরিমাণ কোষ্ঠা এস্থান হইতে নৌকাযোগে সেরাজগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থলে রপ্তানি হইয়া থাকে। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে স্থাপন অবধি অধিকাংশ কোষ্ঠা, হল্‌দিবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেসন দিয়া প্রেরিত হয় এবং কাপড় ইত্যাদি রেলওয়ে যোগে এখানে আমদানী হইয়া থাকে। সংবৎসরে ন্যূনাধিক পঞ্চদশ লক্ষ টাকার উৎপন্ন দ্রব্য দেশান্তরে প্রেরিত হয় এবং যে সকল দ্রব্য এদেশে আনীত হয় তাহার আনুমানিক মূল্য নয় লক্ষ টাকা।

রপ্তানী	
তামাক	৭০০০০০
কোষ্ঠা	৪০০০০০
সরিষা ও তৈল	২০০০০০
ধান্য ও চাউল	১০০০০০
অন্যান্য	১০০০০০
	১৫০০০০০

আমদানী	
কাপড়	৫০০০০০
লবণ	১৫০০০০
অন্যান্য	২৫০০০০
	৯০০০০০

১৮৭২ সনে আনুমানিক মূল্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সম্প্রতি রেলওয়ে হওয়াতে পূর্ব্ব হইতে দ্বিগুণতর কোষ্ঠা রপ্তানি হইয়া থাকে। কাপড়ও অধিক আমদানী হয়।

বাণিজ্য কার্য্য প্রধানতঃ ভিন্ন দেশীয় লোক দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যোধপুর, বিকানীর, মুরশীদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কাঁইয়া মহাজনই অধিক। রাজধানীতে ইহাদের প্রধান আড্ডা এবং মফঃস্বলের স্থানে স্থানে তাহার শাখা প্রশাখা আছে। বাণিজ্য স্থানের মধ্যে কোচবিহার নগরই প্রধান। এতদ্ব্যতীত বলরামপুর, চওড়া, গোবরাছাড়া, তুফানগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ,

চাঙ্গারাবান্ধা, ভেলাকোপা, লাউকুঠী, মহিষখুচী, প্রভৃতি স্থানেও প্রচুর পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এদেশের বিক্রয় কার্য্য প্রধানতঃ হাটেই সম্পন্ন হয়। দেশীয় সমস্ত লোক আপন আপন উৎপন্ন দ্রব্য নিকটস্থ হাটে আনিয়া বিক্রয় করে এবং নিম্ন শ্রেণীর মহাজনেরা কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত, সচরাচর হাটে আনিয়া বিক্রয় করে, এজন্য কোচবিহারে হাটের সংখ্যা অধিক। পূর্ব্বে রাজধানীর ৫॥০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে কালজানী গ্রামের নিকটে, উক্ত নামধেয় নদীর তীরে চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে গদাধরের মেলা নামক একটীমাত্র মেলা হইত। তথায় তিন দিবস মেলা থাকে এবং বহুতর যাত্রী স্নানার্থ-সমাগত হয়, কিন্তু সম্প্রতি দেওয়ানগঞ্জ, শীতলখুচী, দীনহাটা, হলদিবাড়ী নামক স্থানে আরও চারিটী মেলা হয়। এই সকল মেলাতে ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বহুতর জিনিস ক্রয় বিক্রয় হয়। নদী, খালে জলের অল্পতা নিবন্ধন নৌকার পরিবর্ত্তে গরুরগাড়ী, বলদ, ঘোটক দ্বারাই বিক্রেয় দ্রব্যাদি একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মুটিয়ার সংখ্যাও অল্প; প্রায় সকল গৃহস্থেরই ঘোড়া এবং বলদের গাড়ী আছে। অধিকাংশ স্থলেই ঘোটক বা বলদ দ্বারা বিক্রয় দ্রব্য বাজারে নীত এবং ক্রীতবস্তু বাড়ীতে আনীত হইয়া থাকে।

কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য।

এখানকার কৃষিকার্য্যে শারীরিক পরিশ্রম অপেক্ষা কৌশলেরই বিশেষ প্রয়োজন; মৃত্তিকা স্বভাবতঃই ধূলিবৎ, সুতরাং কর্ষণ কার্য্যে অধিক পরিশ্রম লাগে না। ধান্য ও তামাক কোচবিহারের লোকের প্রধান অবলম্বন। কি প্রণালীতে তাহা উৎপাদিত হয় তদ্বিবরণ এই প্রস্তাবের উপসংহার ভাগে প্রকটিত হইল। কোষ্ঠা, সরিষাও অল্প আয়ের দ্রব্য নহে। লোকেরা বহু যত্ন পূর্ব্বক উৎপাদন করে। ইহাদের উৎপাদন প্রণালী অন্যান্য দেশের উৎপাদন প্রণালী হইতে বিশেষ পৃথক নহে। কাজেই তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল না। খেশারী, মুসরি, মাসকলাই, ঠাকুরীকলাই, মটর, অরহর, তিল, গোলআলু, চিনা, কাউন, গম, হরিদ্রা, আদ্রক প্রভৃতি এদেশের অনেক স্থানেই জন্মে। এখানে সটীও জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বে উপাদেয় তিক্ষুর প্রস্তুত জন্য বহুল পরিমাণ সটী স্থানান্তরে প্রেরিত হইত। এখানকার ভূমির অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় বিশেষ যত্ন করিলে চা ও কুসুম ফুল জন্মিতে পারে।

কোচবিহারে প্রায় একশত প্রকারের অধিক ধান্য উৎপন্ন হয়। এই সমুদায় দুই জাতিতে বিভক্ত, বিতরি অর্থাৎ আউষ অথবা আশু এবং হৈঁউতি অর্থাৎ আমন অথবা শালি এই সমস্ত ধান্যের নাম নিম্নে লিখিত হইল।—

হৈঁউতি যথা—চন্দ্রভোগ, কাটারীভোগ, কেঁওয়াভোগ, বিন্নাফুলভোগ, তুলসীভোগ, বাউইভোগ, জগন্নাথভোগ, মহেশভোগ, দশভোগ, রুক্মিনীভোগ, বছুলভোগ, ক্ষিরসাভোগ, কুমারভোগ, বলরামভোগ, কৃষ্ণভোগ, লালভোগ, বাঙ্গালভারী, হারপী, আচাইভোগ, চিনিশঙ্কর, ইন্দ্রসাইল, দ্বিচল, বুড়াবন্নী, হরিশঙ্কর, কানাইবাসী, দ্বারিকাসাইল, চিনিচক্রভোগ, গুগুরিভোগ, দুধপাথারি, সুবর্ণযশোয়া, ছোট যশোয়া, বড়লাউয়া অথবা হাতীরদাঁত, ছোট লাউয়া, বড় যশোয়া, মানসিরা, দুধকলম, ছোট গাজিয়া, বড় গাজিয়া, পানীসাইল, নারিকেলঝোপা, শ্যামরণ, ছোটফুলপাকরি, বড়পানাতি, ছোটপানাতি, বড়ফুলপাকরি, কাঁসাইল, থাঙ্গারমাও, ধলাবচী, লালবচী, কালবচী, ছোটঢেপা, বেঁত, হলদিজাম, বাঙ্গালদাড়া, লোহাডাঙ্গা, বাসডাঙ্গা, ডাঙ্গরবন্নি, ফুলগাজিয়া, বগাঝুল, শৈলঢেপা, সিঙ্গরা, জলঢেপা, ছোটচাপা, আমলা, চেমসী, পুরপি, জঙ্গিয়া, গোবা, আম-ঝুকি, বোয়াপাকুরি, অমলাকাসা, কেশববুচী, কাদবচী, জাপেবচী, গুঞ্জরীবচী, সেওরাজ, কাকুয়া, কচদনা, চিকিরাজবন্নি, আসন্নরা, তারাপাকরি, কালবান্নি, গোতোমাগুরী, মুরিয়াবচী, পয়রাযশোয়া, পুইয়াবচি, নারিয়াবচী, কালাধানী, ডাঙ্গারাণী, ললিতভোগ, সাজানি।

বিতরি যথা—চাঁপাল, কাশিয়াগঞ্জের, পরসী, গাঠিয়াভুমরা, চেঙ্গভুমরা, মুরলীভুমরা, কালখুকরি, ঘুসরি, নীলাজী, কাচানালী, বৈলবাযাসী, বিনিখোঙ্গরা, কালাভুমরা, ডাইকাসাইল, ধলকাচাই, ভালাই, খইরী ধারিয়া, গড়িয়া ধান্য, রাঙ্গানামী, বীরমান্দনী, ছাইতানভুমরা, ছরিণ কাজলী, শৈলপনাই, চতুরুশ, পপরভাজ, কাইনন, বড়চাপলা, নোয়াসিদার।

বিতরি ধান্যের কৃষি বৈশাখ মাসে আরম্ভ হয়। ক্ষেত্রে উত্তমরূপে ছয়বার হল দ্বারা কর্ষণ করিয়া ও চারিবার মই দ্বারা চূর্ণ ও সমান করতঃ ছয় অঙ্গুলী পর্য্যন্ত ধূলিবৎ করিয়া ধান্যের বীজ বপন করে। ১০।১২ দিনে বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারা ছয় অঙ্গুলী উচ্চ হইলে আর একবার মই দেয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে শাসন দ্বারা ক্ষেত্রের তৃণ পরিষ্কার করিয়া দেয়। ধানের গাছ গড়ে দুই হাত লম্বা হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসের শেষ ও শ্রাবণ মাসে ধান্য কর্ত্তন করে। এক জাতীয় নিকৃষ্ট বিতরি ধান্যের কৃষি ফাল্গুণ মাসে বপন করিয়া

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে কাটে। গাছ হইতে ধান পৃথক করিতে গবাদি দ্বারাই করা হয়। মনুষ্যেরা পা দ্বারা পেষণ করে না।

হৈঁউতি দ্বিবিধ রোয়া অর্থাৎ রোপিত, বোয়া অর্থাৎ বপন করা। রোয়া শালি ধান্যের বীজ কৃষকেরা দুই প্রণালীতে উৎপাদন করিয়া থাকে। তলুয়া ও নেওয়চা; তলুয়া চৈত্র মাসের প্রথমে কোন এক শুষ্ক ক্ষেত্রে চারিবার হলের দ্বারা চাষ করিয়া দুইবার মই দ্বারা উত্তমরূপে ধূলিবৎ করতঃ বীজ বপন করে। ৮।১০ দিবসের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। আষাঢ় মাসে এই চারা সকল পৃথক ক্ষেত্রে রোপণ করে।

নেওয়চা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে এক বৃষ্টি হইলে কোন এক ক্ষেত্রের চতুঃপাশে আলি বাঁধিয়া চাষ ও মই দ্বারা কর্দ্দম করতঃ বীজ বপন করে ও ২।৩ দিবসের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারা সকল আষাঢ় মাসের শেষ কি শ্রাবণ মাসের প্রথম পর্য্যন্ত পৃথক ক্ষেত্রে রোপিত হয়। চারা উৎপাদনের দ্বিবিধ প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে। এখন চারা সকল কিরূপে উঠাইয়া অন্য ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয় তদ্বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে। যে ক্ষেত্রে চারা সকল রোপণ করিতে হইবে প্রথমতঃ সেই ক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে আলি বাঁধিয়া বৃষ্টির জল বদ্ধ করিয়া রাখে, ক্ষেত্রটী সম্পূর্ণ জলপূর্ণ হইলে হল দ্বারা প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পর্য্যন্ত ভূমি কর্ষণ করিয়া, মই দ্বারা কর্দ্দমময় ভূমি সমান করিয়া ক্ষেত্রস্থ তৃণাদি পচিয়া সার হইবার নিমিত্ত ১০।১২ দিন ঐ ভাবেই রাখিয়া দেয়; পরে হলের দ্বারা বারম্বার কর্ষণ ও পদ দ্বারা দলন করে। মৃত্তিকা ও জল উত্তমরূপে মিলিত ও নিম্নবর্ত্তী ভূভাগ অর্দ্ধহস্ত পরিমাণে কর্দ্দমাকারে পরিণত হইলে, তলুয়ার চারা সমস্ত পাসন বা হস্ত দ্বারা এক একটী করিয়া এবং নেওয়চার চারা সমস্ত হস্ত দ্বারা বহু সংখ্যক একত্রে উত্তোলন করিয়া, সমস্ত চারার গুঁড়ি ঝাড়িয়া কি ধৌত করিয়া চারার অগ্রভাগ ছেদন করতঃ অর্দ্ধহস্ত অন্তরে অন্তরে রোপণ করিয়া যায়। কৃষকেরা এই সমস্ত কার্য্য এত দ্রুত নিষ্পাদন করে যে, কোন বিদেশীয় লোক তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হয়। ধান্যের গাছ ১॥০।২ হস্ত উচ্চ হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ধান্য কর্ত্তন করে।

বোয়া হৈমন্তিক ধান্য নিকৃষ্ট। চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাখ মাসের প্রথমে নিম্নভূমি কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে হল ও মই দ্বারা পাইট করিয়া বীজ বপন করে। চারি পাঁচ দিবসের মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত হয় পরে বৃষ্টির আধিক্যে গাছগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই বড় হয়। এই গাছ ৮।৯ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ১।০ বা ১॥০ হস্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া থাকে।

তামাকের বিবরণ।

কোচবিহার প্রদেশে তামাক উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করে। কোচবিহারের পশ্চিম দক্ষিণাংশে উৎকৃষ্ট তামাক হয়। যে কয়েক জাতীয় তামাক এখানে উৎপন্ন হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।—

নাম	পত্রের পরিমাণ
১। চামা বা কুলাপাতি	২ কি ২॥০ হাত দীর্ঘ ১ হাত প্রস্থ।
২। শকুনি চামা	ঐ অবয়ব অত্যন্ত পুরু ও পত্রের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চ।
৩। দাড়াইচ মেণী	২॥০ হাত দীর্ঘ ১ হাত প্রস্থ।
৪। বড়মেণী	ঐ অবয়ব অত্যন্ত পুরু ও সমান।
৫। ছোটমেণী	১॥০ কি দুই হাত দীর্ঘ ও ঐ প্রস্থ গোলাকার এবং উভয় পার্শ্ব উচ্চ।
৬। পটুয়াখুলী	২॥০ হাত দীর্ঘ এক হাত প্রস্থ পুরু ও সমান।
৭। ভেলেঙ্গী	২ হাত দীর্ঘ ১ হাত প্রস্থ।
৮। সিন্দুরখটুয়া	১ হাত দীর্ঘ আধ হাত প্রস্থ লালবর্ণ।
৯। ঢাড্ডি	১।০ হাত দীর্ঘ এক হাত প্রস্থ।
১০। নাওখোলা	২।২॥০ হাত দীর্ঘ ১ হাত প্রস্থ।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার তামাকের কৃষির নিয়ম প্রায় একই প্রকার। শ্রাবণ মাসের শেষে কি ভাদ্র মাসের প্রথমে বীজ বপন করে। চারা ৩।৪ অঙ্গুলী উচ্চ হইলে বৈকালে জল সেচন করে। অধিক বৃষ্টি হইলে চারা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় চারাক্ষেত্রে বৃষ্টি না পড়িতে পারে এই অভিপ্রায়ে ক্ষেত্রের উপরে এক ছাউনী করে। চারার প্রথম পত্র উদ্গত হইলে কৃষকেরা তাহাকে সোণাকানী কহে। কিঞ্চিৎ বড় হইলে ইন্দুরকানী তদপেক্ষা বড় হইলে টাকাপাতী এবং অধিক বড় হইলে পানাপাতী কহে। যে ক্ষেত্রে চারা রোপণ করিতে হয় তাহাতে চৈত্র মাস হইতে কৃষকেরা গোময় ও অন্যান্য সার নিক্ষেপ করিতে থাকে। আশ্বিন মাসে অর্দ্ধ হস্ত পর্য্যন্ত গভীর করিয়া চাষ করে এবং মই দ্বারা ভূমি ধূলিবৎ করিয়া ফেলে পরে সমান্তর ভাবে প্রায় ৩।৪ হস্ত অন্তর চারা রোপণ করে। চারা রোপণ করিয়া মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হয় এবং দুই সারির মধ্যে কয়েক বার চাষ করিতে হয়, পৌষ মাসের শেষে এবং মাঘ মাসের প্রথম ভাগে গাছ বড় হইলে নীচের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলে এবং

শুকাইয়া রাখে। এই গুলিকে বিষপাতা বলে, ইহা ভাল তামাকের সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রী করে। কয়েকটী মাত্র বড় পাতা রাখে এবং গাছের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহার পর আর চাষ দিতে হয় না। গড়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিশবার চাষ ও মই দেয়। চৈত্র মাসে পাতাগুলি কিছু পীতবর্ণ হয় এবং তখনই কর্ত্তনের সময়; প্রাতঃকালে কর্ত্তন করে, এবং রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বৈকালে বাঁশের চটি দ্বারা সমদীর্ঘ চারি চারিটী পত্র একত্র বাঁধিয়া মাঠে ফেলিয়া রাখে। পরে পৃথক এক অন্ধকারময় ঘরে বংশ শলাকা সকল উপর্য্যুপরি ঝুলাইয়া তাহাতে ঐ তামাক পত্রের আটী অসংলগ্ন ভাবে ঝুলাইয়া রাখে কয়েক দিবস পরে নামাইয়া স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখে।

কোচবিহারের বিশেষতঃ গোসানিমারী, আদাবাড়ী, পাণিগ্রাম, বায়বাঙ্গলা প্রভৃতি স্থানের তামাক রঙ্গপুরের তামাক হইতে কোন অংশেই অপকৃষ্ট নহে, যদিচ হর্টিকালচারেল সোসাইটীর কোন কোন মেম্বর প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে রঙ্গপুরের তামাক ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এ অঞ্চলের তামাকের একমাত্র দোষ এই যে, ইহা ইউরোপীয়দিগের ব্যবহারে বড় লাগে না। কারণ ইহাতে উত্তম চুরট প্রস্তুত হইতে পারে না, ইহার পাতাগুলি ভারী। ২।৩ বৎসর অতীত হইল মাথাভাঙ্গার অন্তঃপাতী কাউয়ারডারা নামক স্থানে আমেরিকীয় এবং স্পেনীয় প্রণালী অনুসারে তামাক জাত দেওয়া হইয়াছিল এবং আবাদও করা হইয়াছিল, তাহাতে যে তামাক হইত তাহা নিতান্ত উৎকৃষ্ট ও ইয়ুরোপীয়দিগের ব্যবহার যোগ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ব্যয় বাহুল্য বিধায় সেই কার্য্য সম্প্রতি স্থগিত আছে।

ভূমিবিভাগ ও ভূমির অধিকারিত্ব।

ভূম্যাধিকারী সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশীয় বন্দোবস্ত সমূহের ন্যায় জটিল নহে। ভূমির স্বত্ববান্ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই এই বন্দোবস্ত সুবিধাজনক। প্রত্যেকের স্বত্ব আইন ও দেশীয় আচার ব্যবহারে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে এবং তাহা সহজে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান বন্দোবস্ত ১২ বৎসরের জন্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই বন্দোবস্ত রাজা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। সকল পাট্টার ম্যাদ ১২ বৎসর সম্পূর্ণ হয় নাই, কারণ সকল পাট্টা এক সময়ে প্রদত্ত হয় নাই। যে সময়েই পাট্টা দেওয়া থাকুক না কেন, সকল পাট্টার ম্যাদই ১২৯০ সনে শেষ

হইবে; অর্থাৎ বর্ত্তমান বন্দোবস্ত ১২৯০ সন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৫শে জুন তারিখে এই সময় নির্দ্ধারণের অনুজ্ঞা প্রচারিত হয়। পরে রাজা ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। বন্দোবস্তের ভারপ্রাপ্ত বেকেট সাহেব ১৮৭৪ সনে ভূমির স্বত্ব সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

রাজা সমুদয় ভূমির অধিকারী। বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের জমীদারগণের সহিত প্রজার যেরূপ সম্বন্ধ, এখানে রাজার সহিতও জোতদারের প্রায় তদনুরূপ সম্বন্ধ। এতদ্ব্যতিরিক্ত নানা প্রকারের স্বত্ববান্ অধিকারী আছে।—যথা ১। জোতদার। ২। চুকানীদার। ৩। দরচুকানীদার। ৪। দরাদরচুকানীদার। ৫। তস্যচুকানীদার। ৬। আধিয়ার।

১। জোতদার। রাজার অব্যবহিত নীচেই জোতদার অথবা জোতের স্বত্বাধিকারী। জোতস্বত্ব পুরুষানুক্রমিক, হস্তান্তর যোগ্য, এবং দেশীয় আচার ব্যবহারানুযায়ী বিভাগ যোগ্য। জোতদার প্রচলিত কর প্রদানে সম্মত থাকিলে, রাজা তাহার স্বত্ব স্বীকার করেন। জোতদারগণ যে খাজানা দেয় তাহা বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান বন্দোবস্ত বার বৎসরের জন্য হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

২। জোতদারের অব্যবহিত নিম্নেই চুকানীদার। জোতের কতক অংশ ভোগ করে। তাহাদের দখলি স্থানের নাম চুকানী। জোতদারের অনুমতি লইয়া চুকানী স্বত্ব বিক্রয় করা যাইতে পারে। জোতদার নিজে খরিদ না করিলে চুকানী স্বত্বের ধ্বংস হয় না। দেওয়ানী ও খাজানার ডিক্রিতে এই চুকানী, জোতদারের অনুমতি ব্যতীতই বিক্রয় হইতে পারে। চুকানীদারের দখলি স্বত্ব আছে। তাহার স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক এবং বিভাগযোগ্য। জোতদার রাজাকে যত খাজানা দেয় চুকানীদার তাহা হইতে শতকরা উর্দ্ধ সংখ্যা ২৫৲ টাকা পরিমাণে অধিক খাজানা জোতদারকে দিয়া থাকে। প্রত্যেক চুকানীদারের জমীর পরিমাণ এবং উর্দ্ধ সংখ্যা তাহার জোতদারকে কত খাজানা দিতে হইবে, তাহা রাজকীয় তেরিজে উল্লেখিত আছে এবং তাহার নকল চুকানীদারকে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং জোতদার কোন প্রকার অধিক দাবী করিতে পারে না।

৩। চুকানীদারের নীচে দরচুকানীদার। তাহাদের স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য কিন্তু জোতদারের অনুমতি সাপেক্ষ। তাহাদেরও দখলি স্বত্ব আছে। দর-চুকানীদার জোতদারের রাজস্বের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা হারে অধিক চুকানীদারকে দিয়া থাকে।

৪। দরচুকানীদারের নীচে দরাদরচুকানীদার। দরচুকানীদারের সকল স্বত্বই ইহাদের আছে। জোতদারের রাজস্ব হইতে ইহারা শতকরা ৭৫৲ টাকা অধিক দেয়।

৫। ইহার নীচে তস্যচুকানীদার। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

৬। আধিয়ার অর্থাৎ প্রজা। ইহারা জোতদারের ভূমিকর্ষণ করিয়া অৰ্দ্ধেক উপস্বত্ব তাহাকে প্রদান করে এবং অপরার্দ্ধ নিজেরা ভোগ করে। পূর্ব্বে ইহাদের কোন স্বত্ব ছিল না। ১৮৭২ সনের ৪ঠা অক্টোবর বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ কেম্বেল সাহেব আদেশ প্রচার করেন যে, একাদিক্রমে কোন প্রজা ১২ বৎসর কোন জমী আবাদ করিলে তাহার দখলি স্বত্ব জন্মিবে। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেই কিয়ৎ পরিমাণ জমী আবাদ করিয়া থাকে, কাজেই সকল শ্রেণীরই আধিয়ার আছে।

বঙ্গদেশে জমীদারের নিম্নে কেবল এক শ্রেণীর প্রজার দখলী স্বত্ব আছে, কিন্তু এখানে সকল শ্রেণীর প্রজারই কোন না কোন স্বত্ব আছে। এবং তাহাকে ঊর্দ্ধ সংখ্যা কত জমা দিতে হইবে তাহাও তাহার জানা আছে। সুতরাং কোন প্রকার অনিয়মিত কর তাহার দিতে হয় না। নিম্ন শ্রেণীর প্রজাগণ বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের সেই শ্রেণীর প্রজাগণ হইতে ভাল অবস্থায় আছে। বন্দোবস্ত জোতদারের সঙ্গেই হইয়াছে। জোতদারগণই কবুলিয়ত প্রদানে পাট্টা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে চুকানীদার হইতে কত খাজানা পাইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে।

আরও কয়েক প্রকারের ভূমির অধিকারী আছে তাহাদের সম্যক বিবরণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

১। ব্রহ্মোত্তর :—রাজা প্রতিপালন উদ্দেশে যে ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন তাহাকে ব্রহ্মোত্তর বলে। ইহার স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক এবং হস্তান্তর যোগ্য।

২। মোকররী :—নির্দ্দিষ্ট খাজানাতে যে জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার অধিকারিগণের কোনও আবোয়াব দিতে হয় না কেবল বাট্টা দিতে হয়। এই মোকররী দুই প্রকার :—কোন পাট্টাতে রাজা উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান করিয়াছেন, কোন পাট্টাতে করেন নাই। উত্তরাধিকারী না থাকিলে মোকররী, রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।

৩। পেটভাতা :—রাজা তাঁহার জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণের ভরণপোষণ জন্য তাঁহাদের জীবিতকাল পর্য্যন্ত কতক জমী দান করিয়া থাকেন। প্রথম

প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য রাজার নিকট অবেদন করিতে হয়। পুনঃ প্রদান গ্রাহ্য না হইলে উত্তরাধিকারিগণকে সাধারণতঃ জোত স্বরূপে ঐ জমী দেওয়া হয়। অন্যান্য জোতদারগণের ন্যায় তাহাদেরও প্রচলিত খাজানা দিতে হয়। পেটভাতা জমীর স্বত্ব হস্তান্তর করা যায় না।

৪। বক্‌সিস্ ঃ—ইহা এক প্রকার নাখেরাজ জমী। কোনও শ্রেণী বিশেষের লোককে প্রদত্ত হয় না, ইহা কেবল ভাল কাজের পুরস্কার। ইহার স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক এবং হস্তান্তরযোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকিলে সরকার জব্দ হইয়া যায়।

৫। দেবত্র ঃ—কোনও দেবদেবীর পূজার ব্যয়াদি নির্ব্বাহ জন্য যে ভূমি দেওয়া যায় ; ইহার স্বত্ব কোন প্রকার বিক্রী বা হস্তান্তরিত হইতে পারে না। এস্থানে দুই প্রকারে দেবত্র দেখা যায়। (১) রাজকীয় দেবত্র ঃ—এই সকল দেবদেবীর পূজা কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সরকারী কার্য্যকারক নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলে। ধর্ম্মাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে এই সকল পূজা কার্য্য সম্পাদিত হয়। এক এক স্থানের পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি আছে, দেবত্র ভূমির রাজস্ব হইতে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। (২) রাজার স্বকীয় দেবদেবীর পূজার জন্য যে সকল ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। পূজার জন্য কতকগুলি সেবাইত অর্থাৎ পূজক আছেন। তাঁহাদিগের উপর ধর্ম্মাধ্যক্ষের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। রাজকীয় দেবত্র প্রাপ্ত সেবাইতের মৃত্যু হইলে অন্য সেবাইত নিযুক্ত করা হয়। তাহার উত্তরাধিকারী উপযুক্ত হইলে প্রায়শঃ তাহাকেই দেওয়া হয়।

৬। পীরোত্তর ঃ—মুসলমানদিগকে তাহাদের দেব সেবার জন্য যে ভূমি দেওয়া যায়।

৭। জায়গীর ঃ—নিয়মিত সময়ে প্রয়োজনানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজসরকারে কতকগুলি লোক নিযুক্ত থাকে। তাহাদিগকে নগদ বেতন না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কতক ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে দেওয়া হয়। সেই ভূমিকে জায়গীর বলে। যদি তাহারা কাজ না করে কিংবা কাজের অনুপযুক্ত হয়, কিংবা কাজের আবশ্যকতা না থাকে তবে আর জায়গীর থাকে না। জায়গীরের জমীর স্বত্ব দান বিক্রীর অধিকার নাই। সাধারণতঃ উপযুক্ত উত্তরাধিকারিগণই জায়গীরের অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিতে রাজা বাধ্য নহেন। নীচ শ্রেণীর প্রায় সমুদয় কর্ম্মচারীই জায়গীর

পাইয়া থাকে। যথা :—তামাকবরদার, ঝাড়িধরা, বোকনাধরা ইত্যাদি। যে, যে কাজ করে তদনুসারে উপাধি হইয়া থাকে।

খাজানার হার।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেব যে খাজানা স্থিরতর করিয়াছিলেন তাহার এক তালিকা এখানে দেওয়া গেল। নিম্নলিখিত খাজানার উপর আবোয়াব ও অন্যান্য প্রকারের কর দিতে হইত। সেই বন্দোবস্তে প্রত্যেক বিশের খাজানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এক এক বিশ, বার বিঘা ষোল কাঠার সমান।

কি প্রকারের জমি	এক বিশের জমা	এক বিঘার জমা	আবোয়াব ও অন্যান্য কর সমেত প্রত্যেক বিঘাতে কর দিতে হইত
আউয়াল	৬৸৯	॥৬	৸২
দৈয়ম	৫৴৭	।৵৪	॥৴২
ছৈয়ম	৪।০	।৴৩	।৶৭
চাহরম	৩।৵৪	।৩	।৵১
বাঁশভূমি	১০৶২	৵৯	১৵৩
ছন	৬৸৯	॥৬	৸২
লায়েক পতিত	২॥৯	৶২	।৬
নিজবাস্তু	২৭৶২	২৵	৩৮
বাজে বাগান	২৭৶২	২৵	৩৮
সুপারি বাগান	৫৪।৵৪	৪।০	৬৴৫
প্রজাবাস্তু	২০।৵৪	১॥৴৬	২।৬

এই বন্দোবস্তের পর রহিমগঞ্জ পরগণাতে আর এক বন্দোবস্ত হইয়াছিল; তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ খাজানা ধার্য্য হয়।

কোন্ প্রকারের জমি	প্রতি বিঘার খাজানা
আউয়াল	৸০
দৈয়ম	॥৵০

কোন্ প্রকারের জমি	প্রতি বিঘার খাজানা
ছৈয়ম	॥০
চাহরম	।৵০
লায়েক পতিত	।০
বাস্তু	৩৲
উদ্বাস্তু	২৲
বাজে বাগান	৩৲
সুপারি বাগান	৬৲

উপরোক্ত হারের খাজানা সম্পূর্ণ আদায় হইত না। জোতদারদিগকে শতকরা ৪০ টাকা মাপ দিতে হইত। জোতদারের নিম্নবর্ত্তী অধিকারিগণের সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। জমির অবস্থা বিবেচনায় চুকানীদারদিগকে প্রত্যেক বিশে ৩ টাকা হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত জোতদারের রাজস্ব অপেক্ষা অধিক দিতে হইত। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ১৮৭২ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বর্ত্তমান প্রচলিত বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিয়াছেন। এই বন্দোবস্ত বাং ১২৯০ সন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। নিম্নলিখিত হারে জোতদারের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে।

বাস্তু, উদ্বাস্তু, বাজে বাগান, সুপারি বাগান প্রত্যেক বিঘা ২॥০, বাঁশ বাগান প্রত্যেক বিঘা ১॥০, আবাদি জমি প্রত্যেক বিঘা ॥০ আনা।

বিল ও জলা কোনও জোতে দুই বিঘা কি তাহার ন্যূন থাকিলে প্রত্যেক বিঘা ॥০ আনা।

জঙ্গল ও অনাবাদি প্রত্যেক বিঘা ⁄০ আনা।

রাজধানীতে বাজারের দিকে রাস্তার সম্মুখস্থ ভূমির এক হস্ত প্রস্থ এবং ২০ হস্ত দীর্ঘ পরিমাণ জমির খাজানা বার আনা এবং অন্যান্য জমির খাজানা প্রতি বিঘা আট ও ছয় টাকা।

মফঃসলের হাট সমূহে রাস্তার সম্মুখস্থ ভূমির এক হস্ত প্রস্থ এবং ২০ হস্ত দীর্ঘ পরিমাণ জমির খাজানা চারি আনা এবং হাটের অন্যান্য জমির খাজানা প্রতি বিঘায় চারি টাকা।

এই বন্দোবস্ত জোতদারের নীচ শ্রেণীর অধিকারিগণের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা জনক। জোতদারগণ কোন প্রকার আবোয়াব গ্রহণ করিতে পারেন না। নির্দ্দিষ্ট কর পাইয়াই তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

অধিবাসী ও ভাষা

কোচবিহারের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী ও মুসলমান। রাজবংশীর সংখ্যা মুসলমান হইতে প্রায় তিনগুণ অধিক হইবে। এতদ্ব্যতীত কোচ, মেচ, গারো, দোভাষীয়া, মোড়ঙ্গীয়া প্রভৃতি এবং আর্য্য বংশ সম্ভূত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের বসতি আছে। ১৮৮১ সালে যে লোক সংখ্যা নির্ণয় করা হয় তাহাতে লোকের সমষ্টি ৬০০৯৪৬ স্থির হইয়াছে।

থানার নাম	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
হলদিবাড়ী	১৮২৮২	১৬৯৭০	৩৫২৫২
মেকলীগঞ্জ	২৭২৮১	২৪৮১৪	৫২০৯৫
মাথাভাঙ্গা	৭৯২৩০	৭৪০১২	১৫৩২৪২
দীনহাটা	৭৮৮৯৫	৭৬৫২৭	১৫৫৪২২
কোচবিহার	৭৩০১৫	৬৬১৬০	১৩৯১৭৫
তুফানগঞ্জ	৩৪০৮৬	৩১৬৭৪	৬৫৭৬০
	৩১০৭৮৯	২৯০১৫৭	৬০০৯৪৬

হিন্দু	৪২৫৪৭৮
মুসলমান	১৭৪৫৩৯
খৃষ্টিয়ান	৪৮
জৈন	১৪৪
সাঁওতাল	১৯
আদিম জাতীয়	৩৯৬
অন্যান্য	৩২২

কোচবিহারবাসিগণ বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহে। অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত মূলক, মধ্যে মধ্যে পারসী মূলক শব্দও ব্যবহার করিয়া থাকে। মেচ ও কাছারি ভাষার শব্দও অনেক প্রচলিত আছে।

ছাপাখানা।

মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণই তাঁহার রাজত্ব সময়ে একটী প্রেস্ আনেন, কিন্তু তাহা অনেকদিন পর্য্যন্ত কমিসনরের তত্বাবধানে জলপাইগুড়ীতে থাকে। ১৮৭৫ খৃঃ উহা রাজধানীতে আনা হয় এবং বর্ত্তমান ট্রেজারী একাউন্টেন্ট

বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ ইহার তত্ত্বাবধারণের কার্য্যে নিযুক্ত হন। সম্প্রতি একজন প্রিণ্টার, তিনজন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ কম্পজিটার, এবং দুইজন সহকারী কম্পজিটার, একজন বাঙ্গালা কম্পজিটার, ১ জন প্রেসম্যান, এবং তাহার দুইজন সহকারী দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। জেলখানার ১২ জন কয়েদী নিয়মিতরূপে কম্পজিটার এবং অন্যান্যের সহায়তা করে। বৎসর ৪৬১১ টাকা বেতনাদিতে ব্যয় হয়। দ্রব্যাদির মূল্যে বৎসর ৬০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। রাজকীয় এবং চাকলাজাতের যে সকল ফারম ইত্যাদি ছাপাইতে হয় তাহা এখানেই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কমিসনরের আদেশ মতে, রাজসাহী বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারদিগের ফরমাইস মত কার্য্যও করিতে হয়।

প্রত্যেক বৎসর প্রেস হইতে যে সকল কাজ হয়, তাহার আনুমানিক মূল্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

রাজকীয় আফিসের জন্য	১৫০০০
চাকলাজাত	৬০০০
অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের কাজ	১৫০০
	২২৫০০

এই সকল কাজের জন্য কাহারই মূল্য দিতে হয় না।

পত্রাদি প্রচলন।

ডাকের পত্র প্রচলনের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী পোষ্ট আফিস আছে। তন্মধ্যে কোচবিহার পোষ্ট আফিস প্রধান। এতদ্ব্যতীত হলদিবাড়ী, মেকলীগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, দীনহাটা এবং বলরামপুরে কয়েকটী শাখা পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে রেলওয়ের কার্য্য সম্যক বিস্তৃত হওয়াতে, পত্রাদি প্রচলন কার্য্যেরও অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতার পত্র যে দিন তথা হইতে রওনা হয়, তাহার পর দিবস একটার সময়েই এখানে পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিস ব্যতীত রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য সরকারী ডাক আছে, ইহাকে থানার ডাক বলে। প্রত্যেক থানাতে এবং প্রত্যেক থানা হইতে প্রত্যেক দিবস কোচবিহারে পত্রাদি আসিতে এবং যাইতে পারে। সরকারী কোনও পত্রের মাশুল দিতে হয় না। এই কার্য্যের ভার পুলিশ বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের হস্তে ন্যস্ত আছে। এই ডাক দ্বারা যে কেবল থানাতেই পত্র প্রেরণ করা যায় এমত নহে; থানার অধীনস্থ পল্লীগ্রাম

সমূহেও পত্রাদি চলিতে পারে। পল্লীগ্রামে পত্র বিতরণ জন্য স্বতন্ত্র পিয়ন নাই, গ্রাম্য চৌকিদারেরাই এই কার্য্য করিয়া থাকে।*

রাজধানী।

কোচবিহার নগরই এই রাজ্যের রাজধানী। ইহা উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১॥ দেড় মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে কিঞ্চিদূন এক মাইল প্রশস্ত। প্রায় তিন দিকই তোর্ষা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত, উত্তর দিক হইতে আর একটী নদী আসিয়া তোর্ষার সহিত মিলিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ সুখে বিহার উদ্দেশে এই স্থানে বৎসরের কয়েক মাস অতিবাহিত করিতেন এবং কালক্রমে এই স্থানই রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে; এই জন্যই ইহার নাম বিহার। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এইটী সুখে বিহারের স্থান নহে, স্থানটির প্রাকৃতিক গঠন দৃষ্টি করিলে ইহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইবে যে, কেবল ভোটান রাজের অত্যাচার হইতে বিমুক্তি পাওয়ার জন্যই এস্থানে রাজধানী করা হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে নদী পরিবেষ্টিত থাকাতে, বিপক্ষের আক্রমণ হইতে সহজেই নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা ছিল। বিশেষতঃ ভোটান রাজ্যের সীমা হইতে পূর্ব্ব রাজধানী যতদূরে ছিল; ইহা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত।

নগরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে রাজবাটী, বর্ত্তমান রাজবাটী তাদৃশ সুসজ্জিত নহে। দুই তিনখানা মাত্র সাধারণ অট্টালিকা আছে, তদ্ব্যতীত সমস্তই খড়ের ঘর। রাজবাটী ইষ্টক প্রাচীরে পরিবেষ্টিত বটে, কিন্তু প্রাচীর তেমন সুদৃঢ় নহে এবং সকল স্থানে অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান নাই। একজন বিদেশীয় লোক প্রথম ইহা দর্শন করিলে, কখনও ইহা রাজবাটী বলিয়া স্থির করিতে পারে না। নূতন রাজবাটী নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যেরূপ আয়োজন দেখা যায়, তাহাতে ভাবিফল ভাল হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা।

রাজবাটীর উত্তর পূর্ব্ব দিকে রাজার জ্ঞাতি কুটুম্ব ইত্যাদি কতকগুলি লোকের বাটী। এই স্থানকে পুরাণাবাস বলে। রাজবাটী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নীলকুঠী পর্য্যন্ত ইষ্টকময় রাস্তা। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে রাজবাটীর প্রান্ত হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদিগের নানা প্রকারের দোকান। অনেক ব্যবসায়ীই এখন

---

* ১৮৮৩ সনের জুলাই মাস হইতে থানার ডাক উঠিয়া গিয়াছে। রাজকীয় পত্র গবর্ণমেণ্টের ডাকে প্রেরিত হয়। রাজকীয় কর্ম্মকারকগণ সার্বিস ষ্টাম্প ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইষ্টক ও টীন নির্ম্মিত গৃহ প্রস্তুত করিয়াছে। এই রাস্তার দক্ষিণ দিকে বাজার। ইতিপূর্ব্বে ক্ষুদ্র খেড়ীঘর থাকাতে ব্যবসায়ীদের বিশেষ কষ্ট হইত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, রাজকীয় ব্যয়ে টীনের ঘর প্রস্তুত হওয়াতে, সে কষ্ট দূর হইয়াছে। বাজার প্রত্যহ সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া, রাত্রি ৮।৯ ঘটিকা পর্যন্ত থাকে। কতকগুলি স্থায়ী দোকানদারও আছে। প্রাতে বাজার না থাকাতে অনেক লোকের অসুবিধা হয়, এজন্য নগরের দক্ষিণ ভাগে একটী বাজার সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার কার্য্য প্রাতঃকালে হয় বটে, কিন্তু এদেশীয় লোকদিগের অনেকেই সকাল বেলা হাট, বাজার করিতে ভাল বাসেনা, কেবল বিদেশীয় ভদ্রলোকেদের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করিয়া কথঞ্চিৎ চলিতেছে; এজন্য বাজারের অবস্থাও উন্নত হয় নাই। পুরাতন বাজারের দক্ষিণ দিকে লালদীঘী। এই দীঘীর পূর্ব্ব পারে শিল্প বিদ্যালয়, দক্ষিণ পারে থানা ও ডাক্তরখানা, পশ্চিম পারে কতকগুলি দোকান। শিল্প বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব দিকে বেশ্যালয় সকল সংস্থাপিত। অন্যান্য নগরের ন্যায় বেশ্যা সকল যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানে বাস করিতে পারে না। তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া নগরের পূর্ব্বাংশে বাস করিতে হইবে। বেশ্যা পাড়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে জেলখানা, উহা সুন্দর সুদৃঢ় ইষ্টকপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং নগরের সীমা স্থলে অবস্থিত। জেলখানার পশ্চিম দিকেই সৈন্যাবাস ও পুলিশ লাইন। এই লাইনের পশ্চিম দক্ষিণ দিকে, বৈরাগীর দীঘী নামক একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করা হইয়াছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে কেবল ভদ্রলোকের আবাস স্থান। এবং কতকদূর দক্ষিণে নূতন বাজার, নগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত।

রাজবাটী হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে সাগর দীঘী নামক এক প্রশস্ত দীর্ঘিকা। ইহার চতুঃপার্শ্বে বৃহৎ ২ অট্টালিকা সকল সংস্থাপিত। উত্তর পার্শ্বে ডিপুটী কমিসনর ও দেওয়ানের কাছারী এবং ট্রেজারী, পশ্চিম দিকে বোর্ডিং স্কুল, দক্ষিণ দিকে লাইব্রেরী এবং আদালত ও ফৌজদারীর কাছারী, পূর্ব্ব পারে ছাপাখানা, জেঙ্কিন্স স্কুল এবং নর্ম্মাল স্কুল। এই সকল অট্টালিকা বিলক্ষণ সুদৃশ্য। বাস্তবিক এস্থানটি এমত মনোরম যে, অন্যান্য সাধারণ জেলাতে এরূপ মনোরম স্থান প্রায় দেখা যায় না। সাগর দীঘীর পশ্চিমে তোর্ষা নদী পর্য্যন্ত নগরটী বিস্তৃত বটে, কিন্তু তোর্ষার ধারে কেবল এদেশীয় লোকের আবাস স্থান। নদী ও সাগর দীঘীর মধ্যে দেবীবাড়ী। এস্থানে শারদীয় পূজা হইয়া থাকে। পূজার সময় প্রত্যেক বৎসর কতকগুলি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। সাগর দীঘীর দক্ষিণ পারেও শহরটি তোর্ষা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নদীতে বার মাস

কথঞ্চিৎ পরিমাণে জল থাকে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কোনও কালে নগরের নিকট নৌকাদি আসিতে পারে না। নগরের বাণিজ্য কার্য্য স্থলপথেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। নগরের গঠন সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে বায়ু গমনাগমনের কার্য্যে কোনও অসুবিধা দেখা যায় না। সমস্ত সড়কগুলি নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সরল ভাবে বিস্তৃত এবং সড়কের সংখ্যাও অল্প নহে। বর্ষাকালে বদ্ধজল নির্গমনের বিলক্ষণ উপায় আছে। প্রত্যেক সড়কের পার্শ্বে নালা আছে ঐ গুলি নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সুতরাং বদ্ধজল অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারে। পল্লিগ্রাম অপেক্ষা নগরটী বিশেষ স্বাস্থ্যকর।

সহরের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্ব দিকে ইংরেজদিগের আবাস স্থান। উহা নীলকুঠী নামে প্রসিদ্ধ। নীলকুঠী একটী প্রশস্ত মাঠ, ইহার মধ্যভাগে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বাসোপযোগী উদ্যান শোভিত, সুদৃশ্য, কয়েকখানি বাসস্থান। পশ্চিম প্রান্তে টেলিগ্রাম আফিস ও অশ্বশালা, দক্ষিণ দিকে পীলখানা। পূর্ব্বে এস্থানে নীলের কুঠী ছিল। এই নীলকুঠী হইতে রাজপথ সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। স্থানটী বিলক্ষণ সুদৃশ্য ও মনোরম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হয় না। নীলকুঠীর উত্তর পূর্ব্ব দিকে একটী ছোট নদী আছে। এই নদীই এক প্রকার নগরের সীমা বলিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান শাসন প্রণালী।

কোচবিহার একটী করদরাজ্য। এদেশীয় আইনানুসারে শাসন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর অপূর্ণবয়স্ক বিধায় ১৮৬৪ সন হইতে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের হস্তে এরাজ্যের শাসনভার সমর্পিত আছে। ভোটান যুদ্ধের অবসানে ১৮৬৬ খ্রীঃ কোচবিহার, দারজিলিং, জলপাইগুড়ী, গোয়ালপাড়া গারো পাহাড় এই কয়েকটী স্থানকে এক কমিসনরীভুক্ত করা হয়। এবং আইন বর্জ্জিত প্রদেশরূপে গণ্য করা হয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ আসাম বঙ্গদেশ হইতে পৃথকরূপে গণ্য হইলে, কোচবিহার, রাজসাহী ও কোচবিহার কমিসনরী বিভাগের এক অংশ হইয়া পড়ে। মহারাজের প্রতিনিধি স্বরূপ রাজসাহী ও কোচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেব এরাজ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।* তন্নিম্নে

* ভূমিদান, পেনসন্ প্রদান এবং প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা বলবৎ করণ ব্যতীত মহারাজের অন্যান্য সমুদয় ক্ষমতা কমিসনরের আছে।

একজন ডিপুটী কমিসনর আছেন, তিনি নিজে কোচবিহারে অবস্থিতি করেন। সাধারণ ব্যবস্থা সমন্বিত প্রদেশ সমূহের জজ ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ইঁহার আছে। ইঁহার বিচার্য্য মোকদ্দমার আপীল কমিসনর সাহেবই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। তন্নিম্নে যে সকল কার্য্যকারক এবং বিভাগ আছে তাহার সম্যক্ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

ডিপুটী কমিসনরের আফিস।

এই আফিস দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ইংরেজী বিভাগ, এই বিভাগে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি বিষয়ক যাবতীয় কার্য্য হইয়া থাকে। সেসন ও দেওয়ানী উভয় বিধ মোকদ্দমা ডিপুটী কমিসনর বিচার করিয়া থাকেন। নিম্ন আদালতের আপীলও তাঁহার শুনিতে হয়। কার্য্যকারক নিযুক্তি বিষয়ক কার্য্যও এই বিভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিভাগকে অডিট্ আফিস বলে। ইহাতে মঞ্জুরী প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, কিয়ৎ পরিমাণ টাকা ডিপুটী কমিসনর মঞ্জুর করিতে পারেন, অধিক হইলে কমিসনর করিয়া থাকেন, এবং গুরুতর হইলে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর করেন। এই বিভাগে নিকাশের কার্য্যও হইয়া থাকে। রাজ্যের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় হিসাব এই বিভাগে তদন্ত হইয়া থাকে। বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের একাউণ্টেণ্ট জেনেরলের আফিস ও এই আফিসে মৌলিক কিছু প্রভেদ নাই। কেবল একটী অতি বৃহৎ এইমাত্র।

খাজানা বিভাগ।

এই বিভাগের তত্ত্বাবধারণের ভার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। প্রত্যেক মহকুমাতে একজন নাএব আহেলকার আছেন। রাজধানীতে দেওয়ানের একজন সহকারী আছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় অবস্থা তদন্তের জন্য ৬ জন কানুনগো আছেন। বঙ্গদেশীয় খাজানা সম্বন্ধীয় ১৮৫৯ সনের ১০ আইন অংশতঃ এ প্রদেশে প্রচলিত আছে। গড়ে বৎসর ২১৯৭ মোকদ্দমা রুজু হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যবস্থা সমন্বিত প্রদেশ সমূহে ১০ আইন সম্বন্ধীয় যে সকল মোকদ্দমার আপীল কালেক্টর নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, এখানে সেই সকল আপীলের বিচার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। অপর যে সকল আপীল জজ সাহেবের

নিকট হয়, তাহা এখানে ডিপুটী কমিসনরের নিকট হইয়া থাকে। অন্যান্য আপীল দেওয়ানের নিকট হইয়া থাকে। মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকগণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল উল্লিখিত মতে দেওয়ান ও ডিপুটী কমিসনরের নিকট হইয়া থাকে। খাজানা বিভাগকে সাধারণতঃ মালকাছারি বলে। ইহার কর্ত্তৃত্বাধীনে কতকগুলি জোত আছে। এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে গড়ে বার্ষিক ৪৫৭৫৪ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

আবকারী।

মালকাছারীর তত্ত্বাবধারণ ব্যতীতও কতকগুলি কার্য্যের ভার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। তন্মধ্যে আবকারী তত্ত্বাবধারণ। এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একজন দারোগা আছেন। দেশীয় মদ্য, গাঁজা ও আফিঙ্, প্রভৃতিতে এবং মাদক ব্যবসায়ীদিগের শুল্কাদিতে বার্ষিক প্রায় ৬০০০০ টাকা আয় হইয়া থাকে। এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ গড়ে বর্ষিক ৩২২৭ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ট্রেজারীর ভারও দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। ট্রেজারীটী গবর্ণমেণ্টের একটী শাখা ট্রেজারী। রাজকোষের এবং গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সকল কারবার হয় তাহা এখানে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ষ্টাম্প হইতেও রাজ্যের যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। কাগজগুলি ইংলণ্ড হইতে আনা হয় এবং এখানে মোহর দেওয়া হয়।

দেওয়ানী বিভাগ।

এই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী আহেলকার বলে। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজের যে সকল ক্ষমতা আছে দেওয়ানী আহেলকারের প্রায় তৎসমুদয় ক্ষমতাই আছে। প্রত্যেক মহকুমাতে যে সকল কার্য্যকারক আছেন তাঁহাদের এবং সদরস্থিত যে সকল সহকারী আহেলকার আছেন তাঁহাদের নিষ্পত্তিয় মোকদ্দমার আপীল দেওয়ানী আহেলকারকে নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং অধিক দাবীর মোকদ্দমা হইলে তাঁহার নিকটই রুজু হইয়া থাকে। দেওয়ানী আহেলকারের নিষ্পত্তিয় মোকদ্দমার আপীল ডিপুটী কমিসনরের নিকট হয়। সর্ব্বশুদ্ধ এই বিভাগে বৎসর ২৭৯৮

মোকদ্দমা রুজু হইয়া থাকে। এই বিভাগের জন্য গড়ে বার্ষিক ১৭৬০৩ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। দেওয়ানী আহেকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে রেজিষ্টরী আফিস। সদরে একজন সব রেজিষ্ট্রার আছেন এবং মহকুমার কার্য্যকারকগণেরও রেজিষ্টরী করার ক্ষমতা আছে। গড়ে প্রতি বৎসর রেজিষ্টরী কার্য্যে ৫০০০ টাকা আয় ও ১৫০০ টাকা ব্যয় হয়।

ফৌজদারী বিভাগ।

এই বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ককে ফৌজদারী আহেলকার বলে। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অধিকাংশ ইঁহার আছে। মহকুমাতে যে সকল কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদের হস্তে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহাদের নিষ্পত্তিয় মোকদ্দমার আপীল ডিপুটী কমিসনর গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার সফর্দ্দমতে ফৌজদারী আহেলকারের নিকটও আপীলের বিচার হইয়া থাকে। সেসনের মোকদ্দমা ডিপুটী কমিসনরই বিচার করেন। গড়ে বৎসর সমুদয় প্রকারের ২১০৫টী মোকদ্দমা হইয়া থাকে এবং ২০৪৮ ব্যক্তির বিচার হয়, তন্মধ্যে ১২০৯ লোকের দোষ প্রমাণিত হইয়া শাস্তি পায়। বৎসর অপমৃত্যুর সংখ্যা গড়ে ১৩৭, তন্মধ্যে আত্মহত্যা ৫, জলডুবা ৬৬, সর্পাঘাত ৩৪, বন্যজন্তুর গ্রাস ৩, অন্যান্য কারণে ২৯।

রাজ্য মধ্যে ৩৭টী খোঁয়াড আছে। তাহা হইতে বার্ষিক ৫০০০ টাকা আয় হয়, কার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

নগরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কার্য্যভার এবং শান্তি রক্ষার ভার ফৌজদারী আহেলকারের হস্তে ন্যস্ত আছে। নগরে ৩০ জন চৌকিদার আছে, প্রায় ২১৭০ টাকা চৌকিদারী টেক্স আদায় হইয়া থাকে। সাধারণের ব্যবহারের জন্য তিনটী পায়খানা আছে এবং তাহা পরিষ্কারের জন্য ৬ জন মেথর নিযুক্ত আছে, তাহারা বাজারও পরিষ্কার করে। নগরের প্রত্যেক রাস্তার চৌমাথার নিকট এক একটী বাতি দেওয়া হয়, তাহাতে সমস্ত শহর কথঞ্চিৎ আলোকিত হইয়া থাকে। বিগত বৎসর এক অত্যুচ্চ ঘণ্টাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ৬ জন কুলি পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। একটী দমকল কতকগুলি অগ্নি-নিবারক এবং ঘরে উঠিবার যন্ত্র আনা হইয়াছে। কোন স্থানে আগুন লাগিলে ঘণ্টা পড়ে এবং ঐ সকল লোক তথায় যাইয়া অগ্নি নিবারণের চেষ্টা করে।

আট জন লোক এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহাদের তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন ওবারসিয়র্ আছেন, তিনি চৌকিদারী টেক্সও আদায় করিয়া থাকেন।

এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ ব্যতীত ফৌজদারী আহেলকারকে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধারণ কার্য্য করিতে হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫টি মহাল ওয়ার্ডসের অধীনে আছে, তন্মধ্যে ৫০টীর উত্তরাধিকারী অনুপযুক্ত বিধায়ই ওয়ার্ডসে আছে, অপর ২৫টী দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জন্য আবদ্ধ আছে।*

জেলখানার পর্য্যবেক্ষণ ভারও ফৌজদারী আহেলকারের হস্তে ন্যস্ত আছে। জেলখানাতে গড়ে ১৮০ জন কয়েদী বৎসর অবস্থিতি করে। কয়েদীগণ নগরের জঙ্গলাদি পরিষ্কার করে, সময়ে সময়ে পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্য করে এবং ছাপাখানার কাজ করে। বৃদ্ধ কয়েদীদিগকে জেলখানার বাগানে কাজ করিতে হয়। প্রায় ৩০।৩৫ জন কয়েদী রুটি, তৈল, সুড়কি, ময়দা প্রস্তুতি এবং সূত্রধরের কাজে লিপ্ত থাকে। বৎসরে গড়ে ৮০০০ টাকা কয়েদীদিগের পরিশ্রমে আয় হইয়া থাকে এবং ১৬০০০ টাকা তাহাদের জন্য ব্যয় হয়। অল্প বয়স্ক কয়েদীদিগের শিক্ষার জন্য একটী পাঠশালা আছে, তথায় প্রত্যহ প্রাতে দুই ঘণ্টাকাল কয়েকজন কয়েদী অধ্যয়ন করে, একজন কয়েদীই শিক্ষকের কার্য্য করে।

দুই বৎসর যাবৎ গবোৎপাদক কার্য্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। কয়েকটী ষাঁড় এবং গাভী পশ্চিমদেশ হইতে আনা হইয়াছে। এদেশীয় গাভীগণ নিতান্ত ক্ষীণবল; বলবান্ বৃষের ঔরসে বলবান্ গরু জন্মিয়া ক্রমে দেশে সবল গরুর প্রচলন হইবে, এই উদ্দেশ্যেই এই কার্য্যটী আরম্ভ হইয়াছে। সদরে ৩টী এবং প্রত্যেক মহকুমাতে একটী করিয়া ষাঁড় আছে। যে সকল বৎস হয়, তাহা উপযুক্ত যত্ন অভাবে এখন পর্য্যন্ত তত সবল হয় না।†

ফৌজদারী বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১৮৩০৭ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

* সম্প্রতি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ভার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। অনেকগুলি মহাল ত্যাগ করা হইয়াছে। ৪।৫টী মাত্র রাখিয়া, তাহাদের তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন মেনেজার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

† সম্প্রতি কৃষি ও বনবিভাগ নামে, একটী নূতন বিভাগ সংস্থাপিত হইয়াছে। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, যিনি ইংলণ্ডে কৃষি বিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই এই বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। গবোৎপাদক কার্য্যালয়ের কার্য্য এই বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিগত পাঁচ বৎসরে রাজ্যে যত প্রকারের আয় এবং ব্যয় হইয়াছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া যাইতেছে :—

আয়।

	১৮৭৭-৭৮	১৮৭৮-৭৯	১৮৭৯-৮০	১৮৮০-৮১	১৮৮১-৮২
১। ভূমির রাজস্ব	৮২৩৪০৩	৮৫০৮৮৫	৯৪৪৩৭৯	৮৬০৩৪২	৮৭৮৪৭৩
২। ষ্টাম্প	৯৩০১০	১৪৪৪৭২	২১১২৪৩	১১৭৫০৭	১২৭৫৩৯
৩। সুদ	৮৪২৭০	১০২০৬৬	৭৭৪২৩	৭৭৪০৪	৯৫৬৯১
৪। দেবত্র	৮০৪৯৫	৪৫২৯০	৯০৮৬৭	৮৪১৮৩	৮৪৬১৭
৫। অন্যান্য	৬৩৬৯৭	৬৬৩৪৮	৩৬৪৪২	৬৪১৭৩	৩৬২০১
৬। আবকারী	৪[illegible]৮২০	৫২৬৫০	৫৭৭৫১	৫৯২২৬	৬২৬৩৫
৭। দেওয়ানী ও ফৌজদারী	৫১৩৮	৮৭৫৪	৭৬৪৫	৮৯১৩	৯১৪৫
৮। জেলখানা	৬৫৯১	৯২৯২	৮৮২২	৭৩৩৮	৭৫৫০
৯। রেজেষ্টরী	৩৬৬৪	৪২৬৪	৫৬৯৬	৪০৪৪	৬৩৩৪
১০। শিক্ষা বিভাগ	২৯৮৯	১৭২২	১৬৯৩	১৯৩০	২৩৯১
১১। পূর্ত্ত বিভাগ	১৩৫০৬	২৯১৭৯	৩০০০৬	১০৩০৬	৯৮১০
	১২২৬৫৭২	১৩৫৪৭২১	১৪৭২০০৭	১২৯৫৩৬৬	১৩২০৩৯৫

	ব্যয়।				
	১৮৭৭-৭৮	১৮৭৮-৭৯	১৮৭৯-৮০	১৮৮০-৮১	১৮৮১-৮২
১। রাজা ও তদীয় পরিবার পোষণাদি	১৮৯২০৫	২৯৫৮৩৭	২৪৮০১৮	২৮২৫৭৫	৩০৯৪৯৪
২। রাজস্ব	১১১১০৯	১১৩৪৫৫	১১২৪৫০	১১৫৯০১	১১৫৫৭৭
৩। শিক্ষা বিভাগ	৬১৫৭৫	৫৯৭৭২	৬৩৬৬৬	৬১৮১৩	৬২২৩৭
৪। ফৌজদারী ও দেওয়ানী	৪৬০৬২	৪৯২৭৬	৪৮৩৩৫	৫৪১২৯	৫৩৪৫৫
৫। শাসন	৪৭৪৪১	৫২১৫২	৫২৬৬৪	৫৩৩২২	৪৬৬৫৭
৬। জেল	২৭৬৪৯	২০৫৬৮	১৭৭০২	১৯৮৯২	১৬৭৩৬
৭। পুলিশ	৪৩২০৯	৪৭৬৭৫	৬৭৪০৪	৪৮২৭০	৪৮০৮০
৮। সৈন্য	২২০৭৫	১৩৮১১	১৪৬৪৩	১৭৪৯৫	১৫২১৩
৯। অন্যান্য	৭০৪৩৪	১৪০৫৬৭	৯৫০৬২	৮৪১৭৩	৮৭৯৯২
১০। পেন্সন ও অন্য দাতব্য	৩০৪০৭	২৯৬৬৮	২৬৬৫৯	২৫৮৬৩	২৬৬২৪
১১। দেবত্র	৪২০২৫	৩৬৭৮৯	৩৫৬২৬	৩৪৬৪২	৩৫৮৫৯
১২। চিকিৎসা বিভাগ	২০৪৮৬	২১৬৩১	২২৫৫৫	২৩৭০১	২৪৩২০
১৩। রেজেষ্টরী	২৪৪১	২৬৯৯	৩০১০	২৫৩১	৩০৬৫
১৪। আবকারী	৭৮৪২	৮৪৪৭	৭৮২৩	৭৬৮৭	৬৮৬৮
১৫। ছাপাখানা ও ষ্টাম্প	১২৩১১	১৫৯২১	১৮২৪০	১৬৬৩২	১৩৭৮৭
১৬। পূর্ত্ত বিভাগ	৪৫৬৩০০	২৬০১০০	৩০১৫০০	৩৩৬৮৯৯	২৯৭০৭০
১৭। রাজার বিবাহ	১৫৫০৫৪	৪৮৪৪	...	...	...
	১৩৪৬৪২৪	১১৭৩২১২	১১১৫৭৫৭	১১৮৫৫২৫	১১৬৩৪৩৪

শিক্ষা বিভাগ।

বর্ত্তমান সময়ে নানা প্রকারের ৩১৮টী স্কুল আছে এবং তথায় ৯২৬০টী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়; এই বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে। ১৮৫৯ খৃঃ গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরের পূর্ব্বোত্তর সীমানার এজেণ্ট, মহামতি জেঙ্কিন্‌স্ সাহেবের নামানুসারে এই স্কুলের নাম হইয়াছে; এই স্কুল হইতে অনেক ছাত্র প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। এই স্কুলের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ রাজকীয় ৫০০০ টাকা বার্ষিক ব্যয় হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত একটী প্রথম শ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুল আছে। অন্যান্য স্কুলের মধ্যে দুইটী মডেল বিদ্যালয় কেবল রাজকীয় ব্যয়েই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অপর ৪টী মাইনর স্কুল, ৮২টী মধ্যম বঙ্গ স্কুল এবং ১২২টী উচ্চ পাঠশালা, ২১টী রজনী-বিদ্যালয়, ৩১টী বালিকা বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য রাজকোষ হইতে প্রায় অর্দ্ধ পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়, অপরার্দ্ধ গ্রামিক লোকেরা প্রদান করে।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিদ্যালয় আছে, তাহাতে সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হয় না। কেবল স্থানীয় লোকের সাহায্যেই চলিতেছে। তন্মধ্যে ৩টী মধ্যম বঙ্গ, ৩০টী উচ্চ পাঠশালা, ৪টী রজনী এবং ২টী বালিকা বিদ্যালয়।

রাজার জ্ঞাতি কুটুম্বাদির নিবাসের জন্য একটী ছাত্রাবাস আছে, রাজকীয় ব্যয়ে তথাকার ছাত্রবৃন্দের খরচাদি চলে। ছাত্রেরা তথায় থাকিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করে। ইহা ব্যতীত আর একটী বোর্ডিং স্কুল আছে, তাহা বাঁকিপুরে অবস্থিত, তথায় কয়েকজন রাজগণ আছেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা কার্য্য তত্ত্বাবধারণ জন্য, একজন তত্ত্বাবধায়ক আছেন।

রাজার লাইব্রেরী নামে একটী বিস্তৃত পুস্তকালয় রাজধানীতে অবস্থিত আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর ২০০০ টাকা মূল্যের পুস্তক আনীত হয়।

শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক তিনজন ডিপুটী তত্ত্বাবধায়ক এবং ৪ জন পাঠশালা তত্ত্বাবধায়ক আছেন। গড়ে প্রতি বৎসর শিক্ষা বিভাগের জন্য রাজার ৬০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

এই সকল স্কুল ব্যতীত একটী শিল্প বিদ্যালয় রাজধানীতে সংস্থাপিত আছে; তাহাতে কর্ম্মকার, সূত্রধর এবং অন্যান্য শিল্পকার্য্য শিক্ষা হইয়া থাকে। ১৮৬৯ খৃঃ এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হয়। ১৮৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত শিক্ষা-বিভাগের প্রধান

তত্ত্বাবধায়কের হস্তে ইহার কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল, ঐ সময় হইতেই পূর্ত্ত বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

চিকিৎসা বিভাগ।

রাজ্যের এবং রাজধানীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন সিবিল সার্জ্জন আছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নিম্নলিখিত কয়েকটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ১। সদর; ২। মাথাভাঙ্গা; ৩। মেকলীগঞ্জ; ৪। দীনহাটা। প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যভার এক এক জন নেটিব ডাক্তরের হস্তে ন্যস্ত আছে। কেবল সদর চিকিৎসালয়ের জন্য একজন অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আছেন। এতদ্ব্যতীত সহরের উপর কয়েদী; পুলিস ও সৈন্য-দিগের চিকিৎসা জন্য দুইটী চিকিৎসালয় আছে। ইহার কার্য্যের ভার একজন নেটিব ডাক্তরের হস্তে অর্পিত আছে।

সংক্রামক জ্বর, বসন্ত, ওলাউটা, বাত, উপদংশ, আমাশয়, প্লীহা, চর্ম্মরোগ প্রভৃতি রোগই এ প্রদেশে প্রধান। দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসা জন্য গড়ে দশ আনা ব্যয় হইয়া থাকে। গড়ে প্রতি বৎসর এই বিভাগের জন্য অন্যূন ২৫০০০ টাকা ব্যয় হয়।

কয়েক বৎসর গত হইল এখানে গোমসূর্য্যাধান পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। সম্প্রতি আর কেহ বাঙ্গালা টীকা দিতে পারে না। রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ লোকের নূতন প্রণালীতে টীকা হইয়াছে, শীঘ্রই সমুদয় লোকের টীকা দান কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

পুলিস বিভাগ।

বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ আছেন।

১ জন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।
৩ „ ইন্‌স্পেক্টর্।
৯ „ সব্‌ ইন্‌স্পেক্টর্।
২৪ „ হেড্‌ কনেস্টবল্।
২৫৯ „ কনেস্টবল্।

রাজ্য মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী থানা আছে।

১, কোতয়ালী। ২, তুফানগঞ্জ। ৩, দীনহাটা। ৪, মাথাভাঙ্গা। ৫, মেকলীগঞ্জ। ৬, হলদিবাড়ী।

এতদ্ব্যতীত কয়েকটী আউট্ পোষ্ট আছে।

১, খোলটা। ২, ভৈষকুচী। ৩, কোটভাজনী। ৪, ক্ষেতি। ৫, শীতলখুচী। ৬, সীতাই। ৭, গীতলদহ।

১৫৫৯ জন গ্রাম্য চৌকিদার আছে। গ্রামিক লোকেরাই তাহাদের বেতন প্রদান করে। গবর্ণমেণ্টের অধীন প্রদেশ সমূহে প্রচলিত চৌকিদারী আইন রাজ্য মধ্যে প্রচলন করিবার প্রস্তাব হইতেছে। বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার পুলিশের কাজ কর্ম্ম এস্থান হইতে কিছুই বিভিন্ন নহে, কাজেই তাহার পৃথক বিবরণ দেওয়া গেল না।

এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ৪৮০০০ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

সৈন্যব্যূহ।

রাজসম্মান রক্ষার জন্য এখানে একদল সিপাহী সৈন্য আছে, তাহাদের সংখ্যা ৮০ জন মাত্র। তাহাদের প্রধান তত্ত্বাবধায়ককে স্নবেদার মেজর বলে। অধিকাংশ সিপাহী পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কেবল ৫ জন মাত্র অশ্বারোহী আছে। আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা সহায়তা করিবেন কাজেই এখানে অধিক সৈন্য রাখার আবশ্যকতা নাই। সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক প্রায় ১৩৮০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

পূর্ত্ত বিভাগ রাজপথ ইত্যাদি।

বাণিজ্য ও সর্ব্বসাধারণের গমনাগমনের সুবিধার জন্য রাজ্য মধ্যে অনেকগুলি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত আছে এবং পথের মধ্যবর্ত্তী নদী সকলে কাষ্ঠময় ও লৌহময় সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ভদ্রলোকের বিশ্রাম জন্য মধ্যে মধ্যে ডাক-বাঙ্গলা আছে। এতদ্ব্যতীত নগর মধ্যে যে সকল অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তাহা মেরামত এবং নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ পূর্ত্ত বিভাগের সৃষ্টি। এই বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগের তত্ত্বাবধারণ জন্য

একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী আছেন। নূতন রাজবাটী নির্ম্মাণের কার্য্যই কেবল এই বিভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্যভার একজন বাঙ্গালীর হস্তে ন্যস্ত আছে। তাঁহার একজন সহকারী এবং কয়েকজন ওবারসিয়র্ এবং সব্ ওবারসিয়র্ আছেন। গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় তিন লক্ষ টাকা এই দুই বিভাগে ব্যয় হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত রাজপথ সকল বর্ত্তমান আছে।—

বিহার হইতে হলদিবাড়ী ৪৩ মাইল।
বিহার হইতে খেড়বাড়ী ১৯ মাইল। এই পথ ধুবড়ি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
বিহার হইতে গীতলদহ ২২ মাইল। এই পথ রঙ্গপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
বিহার হইতে খোল্টা ১২ মাইল। এই পথ বাক্সা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
বৌতিপথ হইতে ৪ মাইল।
বিহার হইতে লাউকুঠী ২৬ মাইল। ইহার এক শাখা ফলিমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
দীনহাটা হইতে মেকলীগঞ্জ ৪০ মাইল।
মাথাভাঙ্গা হইতে শীতলখুচী ১২ মাইল।
বিহার হইতে গোসানিমারী ১৪ মাইল।
বিহার হইতে কালীঘাট ২ মাইল।
পূর্ব্বভাগপথ ১২ মাইল।
সীতাইপথ ৬ মাইল।
বিহার হইতে শুক্টাহাট ২ মাইল।
বিহার হইতে শিশবতলা ২ মাইল।
মেকলীগঞ্জ হইতে চাঙ্গরাবান্ধা ৫½ মাইল।
দেওয়ানগঞ্জ হইতে পশ্চিমপথ ৩ মাইল।
হলদিবাড়ী হইতে কাশিয়াবাড়ী ২½ মাইল।
সীতাই হইতে দুর্গাপুর ৭ মাইল।
চৌধুরীহাট হইতে বামনহাট ২ মাইল।
তুফানগঞ্জ হইতে লাউকুঠীর সড়ক ৪½ মাইল।
হলদিবাড়ী হইতে মাণিকগঞ্জ ৩½ মাইল।
বলরামপুর হইতে দীনহাটা ১২¾ মাইল।
সাগরদীঘীপথ ৩ মাইল।
ফালাকাটাপথ ৬ মাইল।

বিহার হইতে গুদাম ২ মাইল।

বাণেশ্বরপথ ২ মাইল।

পাটগ্রাম হইতে মোরঙ্গারহাট ১৫¾।

বিহার হইতে হলদিবাড়ী পর্য্যন্ত পথে অনেকগুলি কাষ্ঠময় সেতু আছে; তন্মধ্যে টানাটানী, চেনাকাটা, ধল্লা, সানিয়াজান, বুড়া তিস্তা প্রভৃতি নদীর উপর যে সকল সেতু আছে, তাহাই প্রধান। লাউকুঠীর পথে ঘড়ঘড়িয়া ও গদাধর নদীর উপর কাষ্ঠময় সেতু আছে। রঙ্গপুরের পথে কালীঘাটের নিকট তোর্ষা নদীর উপর স্থনীতিপুল নামে একটী লৌহসেতু সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৫১০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে; সেতুটীর দৈর্ঘ্য ২৪০ ফুট। এই পথে মানসাই নদীর উপর কাষ্ঠময় সেতু আছে।

হলদিবাড়ী, মেকলীগঞ্জ, বালাহাট, মাথাভাঙ্গা, গীতলদহ, দীনহাটা প্রভৃতি স্থানে ডাকবাঙ্গলা আছে।

PART—II.

MYTHOLOGICAL PERIOD.

দ্বিতীয় খণ্ড।

কাল্পনিক সময়।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় কোনও দেশের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইলে এমন কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না যে, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে। যদিচ কোন কোন গ্রন্থকার তাঁহাদের হস্তলিপি ও অন্যান্য পুস্তকে কিছু কিছু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও অনেক স্থলে কাল্পনিক বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং পুরাকালের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইলে দেশ প্রচলিত প্রবাদ ও গাথার উপর অনেক নির্ভর করিতে হইবে। আমরা যে সময়ের যে বিবরণ আরম্ভ করিলাম তাহার ভিত্তিমূল নিতান্ত অপ্রামাণিক ও কাল্পনিক। তথাপি দেশীয় প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কোচবিহারের ইতিহাস লিখিতে হইলেই বর্ত্তমান রাজবংশের রাজত্বের পূর্ব্বে ইহার কিরূপ অবস্থা ছিল তদ্বিবরণ জানা আবশ্যক। আমরা অগ্রে সেই বিবরণ প্রকটন করিতেই যত্ন করিলাম।

অনেকেই অবগত আছেন যে কামরূপ একটী প্রাচীন রাজ্য। পণ্ডিতবর রজনীকান্ত গুপ্ত তদীয় ভারত ইতিহাসে লিখিয়াছেন "কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর। সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের পিতামহ দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এস্থানে আসিয়া এরাজ্য জয় করিয়াছিলেন"। রাজা রঘু ত্রেতাযুগের লোক, সেই সময়ের এদেশীয় বিবরণ আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কোন প্রবাদও প্রচলিত নাই, কাজেই আমরা সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কামরূপকে পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর বা প্রাক্‌দেশ বলিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই; এই বিষয় পরেও উল্লেখ করা যাইবে।

পুরাকালে সমুদয় আসাম বিভাগ, রঙ্গপুর ও রাঙ্গামাটী বিভাগ, ময়মনসিংহ

ও শ্রীহট্টের কতক অংশ এবং কোচবিহার বিভাগে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। কামরূপে তাঁহার রাজধানী ছিল এবং এই রাজ্যকে কামরূপ রাজ্য বলিত।

কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী পুত্র নরককে কামরূপের রাজত্ব প্রদান করেন। যদিচ নরক অসুর ছিলেন, কিন্তু দেবতাগণ তাঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিতেন। এবং তাঁহার হস্তে কামাখ্যার মন্দির রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। কামাখ্যা হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। নরক কামাখ্যায়ই বাস করিতেন এবং ভগবতীর মন্দিরের তত্বাবধারণ করিতেন।

এই সময়ে কামরূপ চারি অংশে বিভক্ত ছিল, তাহার প্রত্যেক অংশকে পীঠ বলিত যথা :—কামপীঠ, রত্নপীঠ, স্বর্ণপীঠ, চুমারপীঠ। কোচবিহার, রত্নপীঠ নামক বিভাগের অন্তর্গত ছিল। নরক অনেক দিন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র থাকিতে পারিলেন না; তিনি অত্যন্ত প্রজা পীড়ক ছিলেন এবং মহাদেবের উপাসনা করিতেন, কাজেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার পুত্র ভগদত্তকে কামরূপের রাজত্ব প্রদান করিলেন।

আমরা অনেক স্থলে ভগদত্তের উল্লেখ পাইয়াছি। মহাভারতের সভাপর্ব্বে উল্লিখিত আছে, অর্জ্জুন দিগ্বিজয় উপলক্ষে কামরূপ জয় করিতে যান, তথায় ভগদত্তের সঙ্গে তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উক্ত পর্ব্বে ভগদত্ত বিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে ও তাঁহার সৈন্য সমূহের যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভগদত্ত এতদ্দেশীয় রাজা ছিলেন।

দ্রোণপর্ব্বে উল্লিখিত আছে, ভগদত্ত দুর্যোধনের পক্ষ হইয়া কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুন হস্তেই নিধন প্রাপ্ত হন। আইন আকবরীতেও ভগদত্তের বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। আইন আকবরীতে আরও উল্লেখ আছে যে, ভগদত্তের মৃত্যুর পর ঐ বংশীয় ২৩ জন ভূপতি যথাক্রমে কামরূপ রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা দুষ্কর, কেননা এই গ্রন্থের মতানুসারে ভগদত্তের বংশধরেরা সমগ্র বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা হইয়া পড়েন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সঙ্গত বোধ হয় না।

তন্ত্র মতে এই রাজবংশের বিবরণ যতদুর অবগত হওয়া যায় তাহাও সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ নহে। তন্ত্রে ভগদত্তের বিশেষ উল্লেখ নাই। কোনও তন্ত্র মতে উক্ত বংশীয় জল্লেশ্বর নামক ভূপতি জলপেশ নামক স্থানে শিব মন্দির প্রস্তুত করেন; অদ্যাপি সেই মন্দির বর্ত্তমান আছে। এই জলপেশ জলপাইগুড়ী

জেলার অন্তর্গত। এখানে শিব-চতুর্দ্দশী উপলক্ষে এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। অন্য তন্ত্র মতে এই মন্দির শুভ্র বংশীয় রাজাদিগের স্থাপিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কোন কোন তন্ত্র মতে নরকের বংশ বিলুপ্তির পরই শুভ্র বংশীয় রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করেন।

এই বংশের পৃথু রাজা বিলক্ষণ খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। চাকলা বোদা ও বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে তাঁহার রাজধানী ছিল। সেই রাজধানী মৃণ্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শুভ্র বংশীয় রাজগণ যে সমুদয় কামরূপ শাসন করিতেন, এরূপ সম্ভব হয় না। এই সময়ে আসাম বিভাগের অনেক অংশ বিভিন্ন হইয়া পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়।

শুভ্র বংশের পরেই পাল বংশীয় নৃপতিগণ এরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই পাল বংশীয়েরা বাঙ্গলার বৈদ্য বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী পাল বংশীয়দিগের বংশ সম্ভূত বা সম্পর্কান্বিত বলিয়া অনুমিত হয়। এ বংশের প্রথম রাজা ধর্ম্মপাল। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিত আছে "পাল বংশের প্রথম রাজা ভূপাল, তৎপুত্র ধর্ম্মপাল হিমালয় প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন। দিনাজপুরে মহীপালের দীঘী অদ্যাপি মহীপাল নামক রাজার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।" অদ্যাপি ডিমলার কয়েক মাইল দক্ষিণে ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। ধর্ম্মপালের রাজত্ব পশ্চিম দক্ষিণে দিনাজপুর, বগুরা এবং উত্তর পূর্ব্বে তেজপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; ইহা কয়েকখানি তাম্রশাসন ও তৎকালীয় মুদ্রা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে। ধর্ম্মপালের পুরাতন নগর জেলা রঙ্গপুরে তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা কোচবিহারের সীমান্ত প্রদেশ হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

মীনাবতী নামে ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃজায়া ছিলেন। ধর্ম্মপাল নগরের দুই মাইল পূর্ব্ব দিকে তাঁহার দুর্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিনি তদীয় পুত্র গোপীচন্দ্রের পক্ষে ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং এক যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। পরে আর ধর্ম্মপালের বিষয় কিছু শুনা যায় না। গোপীচন্দ্র

রাজা হইলেন বটে, কিন্তু সমুদয় ক্ষমতা মীনাবতীর হস্তেই রহিল। তিনি কয়েক দিবস রাজত্ব করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তৎপুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। রাজা ভবচন্দ্র ও তদীয় মন্ত্রীর বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে।

রাজা অসময়ে তদীয় উপাস্য দেবতার গৃহে প্রবেশ করিলে, দেবী ক্রোধ-পরবশা হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন যে "রাজা ও মন্ত্রীর সাধারণ বুদ্ধি লোপ পাইয়া যাইবে।" তাঁহারা সাধারণ লোকের মত কোন কাজ করিতেন না; দিনের বেলায় নিদ্রা যাইতেন, রাত্রিতে জাগরিত থাকিতেন। মন্ত্রী এক বাক্সের ভিতর বদ্ধ থাকিতেন, কঠিন বিষয়ের পরামর্শ আবশ্যক হইলে মন্ত্রীকে মুক্ত করা হইত। রাজা ও মন্ত্রীর দুই একটী বিচারের কথাও এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। বোঝাই নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে কোন ব্যবসায়ী রাজার নিকট আবেদন করিল। রাজা মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কুম্ভকারকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ করিলেন; কারণ কুম্ভকার ধূমোৎপাদন করিয়াছে তদ্দ্বারা মেঘ ও ঝড়ের সৃষ্টি হইয়া ব্যবসায়ীর নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। একদা দুই পথিক কোন পুষ্করিণীর নিকট উনন খনন করিয়া পাক করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই দুই ব্যক্তি গুপ্তভাবে মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীটী অপহরণ করিবে, এই মানসে এইরূপ কার্য্য করিতেছে সুতরাং তাহাদিগকে চোর মনে করিয়া শূলে চড়াইতে আদেশ দিলেন। শূল প্রস্তুত হইলে উপায়হীন পথিকগণ প্রত্যেকেই বড় শূলে যাওয়ার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, মহারাজ! আমরা দৈবশক্তি প্রভাবে জানিতে পারিয়াছি যে এই শূল দুইটী বিলক্ষণ শুভক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার বড় শূলে যে আরোহণ করিবে পর জন্মে সে সমুদয় পৃথিবীর রাজা হইবে; এবং ছোট শূলে আরোহণ করিলে মন্ত্রী হইবে। ইহা শুনিয়া রাজা এবং তদীয় মন্ত্রী শূলে আরোহণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।* পরে পল নামক একব্যক্তি রাজপদ গ্রহণ করেন। তিনি এই বংশের শেষ রাজা। অনন্তর কান্তেশ্বর রাজবংশ প্রাদুর্ভূত হইল।

---

* বাঘদুয়ার পরগণার অধিবাসী বাবু বিপিনবিহারী চন্দ্র ভবচন্দ্র রাজার বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া উল্লিখিত জনপ্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

নীলধ্বজ নামক কোন ব্যক্তি পাল বংশীয় শেষ রাজাকে বিনাশ করিয়া তদীয় সিংহাসন অধিকার করেন। নীলধ্বজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিম্বদন্তী আছে। ইনি শৈশবে কোন এক ব্রাহ্মণের গো রক্ষক ছিলেন। মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং নিদ্রাভিভূত থাকাতে, গো সকল নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্র সমূহের শস্যাদি অপচয় করে; তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ক্রোধপরবশ হইয়া ভৃত্যকে শাসন মানসে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সামুদ্রিক জ্যোতিষ বলে জানিতে পারিলেন যে, ভৃত্য সাধারণ বালক নহে, তাহার শরীরে রাজ চিহ্ন আছে; পরে ব্রাহ্মণ এই সমুদয় বিষয় ভৃত্যকে অবগত করাইলেন। কালক্রমে ভৃত্য রাজা হইলেন। কিন্তু কি প্রকারে রাজা হইলেন তৎসম্বন্ধে কোন প্রবাদ নাই। তিনি রাজা হইয়া আপন পূর্ব্ব প্রভু ব্রাহ্মণকে মন্ত্রী করিলেন। ইনিই মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া কামরূপে সংস্থাপন করেন। এবং গোসানিমারীতে কান্তাপুর নগরের সন্নিবেশ করেন। নীলধ্বজের পর চক্রধ্বজ ও তদনন্তর নীলাম্বর রাজা হন। ইনিই এই বংশের শেষ রাজা। ইনি সাধারণতঃ কান্তেশ্বর নামে বিখ্যাত ছিলেন। গোসানী মঙ্গল নামে একখানা লিখিত গ্রন্থ ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লিখিত আছে যে, প্রথমে শ্রীবৎস রাজা কামরূপে রাজত্ব করিতেন, পরে ভগদত্তের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ভগদত্তের বংশ বিলুপ্তির পর কয়েক বৎসর অরাজক ছিল। পরে মহাদেব জাম-বাড়ী গ্রামের ভক্তেশ্বর নামক ভক্তের এবং তদীয় পত্নী অঙ্গনার* প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কান্তেশ্বর নামক পুত্র প্রদান করেন। এই কান্তেশ্বরই আদি ও শেষ রাজা। এই পুস্তক মতে ধর্ম্মপাল নামক নগর এই রাজার নির্ম্মিত। কিন্তু এতাদৃশ পুস্তকের কিছুই বিশ্বাস যোগ্য নহে, কেননা উহা কেবল উপাখ্যানেই পরিপূর্ণ।

কান্তেশ্বরের রাজত্বকালে কামরূপ রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ এবং ঘোড়াঘাটস্থিত দুর্গ এই রাজার নির্ম্মিত। বিহার হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে কান্তাপুর নামক স্থানে যে সকল পুরাতন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে, তাহা কান্তেশ্বরের বাটী বলিয়া বিখ্যাত। অদ্যাপি বাটীর প্রাচীর সকল অক্ষুণ্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজবাটী, রাজবর্ত্ম, দীর্ঘিকা, প্রভৃতি যে সকল কীর্ত্তি ভগ্ন ও জীর্ণাবস্থায় পতিত আছে,

* মূল পুস্তকে রঙ্গনা লিখিত আছে এদেশে "অ"কে "র" এবং "র"কে "অ" বলিয়া থাকে তাহা হইতেই বোধ হয় রঙ্গনা নাম হইয়াছে।

তদ্দৃষ্টে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় যে, পুরাকালে এই স্থানে কোন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার রাজধানী ছিল। রাজা কান্তেশ্বরের সময়ের প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা অদ্যাপি এ প্রদেশের স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।† এমন আরো অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান আছে যে তদ্দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে, তাঁহার রাজত্ব কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাজা কান্তেশ্বর স্বাভাবিক সন্দেহ বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, এক দিবস অন্তর্ব্বাটীতে পুরুষ যাতায়াতের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন এবং বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা অবিলম্বে এই গুপ্ত প্রবেশকারীকে ধরিয়া আন। প্রহরীগণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে প্রকাশ পাইল যে, গুপ্ত প্রবেশকারী মন্ত্রী শচীপত্রের পুত্র, মহারাণীর প্রণয় পরতন্ত্র হইয়া অন্তঃপুরে যাতায়াত করেন। রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া মন্ত্রী পুত্রকে গোপনে নিহত করিলেন। পরে এক নিমন্ত্রণের আয়োজন করিয়া নিহত ব্যক্তির শরীরের কতক মাংস পাক করাইলেন এবং মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শচীপত্র পুত্র হত্যার বিবরণ বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিলেন না। তিনি নিঃসন্দেহে আহার করিতে বসিলেন; ভোজনান্তে রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন মাংস কেমন হইয়াছে। মন্ত্রী বলিলেন, বিশেষ সুখাদ্য হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুত্রের মুণ্ড বস্ত্রাবৃত করিয়া তাঁহার সঙ্গে দিলেন এবং বলিলেন যে তোমার জন্য আরও মাংস রাখিয়াছিলাম, তাহা বাটীতে নিয়া যাও, মন্ত্রী বাটী আসিয়া মাংসের বস্ত্রাবরণ মুক্ত করিলেন, এবং স্বকীয় পুত্রের ছিন্ন মস্তক দর্শনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু শোকে বিহ্বল না হইয়া, ইহার প্রতিশোধ দিবার উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। পর দিবস প্রাতে রাজসভাতে যাইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আমার পুত্র অপরাধী সত্য; তাহাকে যে বিনাশ করিয়াছেন তাহাতে আমার অনুমাত্রও আক্ষেপ নাই, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী আমাকে গোপনে পুত্রমাংস ভোজন করান আপনার পক্ষে ন্যায়ানুগত ও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। সুতরাং আমি আর আপনার কাজ করিতে ইচ্ছা করি না, এই বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এবং সন্ন্যাসী বেশে গৌড় নগরে মুসলমান সুবাদারের নিকট উপস্থিত হইলেন। মুসলমান সুবাদার কান্তেশ্বর রাজের রাজ্যের

---

† এক সময়ে ১৩ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুদ্রাগুলি একটী কূপ মধ্যে প্রোথিত ছিল সেই কূপ যখন নদীতে ভাঙ্গিয়া নেয় তখন এই মুদ্রা পাওয়া যায়।

আভ্যন্তরিক অবস্থা সুচারুরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সন্ন্যাসীর প্রবর্ত্তনায়, রাজ্য লোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইলেন। তিনি সেনাপতিকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এরাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ঘোড়াঘাট নামক স্থান দুর্গ বদ্ধ করিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মুসলমানেরা রাজা কান্তেশ্বরকে আক্রমণ করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার দুর্গ এরূপ দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, তাহাদের আক্রমণ নিষ্ফল হইল। ১২ বৎসর অবরোধের পরও মুসলমান সেনাপতি কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে মুসলমান সেনানায়ক বল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছলের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। কান্তেশ্বরের নিকট এক দূত প্রেরিত হইল, দূত মুখে কান্তেশ্বরকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমাদের এরাজ্য অধিকারের সমুদয় আশা বিফল হইয়াছে। আমরা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। সন্ধি হইলে পর বন্ধুভাবে আমরা আপনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত আছি। কান্তেশ্বর সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; পরে সন্ধির নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইল; মুসলমান সেনাপতি বলিলেন মহাশয় বিদায় কালে আমাদের সঙ্গীয় স্ত্রীলোক সকল আপনার অন্তর্ব্বাটীস্থ মহারাণীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আদর সম্ভাষণ ও উপযুক্ত সম্মান প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রাজা তাহাতেও সম্মত হইলেন। মুসলমান সেনাপতি বহুবিধ শিবিকা দুর্গ মধ্যে প্রেরণ করিলেন। শিবিকার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও তাহার বাহকগণ বাহকবেশধারী সৈনিক পুরুষ। তাহারা লব্ধপ্রবেশ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিল এবং অনায়াসে দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইল। এবং রাজাকে বন্দী করিয়া লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিল। সুবাদারের সন্তোষার্থে লৌহ পিঞ্জর গৌড়নগরে প্রেরিত হইল; পথি মধ্যে কান্তেশ্বর পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সমুদয় যত্নই বিফল হইল। পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঘোড়াঘাট নিবাসী মুসলমানেরা বলে যে তাহাদের শাসনকর্ত্তা ইস্মাইল গাজী কান্তেশ্বরকে পরাজয় করেন, কিন্তু ইহা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ ইস্মাইল গাজী নছরত সাহার রাজত্ব সময়ে ঘোড়াঘাটের শাসনকর্তা ছিলেন ১৫২৩ খৃঃ অব্দে নছরত সাহার রাজত্ব আরম্ভ হয়, কিন্তু কান্তেশ্বরের পরাজয় ইহার অনেক পূর্ব্বে প্রায় ১৪৯৬ খৃঃ অব্দে হোসেন শাহ কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছিল। ডাক্তর বুকানন সাহেবও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ঘোড়াঘাটের মুসলমানেরা ইস্মাইল গাজীর প্রতি প্রবল ভক্তি বশতঃই এরূপ বলিয়া থাকে।

এস্থলে কান্তেশ্বরের বাটীর একটি বিবরণ বিবৃত করা কোন মতেই অসঙ্গত বোধ হয় না। কান্তাপুর পূর্ব্বে ধল্লা নদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ছিল এবং এই নদীই এক পার্শ্বের রক্ষক স্বরূপ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে নদীর গতি পূর্ব্ব দিকে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজধানীর পূর্ব্ব দিকে যে পুরাতন সোতা দৃষ্ট হয় তদ্দারাই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্ব কালে এস্থলে বৃহৎ নদী ছিল।

সিংমারী নদী নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রবেশ এবং নির্গমন স্থানের পুরাতন কীর্ত্তি সকল বিনষ্ট করিয়াছে। এরূপ অনুমিত হয় যে যখন এস্থলে লোক বাস করিত তখন ইহার বেগ বড় প্রখর ছিল না এবং নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেও পারে নাই। বাঁধ ইত্যাদি দ্বারা ইহার বেগ নিবারণ করা যাইত। নগরটী সুন্দর আয়ত ক্ষেত্রের ন্যায় প্রায় বিশ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল। সীমান্ত ভূভাগের প্রায় পাঁচ মাইল স্থান ধল্লা নদী দ্বারা এবং অবশিষ্ট অংশ মৃণ্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীরের উভয় দিকে দুই পরিখার চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হয়। বোধ হয় যে মধ্যের পরিখার মৃত্তিকা দ্বারা প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এবং বাহিরের পরিখার মৃত্তিকা সকল বহির্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কারণ বাহিরের পরিখার বহির্দ্দিকের স্থানসকল ক্রমশই ঢালু। মধ্যের পরিখার গভীরতা সকল স্থানে সমান নহে, বোধ হয় কৃষি কার্য্যের সুবিধার জন্য এরূপ অসমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ প্রস্তুত কালীন তাদৃশ ছিল কিনা সন্দেহ। প্রাচীর ভূমির দিকে প্রায় ১৩০ ফিট প্রশস্ত এবং উচ্চতা প্রায় ২০ বিশ হইতে ৩০ ত্রিশ ফুট। কিন্তু উচ্চতা কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে এবং ভূমির দিকে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ কেল্লার বহির্দ্দিকে ধৌত মৃত্তিকা সংযোগে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। প্রাচীর মৃত্তিকা নির্ম্মিত, তাহাতে যে ইষ্টক ছিল এরূপ বিবেচনা হয় না। কিন্তু স্থানে স্থানে যে সকল ইষ্টক খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই প্রাচীরের উপরিভাগে বক্ষসম উচ্চ এক ইষ্টক গ্রথিত প্রাচীর ছিল, কালে নষ্ট হইয়াছে। বাহিরের পরিখা প্রায় ২৫০ ফিট প্রশস্ত ছিল, বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে ইহার গভীরতা স্থির করা দুঃসাধ্য। কিন্তু বহির্দ্দিকের ঢালু স্থানের পরিমাণ কল্পনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে যে ইহা অতিশয় গভীর ছিল। প্রাচীর সোজা ভাবে বিস্তৃত। কিন্তু ইহার সকল বাহু সমান নহে এবং ইহার মধ্যে কোন স্তম্ভ, বুরুজ, কি পার্শ্ব নিবেশ নাই ইহার মাত্র তিনটি দ্বার ছিল। বোধ হয় ধল্লা নদীর পশ্চিম তটে আর একটী দ্বার ছিল এবং তৎসন্নিকটেই আক্রমণ কারীরা শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল।

নিম্নলিখিত কারণে এস্থলে আর একটী দ্বারের বিষয় কল্পনা করা যাইতে পারে।

১। অন্যান্য দ্বারের নিকট যেমন পরিখা অথচ আরও অনেক কাজ দৃষ্ট হয় এস্থানেও সেইরূপ।

২। একটী পুরাতন পথ ধনাগার হইতে এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে তথা হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই পথের দুই পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। যে সকল ইষ্টক ও প্রস্তর স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রাচীর হইতে তিন মাইল পূর্ব্ব সান্দল দীঘী পর্য্যন্ত এই সকল অট্টালিকা বর্ত্তমান ছিল। দেশীয় লোকে বলে যে এই সকল প্রাসাদ মোগলদিগের নির্ম্মিত। ইহা কোন মতেই সঙ্গত বোধ হয় না কারণ, গ্রে-নাইট্ প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটী স্তম্ভ কোন ইষ্টক স্তূপের অভ্যন্তরে প্রোথিত আছে এবং অপর একটী স্তূপে ৪টী স্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অনেক সময় অবরোধের পর মুসলমানেরা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু তাহারা গ্রে-নাইট্ প্রস্তর এতদূর হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিল এমত সম্ভবপর বোধ হয় না। কিন্তু আক্রমণ কারীরা নিকটবর্ত্তী হইয়া এই সকল প্রাসাদে বাস করিয়াছিল। এই স্থানের দুই মাইল পশ্চিমে এবং সিংমারী নদীরও প্রায় এক মাইল পশ্চিমে একটী দ্বারের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। দ্বারের নিকট প্রাচীরের মধ্যে ও বহির্দ্দিকে পরিখার অভাব দৃঢ় করার জন্য কতকগুলি কাজ ছিল। এইটীর এবং অন্যান্য কাজ ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল, দ্বার প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভের উপর লম্বমান ছিল এই কারণেই ইহাকে শিলদুয়ার বলে। এই সকল প্রস্তরে কোনও খোদিত কারু কার্য্য নাই। এই দ্বারের কিঞ্চিদধিক দুই মাইল দূরে বাঘদুয়ার নামে উল্লিখিত দ্বারের ন্যায় আর একটী দ্বার আছে, দ্বারের প্রবেশ স্থানে ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি ছিল বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে। উত্তর দিকে একটীমাত্র দ্বার আছে ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত এবং ইহাকে হোকোদুয়ার বলে।

এই দ্বারের অব্যবহিত নিকটে এক দুর্গ আছে। ইহার আয়তন প্রায় একবর্গ মাইল এস্থানে মন্ত্রী বাস করিতেন, ইহার প্রাচীর সকল নগরের প্রাচীরের মত উৎকৃষ্ট নহে মন্ত্রীর আবাসের উত্তর দিকে রাজার স্নান গৃহ ছিল, তাহাকে শীতলাবাস বলে। এস্থলে এখন তামাকের আবাদ হয়। এস্থানে অট্টালিকাদির কোনও চিহ্ন নাই। বোধ হয় স্নানাগার নিকুঞ্জ বনে আবৃত ছিল। তথায় গ্রে-নাইট প্রস্তর নির্ম্মিত এক ঘাট ও ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু সে সকল প্রস্তরে কোন শিল্প চিহ্ন বিদ্যমান নাই।

মধ্যস্থলে পাট অথবা রাজার বসতি স্থানই প্রধান। ইহা চতুষ্কোণ, ইহার চতুর্দ্দিকে ৬০ ফিট গভীর পরিখা, পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৮৬০ ফিট এবং উত্তর দক্ষিণে ১৮৮০ ফিট বিস্তৃত। পরিখার মধ্যে ইষ্টক নির্ম্মিত এবং বহির্দ্দিকে মৃণ্ময় প্রাচীর ছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের প্রাচীর প্রায় পরিখা সংলগ্ন, কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিমে তদনুরূপ নহে। প্রাচীরের বহির্দ্দিকে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীর্ঘী আছে এবং জলা ভূমি দৃষ্ট হয়, এই স্থানেই পূর্ব্বে নদী ছিল এরূপ অনুমিত হয়। অন্য তিনদিকে এই মধ্য দুর্গ অনূ্যন তিনশত ফিট প্রশস্ত এক বেষ্টনে পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে মৃণ্ময় প্রাচীর ছিল এবং ইহা তিনভাগে বিভক্ত ছিল। রাজা অন্দরের ভিন্ন ভিন্ন লোকের বাস গৃহের জন্যই এইরূপ স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই বেষ্টন মধ্যে কয়েকটী দীর্ঘিকা দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন অট্টালিকা নাই। বোধ হয় রাজপরিবারগণ সাধারণ গৃহে বাস করিত। মধ্য বেষ্টনের ইষ্টকময় প্রাচীরের মধ্যে উত্তর দিকে একটী আশ্চর্য্য মৃত্তিকা স্তূপ দৃষ্ট হয়, ইহার উপরিভাগ প্রায় ৩৬০ বর্গ ফুট এবং ৩০ ফুট উচ্চ। ইহার পার্শ্ব ভাগ ইষ্টক গ্রথিত এবং ক্রমশঃ ঢালু দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এরূপ পার্শ্ব অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান আছে এবং তন্নিম্নে একটী দীর্ঘিকা আছে। উল্লিখিত মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যভাগ মৃত্তিকা নির্ম্মিত। নিকটবর্ত্তী যে সকল দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে বোধ হয় মৃত্তিকা স্তূপ প্রস্তুত করার জন্যই তৎসমুদয় উৎখাত হইয়াছিল। ইহার একটী দীর্ঘিকা রাজবাটীর দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশের রক্ষক স্বরূপ ছিল। যেহেতু ইহা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। মৃত্তিকা স্তূপের উপরিভাগে কতকগুলি ইষ্টক দেখা যায় বটে, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার মধ্যভাগ কেবল মৃত্তিকা ও বালুকাপূর্ণ। মৃত্তিকা স্তূপের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটী ইষ্টক গ্রথিত কূপ আছে, তাহার ব্যাস ১০ ফুট। ইহার দুই স্থানে মাত্র অট্টালিকার চিহ্ন পাওয়া যায় এবং জানা যায় যে এই স্থানের ইষ্টক দ্বারা স্থানান্তরে নীলের কুঠী প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকে কান্তেশ্বরীর মন্দির ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে এই জনশ্রুতি নিতান্ত অমূলক নহে। পশ্চিম ভাগের মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র আঙ্গিনা আছে, কেহ কেহ বলেন এখানেই রাজার শয়ন গৃহ ছিল। কিন্তু কোনমতে ইহা সঙ্গত বোধ হয় না, কারণ ইহা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং দেবালয়ের অতি নিকটবর্ত্তী সম্ভবতঃ ঐ গৃহে সমারোহের পূজার সময় অন্যান্য কার্য্য হইত। মৃত্তিকা স্তূপের দক্ষিণ দিকের স্থান দুই অসমান ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহার মধ্য স্থলে এক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর ছিল। ইহার পূর্ব্বভাগে কতকগুলি ইষ্টক

স্তূপাকারে রহিয়াছে। এই ভাগে মৃত্তিকা স্তূপের মত দীর্ঘ একটী দীর্ঘিকাও আছে, কিন্তু প্রশস্তে তাহার অর্দ্ধেক। কথিত আছে এই দীর্ঘিকাতে রাজগণ ক্রীড়া জন্য কচ্ছপ পোষণ করিতেন। ইহার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে আর একটী ক্ষুদ্র মৃত্তিকা আছে, এস্থানেও অনেক ইষ্টক দৃষ্ট হয়; বোধ হয় এখানে কোন মন্দির ছিল। দীর্ঘিকার পূর্ব্ব দিকে কতকগুলি রাশীকৃত ইষ্টক স্তূপ দেখা যায়, জনরব আছে, এস্থলে শস্ত্র গৃহ ছিল। পশ্চিম ভাগ আয়তনে ক্ষুদ্র, এস্থানে রাজার বিশ্রাম ভবন এবং দক্ষিণ ভাগে বন্ধুবর্গের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করণের স্থান নিরূপিত ছিল। ও উত্তর ভাগে রক্ষিতা স্ত্রীগণ বাস করিত। এস্থানের কতক অংশ দক্ষিণ ও উত্তরে ইষ্টক প্রাচীরে এবং পশ্চিমে মৃণ্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল এবং উত্তর দিকে একটী মৃত্তিকা স্তূপ ছিল, এ-স্থানেই সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকদিগের মন্দির ছিল। এস্থানেও দুইটী পুষ্করিণী আছে। তাহার প্রান্তভাগ ইষ্টক রচিত। এই দীর্ঘকার নিকট রাজ মন্দির ছিল। পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকের অন্দর মহলের কথা হইয়াছে, তৎসন্নিকটে বৃহৎ একটী অট্টালিকা ছিল, তাহাতে শান্তিরক্ষকগণ অবস্থান করিত।

এই প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের অনেক স্থানেই প্রস্তর দেখা যায়; কিন্তু ইহা নিতান্ত অপরিষ্কার এবং ভালরূপ খোদিত নহে। ইহার স্থানে স্থানে গ্রে-নাইট প্রস্তর দেখা গিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে যে, এই রাজবাটী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। কিন্তু বাহিরের মৃণ্ময় প্রাচীর গৃহাধিষ্ঠাত্রী কান্তেশ্বরী দেবী মুসলমানদিগের আক্রমণের প্রাক্কালে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কান্তেশ্বরী নীলাম্বরকে চারিদিবস উপবাস থাকিতে বলেন, কিন্তু রাজা তিন দিবস মাত্র উপবাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাজেই তিন দিকের প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট অর্থাৎ ধল্লা নদীর দিকের প্রাচীর অসম্পূর্ণ রহিল। বাস্তবিক মুসলমানদিগের দৌরাত্ম নিবারণ জন্য যে অল্প মাত্র সময়ে প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

নগরের মধ্য দিয়া দুইটী পথ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত কিন্তু সড়ক দুইটী সরল নহে। ইহার পূর্ব্ব সীমা ধল্লা নদী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম সীমা বাঘদুয়ার পর্য্যন্ত প্রসারিত। দক্ষিণ দিকে রাজার আবাসস্থান পর্য্যন্ত আর একটী অনতিদীর্ঘ সড়ক ছিল। এই সড়কের আভ্যন্তরীণ ভূভাগ চতুষ্কোণ, এস্থানে রাজ কর্ম্মচারীরা বাস করিতেন, এই সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে দুই এক খণ্ড ইষ্টক দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন অট্টালিকা ছিল, এরূপ প্রতীয়মান হয় না। রাজবাড়ীর এক মাইল পশ্চিম দিকে সিংমারী নদী বিদ্যমান আছে।

এই নদীর পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ কান্তেশ্বরের অনেক কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়াছে নগরের দক্ষিণ ভাগের সমুদয় অংশ, ইহার পূর্ব্বের গতিতে বিনষ্ট হইয়াছে। সিংমারীর অপর পার্শ্বে আর একটী নদী ছিল তাহার উপর ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু ছিল। সেতু গথিক প্রণালীতে নির্ম্মিত।

বাঘদুয়ারের অদূরেই গৌরীপাট নামক একটী স্থান আছে উহা প্রস্তর মণ্ডিত। তথায় দেবাদিদেব মহাদেবের মনোহর প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে যে সকল ইষ্টক দৃষ্ট হয় তাহাতে বোধ হয় এখানে শিব মন্দির ছিল। মুসলমানেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিয়াছে। এখানে মুসলমানদিগেরও অনেক কার্য্য পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল কার্য্যের মধ্যে ইষ্টক গ্রথিত দীর্ঘিকাই প্রধান। তাহা পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩০০ ফুট দীর্ঘ, উত্তর দক্ষিণে ২০০ ফুট প্রশস্ত এতদ্দ্বারাই বুঝা যায় যে এই দীর্ঘিকা মুসলমান নির্ম্মিত। দীর্ঘিকার চতুর্দ্দিকে চাতাল বা মঞ্চ; এবং উহা ইষ্টক প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রত্যেক পার্শ্বের চাতাল হইতে ভূপৃষ্ঠে নামিতে এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে জলে নামিবার সুন্দর সোপান শ্রেণী ছিল। তথাকার অধিবাসীরা বলে, বিহারের কোন রাজার কার্য্য কারকেরা এই দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা কোন মতেই সঙ্গত বোধ হয় না, কারণ দীর্ঘিকার নিকটে মুরিশ প্রণালীর কতক অট্টালিকা ছিল এবং নিকটেই মুসলমান সেনাপতির প্রিয়তমা লালবাইর বাসগৃহ। যে কোন ব্যক্তি দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করুক না কেন, তাহার সাজ সজ্জা রাজবাটী হইতে আনা হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ দীর্ঘিকা হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ খোদিত প্রস্তরে পরম্পরায় বিরচিত ছিল।

এই প্রস্তর সম্বন্ধে দুইটী কিম্বদন্তী আছে।

১। এক সম্প্রদায় বলেন, রাজা নীলাম্বর বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করণোদ্দেশে এই সকল জিনিস সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। এই সময়েই মুসলমানেরা তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিল।

২। অপর সম্প্রদায় বলেন, মুসলমানেরা রাজবাটি হইতে. অন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ জন্য, এই সকল প্রস্তর আনিয়াছিল। কেবল মুসলমানেরা যে, সমুদয় ধ্বংস করিয়াছে এমত নহে কোচবিহারের রাজগণও সময় সময় অনেক প্রস্তর আনয়ন করিয়াছেন।

১৮০৯ খৃঃ অব্দে কেল্লার বহির্দ্দিকে এক প্রশস্ত স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়। ইহা কোচবিহার আনাব জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু গাড়ী ও স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া

যাওয়ায় সেই যত্ন নিষ্ফল হইল। কথিত আছে উহা ১২ হাত উচ্চ ২২ হাত পরিধি বিশিষ্ট ছিল।

কথিত দুই রাস্তা ভিন্ন রাজধানী হইতে দ্বার পর্যান্ত অনেক গুলি রাস্তা ছিল। তাহার পার্শ্বে কোনও অট্টালিকার চিহ্ন দেখা যায় না। বড় রাস্তার নিকট প্রায় ½ মাইল রাজবাটীর পূর্ব্ব দিকে আর একটী অট্টালিকা ছিল; প্রবাদ আছে এইটী ধনাগার। প্রবাদ আছে মুসলমানেরা গৃহাধিষ্ঠাত্রী কান্তেশ্বরীর বিগ্রহ নষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। মুসলমানদিগের ভয়ে স্বয়ং বিগ্রহ দেবী পুষ্করিণীতে লুক্কায়িত থাকেন এ স্থানেই সিংমারী নদী নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্ব সময়ে এক মৎস্তজীবী তথায় জাল নিক্ষেপ করে কিন্তু উত্তোলন করিতে সমর্থ হয় না, পরে তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে দেবী তাহার জালে বদ্ধ হইয়াছেন। মহারাজ হস্তী ও লোকদ্বারা সেই বিগ্রহ উত্তোলন করেন। হস্তী বিগ্রহ মস্তকে করিয়া গোসানিমারী নামক স্থানে উপস্থিত হইল। তথায়ই সেই জল-নিমজ্জিতা কান্তেশ্বরীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়; (১৬৬৫ খৃঃ)। ঐ রাজধানী হইতে প্রস্তর ও ইষ্টক আনিয়া বিগ্রহ মন্দির প্রস্তুত হয়। ইহা ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রত্যেক কোণে এক একটী অষ্ট কোণ স্তম্ভ আছে, সেই স্থানেই বিহিত বিধানে অর্চ্চনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উক্ত স্থানের দেবল ব্রাহ্মণদিগকে অদ্যাপি ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হয়।

মুসলমান আক্রমণকারীদের শিবিরের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয় ইহাকে বার ঘর বলে; কারণ লোকে বলে যে, নগরাবরোধের সময় ১২ খানা অট্টালিকাতে মুসলমান সেনাপতিগণ বাস করিতেন। যে স্থানে সিংমারী নদী নগর পরিত্যাগ করিয়াছে সেই স্থান হইতেই আক্রমণ আরম্ভ হয়। শিবির মৃণ্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। শিবির হইতে নগর পর্য্যন্ত স্থানকে সোয়ারিগঞ্জ বলে। বোধ হয় মুসলমান অশ্বারোহিগণ কাওয়াত করিত বলিয়া এরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে।

বিশ্বসিংহের সময়।

মহারাজ বিশ্বসিংহ এই কোচবিহারে রাজত্ব স্থাপন করেন এবং তদীয় বংশধরেরাই রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান ভূপতি তাঁহারই বংশধর। ডাক্তর বুকানন সাহেব এই রাজবংশের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ উল্লেখ করিয়াছেন। "কান্তেশ্বরের বিলোপের পর এরাজ্য অনেক দিবস পর্য্যন্ত

অরাজক ছিল। পরে হাজো নামক এক ব্যক্তি বর্ত্তমান কামরূপের অনতি দূরে এক রাজত্ব স্থাপন করেন। অদ্যাপি কামাখ্যার মন্দিরের নিকট হাজোর মন্দির নামে একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। তথায় কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে। হাজো, কোচজাতীয় একজন প্রধান লোক ছিলেন। তিনি কোচ ও মেচ জাতির একতা সম্পাদন মানসে মেচজাতীয় হাড়িয়া নামক কোন দলপতির সহিত স্বীয় কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দেন, হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহ এবং জীরার গর্ভে শিশুসিংহের জন্ম হয়। বিশ্বসিংহ স্বকীয় বাহুবলে সমুদয় কামরূপ জয় করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করেন। এবং শিশুসিংহকে রায়কত অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব পদ প্রদান করিয়া, বৈকুণ্ঠপুরের (জলপাইগুড়ীর) রাজত্ব প্রদান করেন। বিশ্বসিংহ পর্ব্বত প্রান্ত হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া হিঙ্গলাবাসে স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে তিনিই আসাম প্রদেশের 'গোহাম কামাল আলি' নামক বাঁধ বাঁধিয়া ছিলেন।"

১৮৮০ সালের গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকাতে উল্লিখিত আছে "ভোটানের অন্তর্গত চিকনা নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে হাড়িয়া মেচ নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার হীরা ও জীরা নামে দুই পত্নী ছিল। জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন এবং রূপমুগ্ধ ধূর্জ্জটীর ঔরসে, হীরার গর্ভে, বিশ্ব ও শিষ্য সিংহ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বসিংহ যদিচ আদি রাজা নহেন, তথাপি তাঁহার নামানুসারে কোচবিহারের অধিপতিদিগকে বিশ্ববংশীয় ও তিনি শিব ঔরস সম্ভূত বলিয়া তাঁহার বংশধর দিগকে শিববংশ বলিয়া থাকে।"

এতদ্দেশে প্রবাদ এই যে, যোগিনী তন্ত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, চিকনা পর্ব্বতবাসী কোন ব্যক্তির দুইটী কন্যা জন্মে; একের নাম হীরা এবং অপরের নাম জীরা। হাড়িয়া মেচের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয়। জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন জন্মগ্রহণ করেন। হাড়িয়া হীরার গৃহে উপস্থিত হইলেই ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইতেন, এজন্য হীরা বন্ধ্যা হন। অবশেষে মনকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি ভগবান্ আশুতোষের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। ভবানীপতি তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া যোগী বেশে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তদীয় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাতে আসক্ত ও উপগত হন এবং তদীয় ঔরসে বিশ্ব ও শিশু নামক দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন।

মহাদেব স্বকীয় সন্তানকে রাজত্ব প্রদান করিয়া তাঁহাকে হনুমানদণ্ড

সমর্পণ করেন। হনুমানদণ্ড অদ্যাপি কোচবিহারের রাজবাড়ীতে সাদরে রক্ষিত হইতেছে এবং পর্ব্বাদি উপলক্ষে ইহার পূজা হইয়া থাকে।

চিক্‌না পর্ব্বতস্থ আট গ্রামের অধিপতি টার্ক কোতোয়াল নামে এক ব্যক্তি বিলক্ষণ পরাক্রান্ত ছিলেন। বিশ্বসিংহের প্রাদুর্ভাবের পর তাঁহার সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। সেই বিবাদে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মদনের মৃত্যু হইলে বিশ্বসিংহ শোকাতুরা বিমাতার সন্তোষার্থে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ না করিয়া কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চন্দনকে রাজ্যভার প্রদান করেন ১৫০৯ খৃঃ অব্দে। চন্দনের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই রাজশকার সৃষ্টি হয়। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে চন্দনের মৃত্যু হয়। পরে বিশ্বসিংহ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমী ছিলেন। তিনি সমুদয় কামরূপ অধিকার করেন। তাঁহার বাহুবলে ভীত হইয়া, ভোটান রাজাও কর প্রদানে সম্মত হন। তিনিই চিক্‌না পর্ব্বত হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া হিঙ্গলাবাসে স্থাপন করেন। কথিত আছে তিনি বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করেন; তাঁহার নিয়মিত মৃত্যু হয় না।

PART—III.

AUTHENTIC PERIOD.

তৃতীয় খণ্ড।

প্রমাণ-সিদ্ধ সময়।

প্রথম অধ্যায়।

রাজা বিশ্বসিংহ পরলোক গমন করিলে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময়ে এরাজ্য বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক দিকে রঙ্গপুর দিনাজপুরের অধিকাংশ স্থান, অপর দিকে নিম্ন আসামস্থ প্রাগ্-জোতিষপুর (গৌহাটী) ও গৌড়নগরের কিয়দংশও এরাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এবং গঙ্গা নদীর তীর রাজ্যের শেষ সীমা অবধারিত হইয়াছিল। মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। লোকে তাঁহাকে চিলারায় বলিত। তাঁহার বলবিক্রম প্রভাবেই মহারাজ স্বকীয় রাজ্য এতদূর বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিহার হইতে প্রায় ১৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে রাণীর হাটের নিকট একটী পুরাতন বাটীর ভগ্নাবশেষ পতিত আছে, তাহা চিলারায়ের বাটী বলিয়া বিখ্যাত। মহারাজ নিজেও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে মল্লনারায়ণ বলিত।

এই মহারাজের সময়েই নারায়ণী টাকার সৃষ্টি ও প্রচলন আরম্ভ হয়। টাকার একদিকে দেবনাগর অক্ষরে মহাদেবের নাম অপর দিকে মহারাজ নরনারায়ণের নাম অঙ্কিত হয়। এক টাকা সেই সময়েই কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলে প্রচলিত হইয়াছিল।

বিখ্যাতনামা কালাপাহাড় কামাখ্যার দেবমন্দির ভগ্নপ্রায় করিয়াছিল। মহারাজ নরনারায়ণ কামাখ্যার মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া বিবিধ রত্নভূষণে সুসজ্জিত করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ সেবাইতদিগকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন এবং দৈনিক পূজার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম প্রচার করেন। অদ্যাপি সেই সকল নিয়ম তথায় প্রচলিত আছে। কামাখ্যার মন্দিরে ইঁহার ও ইঁহার কনিষ্ঠ চিলারায়ের প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যাত্রীরা ভক্তিবশতঃ

তাহার গলে পুষ্প মালা প্রদান করিয়া থাকে। কামাখ্যার মন্দিরে খোদিত নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী দেখা যায়।

১। লোকানুগ্রহ কারকঃ করুণয়া পার্থোধনুর্ব্বিদায়া।
দানেনাপি দধীচি কর্ণ সদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভো নিধিঃ॥
নানাশাস্ত্র বিচারচারুচরিতঃ কন্দর্প রূপোজ্জ্বলঃ।
কামাখ্যা চরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রী মল্লদেব নৃপঃ॥

২। তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বারেন্দ্র মৌলিস্থলী।
মাণিক্যং ভজমান কল্পবিটপী নীলাচলে মঞ্জুলং॥
প্রাসাদং মুনিনাগ বেদশশভৃচ্ছাকে শিলারাজিভি।
দ্দৈবী ভক্তিমতাং বরো রচিতবান্ শ্রীপূর্ব্ব শুক্লধ্বজঃ॥

এই রাজত্ব সময়েই শারদীয় দুর্গাপূজা প্রথম আরম্ভ হয়। এই পূজা অন্যান্য দেশের পূজার ন্যায় নহে। দুর্গার প্রতিমাতে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদির প্রতিমূর্ত্তি নাই, কেবল অসুর, সিংহ এবং একটী ব্যাঘ্রসহ ভগবতী বিরাজিতা থাকেন। সপ্তমী এবং নবমীতে পূজার বিশেষ সমারোহ নাই। অষ্টমীতে আট প্রহরে আটবার পূজা হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমীতে পূজা গৃহের স্তম্ভ প্রোথিত করা হয়, প্রত্যেক বৎসর নূতন ঘর নির্ম্মিত হয়। প্রবাদ আছে, এইরূপ পূজা করিবার জন্য মহারাজ নরনারায়ণের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐরূপ পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে নরবলি প্রচলিত ছিল। এখনও বহুবিধ বলি হইয়া থাকে।

এই রাজত্ব সময়ে পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, মহারাজার আদেশানুসারে সাধারণের সুখবোধার্থ, রত্নমালা নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রণয়ন ও প্রচলন করেন। গ্রন্থের শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে।

শগণগ্রহমনুশাকে নাকেন্দ্রাচার্য্যবাসরে শরদি।
অধি পৌর্ণমাসি পূর্ণাসমপন্থ ত বিশ্বেয়ং॥

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাণিনি ও কলাপ ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা উক্ত ব্যাকরণ-দ্বয়ের অধিকাংশ সূত্রের সহিত রত্নমালার অনেকাংশ সূত্র অভিন্ন ও অনুরূপ। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ জটিল বিধায়, বোধ হয় তিনি ঐ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই। বস্তুগত্যা রত্নমালা যে এক উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ তাহা পাঠক এবং বিবেচক মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। ইহার রচনা প্রণালী এমনই সরল যে, একটু মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই অল্প সংস্কৃতজ্ঞদিগেরও ঝটিতি অর্থবোধ

এবং সহজে মুখস্থ হইয়া থাকে। এই ব্যাকরণের জয়কৃষ্ণ ও সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি অনেক টীকা আছে, তন্মধ্যে এই দুইটী টীকাই সমধিক মার্জ্জিত ও মনোহর। উক্ত টীকাকারক মহোদয়দ্বয় অসাধারণ বৈয়াকরণিক ছিলেন। তাঁহাদের টীকা দৃষ্টেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ব্যাকরণে তাঁহাদের কীদৃশ বুৎপত্তি ছিল। শ্রীবীরেশ্বর শর্ম্মা নামক কোন ব্যাকরণাভিজ্ঞ পণ্ডিত, উক্ত সর্ব্বানন্দ কৃত টীকার দোষ প্রদর্শন করতঃ তাঁহাকে এবং তদানুষঙ্গিক রত্নমালাকারককে অন্যায় রূপে ভ্রান্ত বলিয়াছেন বটে; কিন্তু বীরেশ্বরের দোষ প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, তিনি অন্যায় রূপে গ্রন্থকারকে আক্রমণ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে রত্নমালা ব্যাকরণ এদেশের গৌরবস্থানীয়। ইহা চিরকাল এদেশের কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

মহারাজ তদীয় রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া শোণকোষ নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী নবার্জ্জিত ভূভাগ কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায়কে প্রদান করেন। চিলারায়ের পৌত্র পরীক্ষিৎনারায়ণ ও বলিতনারায়ণের বংশধরেরা সংপ্রতি বিজনী ও দুরঙ রাজ্যের উত্তরাধিকারী। ইঁহারা অনেকদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন। পরে আসামের আহম বংশীয় রাজগণের এবং মোগলরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্প্রতি ইংরেজাধিকারে জমিদার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃসিংহনারায়ণ রাজ্য শাসনে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে কনিষ্ঠ মহারাজ নরনারায়ণ রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন; উত্তরকালে তিনি জ্যেষ্ঠের সন্তানগণকে পাঙ্গার রাজত্ব প্রদান করিয়া যান। তাঁহাদের বংশধরেরা বহু দিবসাবধি তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, সম্প্রতি উক্ত সম্পত্তি দৌহিত্র সন্তানে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজের অগ্রজা শ্রী শ্রীমতী আনন্দময়ী আই দেবতী পাঙ্গার রাজকুমারকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তিনি অল্প বয়সেই বিধবা হইয়াছেন। এই সম্পত্তি সম্প্রতি ইংরেজাধিকার ভুক্ত জেলা রঙ্গপুরের অধীন একটী জমিদারী মাত্র।

মেঃ বুকানন বলেন বিশ্বসিংহ পরলোক গমন করার পূর্ব্বে তদীয় তিন পুত্র মধ্যে স্বরাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া যান এবং শোণকোষ নদীর পূর্ব্ব দিকের স্থানগুলি চিলারায়কে অর্পণ করেন। যাহা হউক এই সকল রাজ্য পূর্ব্বে যে এক রাজত্বভুক্ত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৮ খ্রীঃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রীতিমত পিতার সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিলেন। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, এ-রাজ্যের রাজগণ মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে কোনও রাজার লোকান্তর হইলে তদীয় উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ না করিলে, মৃত রাজার সৎকারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সকল কার্য্যেই রাজার আদেশ সাপেক্ষ, বোধ হয়, এই বিবেচনায়ই এরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। মহারাজ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন না। ইঁহার সময়েই মোগল সম্রাটের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। মুকুন্দ সার্ব্বভৌম নামে রাজার দ্বারস্থ একজন ব্রাহ্মণ, অসূয়া পরবশ হইয়া দিল্লীতে গমন করে এবং তথায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট এরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা সমুদয় প্রকাশ করে। তাহার মন্ত্রণা বলেই মোগলাধিপতি এদেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে কতিপয় সৈন্য পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সহজেই পরাভূত হইয়া দিল্লীতে নীত হন এবং সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন।* নারায়ণী টাকা অর্দ্ধাকারে মুদ্রিত করিবেন, রাজবাটী হইতে বাদ্যোদাম অর্থাৎ নওবৎ ইত্যাদি উঠাইয়া দিবেন এবং অন্যান্য কতিপয় রাজচিহ্ন পরিত্যাগকরিবেন, ইত্যাদি বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলে, সম্রাট তাঁহাকে মুক্তি দেন এবং তিনি স্বকীয় রাজ্যে পুনরাগমন করেন। মহারাজ প্রত্যাগমন সময়ে প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বারাণসীতে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পূজা দিয়াছিলেন। ইঁহার সময় হইতেই নারায়ণী টাকা অর্দ্ধাকারে প্রথম মুদ্রিত হয়। ডাক্তর বুকানন তদীয় কামরূপের বিবরণে লিখিয়াছেন মুসলমানেরা আকবরের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীঃ কোচ রাজ্য আক্রমণ করিয়া, রাঙ্গামাটী নামক স্থানে অধিনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার মতে এই ঘটনা উল্লিখিত সময়ের ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তদীয় অষ্টাদশ পুত্রের জন্য অষ্টাদশ বাটী নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম আঠার কোঠা। আঠার কোঠা নামে এক গ্রাম অদ্যাপি রাজধানীর কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে রাজবাটীর কোন চিহ্ন নাই, বোধ হয় বর্ত্তমান রাজধানী ঐ আঠার কোঠার এক কোঠা।

* কেহ কেহ বলেন সম্রাটের পক্ষ হইতে রাজা মানসিংহ এরাজ্য জয় করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি রাজাকে পরাস্ত করিয়া তদীয় ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই ঘটনার স্থানীয় কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান সময়ে বড় আঠারো কোঠাতে একটী দেবালয় মাত্র আছে, তাহাকে আঠার কোঠার ধাম বলে। তাহা বহুকালের নির্ম্মিত এরূপ অনুমিত হয়। যে সকল পুরাতন দীর্ঘিকা এবং মৃণ্ময় প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারাই ধামের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ, নাজির অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া স্বকীয় তৃতীয় পুত্র মহীনারায়ণকে নাজিরদেবের পদ প্রদান করেন।

১৬২১ খ্রীঃ মহারাজের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র বীরনারায়ণ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। এই রাজত্বের প্রারম্ভেই ভূটীয়ারা নিয়মিত কর প্রদানে ক্ষান্ত হয়। সময়ে সময়ে খেলাত ও যৌতুক মাত্র প্রদান করিতে থাকে। রায়কতগণ অনুপস্থিত থাকাতে নাজিরদেবই অভিষেক সময়ে ছত্রধারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

মহারাজ বীরনারায়ণ পাঁচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তিনি অতিশয় কামাশক্ত ছিলেন এবং অসৎ প্রবৃত্তির ফল ভোগ স্বরূপ অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৬২৭ খ্রীঃ মহারাজ প্রাণনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন এবং সংস্কৃতের বিলক্ষণ আদর করিতেন। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত শিক্ষা এদেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়। ইনি পঞ্চরত্ন সভা নামে একটী সভা স্থাপন করেন। কবিরত্ন ও কবিভূষণ নামে দুই পণ্ডিত সভার প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনিই জল্পেশ্বর, গোসানিমারী, সিদ্ধেশ্বরী এবং বাণেশ্বর নামক স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত দেবালয় সংস্থাপন করেন, এই সকল দেবালয় অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান আছে এবং রাজব্যয়ে তথাকার পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। গোসানিমারীর দেবমন্দিরে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী লিখিত আছে।

> সম্যত্যা দ্বিষদেক জিত্বরভুজা দণ্ডপ্রতাপার্য্যাম।
> ক্রীড়াকন্দুক বেগ বর্দ্ধিত যশঃ শ্রীপ্রাণভূমিপতেঃ॥
> শাকাব্দে নগ নাগ মার্গণ সিত জ্যোতির্ম্মিতে নির্ম্মিতঃ।
> শ্রীভাজা কবি মণ্ডলেন ভবতা ভব্যোভবানী মঠঃ॥

মহারাজ বৎসরের নয়মাসকাল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন এবং

অবশিষ্ট তিনমাস আমোদ আহ্লাদে কর্ত্তন করিতেন। ১৬৬৫ খ্রীঃ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, সর্ব্বত্র এরূপ জনরব প্রচারিত হয় যে মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে; তচ্ছ্রবণে নাজিরদেব মহীনারায়ণ তদীয় পুত্র চতুষ্টয়ের সহিত সসৈন্যে রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই কবিরত্ন ও কবিভূষণের প্রাণদণ্ড করেন। নাজিরদেব মনে করিয়াছিলেন ইঁহারাই স্বীয় অভিসন্ধি সাধন মানসে, রাজার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত করিতে সময় ও সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে। পরে যখন শুনিতে পাইলেন যে রাজার মৃত্যু হয় নাই, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তৃতীয় দিবসে মহারাজের মৃত্যু হইলে নাজিরদেবের প্রত্যেক পুত্রই রাজা হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নাজিরদেব মৃত রাজার পুত্র মোদনারায়ণকে সিংহাসনে অভিসিক্ত করিয়া নিজেই ছত্রধারণ করিলেন এবং স্বকীয় অনুচর বর্গকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সৈন্য ও পুত্রগণসহ বাটীতে চলিয়া গেলেন।

মহারাজ মোদনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াই বিশেষ বিপদাপন্ন হইলেন। তাঁহার সমুদয় কর্ম্মচারীই নাজিরদেবের আত্মীয় লোক, কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করে না। কতিপয় বৎসর অতীত হইলে তিনি ক্রমে ক্রমে সৈন্যদিগকে আত্মবশে আনিলেন এবং রাজধানীতে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে সহায় করিয়া নূতন কর্ম্মচারীদিগকে অনায়াসে দূর করিলেন, কয়েকজন বিনষ্টও হইল। নাজিরদেব এ সংবাদ শ্রবণে অতি মাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এই যুদ্ধেই নিহত হইলেন। অন্যান্য পুত্রগণ ভোটানে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন এবং তিনি নিজে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করতঃ নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই নাজিরদেবকে গোঁসাই মহীনারায়ণ বলে। অনেক স্থান পরিভ্রমণের পর নাজিরদেব বৈকুণ্ঠপুরে ধৃত হইলেন এবং তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ ভূটীয়াদিগের সহায়তাবলে মহারাজের সহিত দুই তিনবার যুদ্ধ করিয়ছিলেন বটে কিন্তু প্রত্যেকবারেই পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। মহারাজ পারিবারিক বিশৃঙ্খলা বশতঃ শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ বিধান করিতে পারেন নাই; তিনি পঞ্চদশ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া নিঃসন্তান পরলোক প্রাপ্ত হন এবং এই হইতে মহারাজ বিশ্বসিংহের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমিক রাজত্বের শেষ হয়।

ন লবীপ্রমকারান্তে বিশোর্ব্বংশ বিনশ্যতি।
অতঃ পরং মহেশানি কুপুত্রঃ পালয়েন্মহীং॥

নরনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, বীরনারায়ণ, প্রাণনারায়ণ, মোদনারায়ণ, ইঁহারা ক্রমে পিতার রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন. অতঃপর যিনি রাজা হইবেন তাঁহার পিতৃ রাজ্য নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহারাজ মোদনারায়ণের মৃত্যুর পরক্ষণেই নাজিরদেবের পুত্রগণ ভোটান রাজের সহায়তা বলে রাজধানী আক্রমণ করিয়া বিশেষ উৎপাত আরম্ভ করেন। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত যজ্ঞদেব এবং ভুজদেব এতচ্ছ্রবণে কতিপয় সৈন্য সহকারে এস্থানে আগমন করিয়া নাজিরদেবের পুত্রদিগকে দূর করিয়া দেন। এবং মহারাজ প্রাণনারায়ণের তৃতীয় পুত্র বসুদেবনারায়ণকে অভিষিক্ত করিয়া যান।

মহারাজ বসুদেবনারায়ণ অধিককাল রাজ্য ভোগে সমর্থ হইলেন না। রায়কতগণ চলিয়া গেলেই নাজিরদেবের বংশধরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং অনায়াসেই তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ হয়। নাজিরদেবের সন্তানগণ সকলেই রাজ্য প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন ; এমত কালে রায়কতগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বসুদেবনারায়ণের ভ্রাতার পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

পঞ্চম বৎসর বয়ক্রমকালে মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই সময়েই রাজ্যের দক্ষিণাংশে মোগলদিগের দৌরাত্ম আরম্ভ হয়। পাঙ্গার রাজকুমারেরা ঢাকার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ এবং তৎপুত্র জবরদস্ত খাঁর নিকট বশ্যতা স্বীকার করাতে, মোগলেরা এদেশ আক্রমণ করিতে অভিলাষী হয় এবং বহুল সৈন্য সহ এরাজ্য আক্রমণ করে। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ, যজ্ঞনারায়ণ কুমারকে ছত্র নাজিরের পদে অভিষিক্ত করিয়া সৈন্য সংক্রান্ত যাবতীয় ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। যজ্ঞনারায়ণ মোগল আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। মোগলেরা বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ নামক পরগণাত্রয় অধিকার করে। এদিকে কার্জিরহাট, কাকিনা, টেপা, মন্থনা প্রভৃতি স্থানের শাসন কর্ত্তৃগণ স্বাধীন হইয়া উঠে এবং মুসলমান সুবেদারকে নিয়মিত কর প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া সনন্দ গ্রহণ করে।

সেনাপতি যজ্ঞনারায়ণ নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে মহারাজ

মহীনারায়ণের পৌত্র শান্তনারায়ণ কুমারকে তৎপদে অভিষিক্ত করেন। একাদশ বর্ষ রাজত্বের পর মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়।

১৬৯৪ খ্রীঃ মহারাজ রূপনারায়ণ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি মৃত রাজার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত ছিলেন না। কেবল মাত্র জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক ছিল। ইনি নাজিরদেব গোঁসাই মহীনারায়ণের পৌত্র। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর নাজিরদেব শান্তনারায়ণ রাজা হইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্যগণ ও সাধারণ লোক সমূহ তাহাতে অসম্মত হওয়ায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। তিনি স্বকীয় ভ্রাতা সত্যনারায়ণকে দেওয়ানের পদে স্থাপন করিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হইল, রূপনারায়ণ রাজা হইলেন, শান্তনারায়ণ সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সত্যনারায়ণ মন্ত্রী হইলেন। রাজ্যের আয় সম্বন্ধে এরূপ বন্দোবস্ত হইল যে নাজিরদেব এবং তাঁহার সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ $\frac{৫}{১৬}$ অংশ, দেওয়ানদেব $\frac{৩}{১৬}$ অংশ এবং রাজা অবশিষ্ট $\frac{৮}{১৬}$ অংশ রাজস্ব পাইবেন।

জেঙ্কিন্স সাহেব বলেন রূপনারায়ণ নির্ব্বিবাদে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই। বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইলে মোগলেরাই তাঁহাকে রাজ্যে বরণ করে। তিনি আরও বলেন যে রায়কতবংশ অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত ছত্র নাজিরের কাজ করিয়াছিল পরে মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে, রায়কত ভাগীদেব ও যাগদেব কোচবিহার রাজ্য আত্মসাৎ করার চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিন্তু রূপনারায়ণ মোগল সহায়-তাতে তাঁহাদের চেষ্টা বিফল করেন। জেঙ্কিন্স সাহেবের মতে রূপনারায়ণের রাজত্বের প্রারম্ভে মোগলদিগের দৌরাত্ম আরম্ভ হয় এবং বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানাদিগের অধিকৃত হয়। কিন্তু আমরা এই মতের পোষকতা করিতে পারি না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে মোগলেরা রূপনারায়ণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার সহায়তা করিয়াছিল। রাজা রূপনারায়ণ ১৬৯৪ খ্রীঃ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর ৬ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহারাজ রূপনারায়ণ হিঙ্গলাবাস হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া বর্ত্তমান স্থানে স্থাপিত করেন। এই রাজধানী পরিবর্ত্তনের দুইটী মাত্র কারণ লক্ষিত হয়। ১ম—বর্ত্তমান স্থানের প্রায় চতুর্দ্দিক নদী পরিবেষ্টিত থাকায় বিপক্ষের আক্রমণ

হইতে সুরক্ষিত। ২য়—ভোটান ও মোগল রাজের তৎসাময়িক অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়ার সুবিধা হইয়াছিল। হিঙ্গলাবাস রাজ্যের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, সুতরাং দক্ষিণাংশে মোগলদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করা সুকঠিন হইত; এদিকে ভোটানরাজ নিকটবর্ত্তী বিধায় সর্ব্বদাই রাজধানী আক্রমণের প্রয়াস পাইতেন। বর্ত্তমান রাজধানী হইতে প্রায় ১৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে পুরাতন রাজধানী অবস্থিত ছিল। এখন সেই স্থান ভোটান্ত প্রদেশের অন্তঃবর্ত্তী এবং নিবিড় অরণ্যাদিতে পরিবৃত ও বহুসংখ্যক হিংস্রজন্তুর আবাস ভূমি। উক্ত স্থানের দেড় কি দুই মাইল ব্যবধান থাকিতেই এত জঙ্গল দৃষ্ট হয় যে তথায় যাওয়া সহজ সাধ্য নহে। কিন্তু রাজধানী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যে সকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, অতি পূর্ব্বে ঐ স্থান কোনও প্রধান লোকের আবাস স্থান ছিল। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি রাজপথের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, কয়েকটী সরোবরের চিহ্নও দেখা যায়। কিন্তু ইহা কি দীর্ঘিকার ভগ্নাবশেষ কি নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তনের কার্য্য, তাহা নিশ্চয় করা যায় না।

এই সময়ে নাজিরদেবও বলরামপুরে স্বকীয় আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ রূপনারায়ণ মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি জবরদস্ত খাঁর সহিত সন্ধি করিয়া বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ পরগণাত্রয়, জমিদারী স্বত্বে প্রাপ্ত হন। স্বাধীন রাজা অন্য রাজাকে কর প্রদান করা অপমান জনক বিবেচনায়, মহারাজা নাজিরদেবের নামে পরগণাত্রয় বন্দোবস্ত করিয়া লন, এই স্থানত্রয়ের জন্য যে কর দিতে হইত তাহা নাজিরদেব শান্তনারায়ণের নামেই দেওয়া হইত। ইহা হইতেই নাজিরদেব এবং মহারাজদিগের বিবাদের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। ইহার সম্যক বিবরণ পরে বিবৃত করা যাইবে। পরগণাত্রয় মোগলাধিকারে ছিল বলিয়া এখনও উহা "মোগলান" নামে খ্যাত এবং বর্ত্তমান মহারাজের জমিদারী ভুক্ত।

নাজিরদেব শান্তনারায়ণের মৃত্যু হইলে মহারাজ তদীয় দত্তক পুত্র ললিত-নারায়ণকে তৎপদে অভিষিক্ত করেন। মহারাজ রূপনারায়ণ বর্ত্তমান মদন-মোহনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া প্রথমে পূজা আরম্ভ করেন।

১৭১৪ খ্রীঃ মহারাজের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

ইতিপূর্ব্বে পর্ব্বত সীমা পর্য্যন্তই ভোটান রাজের অধিকৃত ছিল। ভোটান্তঃ

প্রদেশে তাঁহার কোন স্বত্ব ছিল না। কিন্তু এই রাজত্ব সময়ে ভোটানরাজ ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভোটান্ত প্রদেশ অধিকার করেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ কি নাজিরদেব ভূটীয়াদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ জন্য কিছুই চেষ্টা করেন না।

নাজিরদেব ললিতনারায়ণের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র রুদ্রনারায়ণ তৎপদে অভিষিক্ত হন। তিনি রাজধানীতেই বাস করিতেন। উপরোক্ত ভূপতির লালবাই নামক একজন যুবতী নর্ত্তকী ছিল তাহার নামানুসারেই 'লালবাজার' নাম হয়।* মহারাজ ধলিয়াবাড়ী নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক বহুকাল তথায় অবস্থান করেন। অদ্যাপি উক্ত গ্রামে রাজবাটীর চিহ্ন কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। ঐ গ্রাম বর্ত্তমান রাজধানীর দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

বহুকাল রাজত্বের পরও মহারাজের কোন সন্তানাদি না হওয়াতে তিনি দেওয়ানদেব সত্যনারায়ণের পুত্র দীনরায়কে দত্তক রাখিয়াছিলেন এবং রাজ্যভার কিয়দংশ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দীনরায় তাহাতে সম্মত না হইয়া তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে রাজাকে প্রতিশ্রুত করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা অসম্মত হইলে দীনরায় ঢাকার সুবেদার মহম্মদ আলি খাঁর নিকট গমন করিলেন। এবং তাঁহাকে এরাজ্য আক্রমণ করার জন্য উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। মুসলমান সেনাপতি এদেশে প্রেরিত হইল। ঝাড় সিংহেশ্বর নামক স্থানে সাধারণ সংগ্রাম হইল। কিন্তু ভোটান রাজের সহায়তাতে কোচবিহার রাজ মহম্মদ আলির প্রেরিত সেনাপতিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেওয়ানদেব সত্যনারায়ণ, দীনরায়ের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন মনে করিয়া মহারাজ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, খর্গনারায়ণ কুমারকে তৎপদে অভিষিক্ত করেন। অতঃপর সত্যনারায়ণ সেওড়াগুড়ী নামক গ্রামে যাইয়া বাস করেন অদ্যাপি তাহার বংশধরেরা তথায়ই বাস করিতেছেন।

১৭৬৩ খ্রীঃ মহারাজের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রথমা পত্নী, সপত্নীর গর্ভজাত দেবেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইয়া পতির সহমৃতা হইয়াছিলেন।

* জয়নাথ মুন্সীকৃত রাজোপাখ্যানে উক্ত বিবরণ উল্লিখিত আছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় মুসলমানদিগের কোন প্রিয়তমার নামানুসারে লালবাজার নাম হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চারিবৎসর বয়ঃক্রম কালে মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণই শাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে দেওয়ান খর্গনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে ভোটান রাজ স্বকীয় ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ক্ষমতা এতদূর প্রবল হইয়া পড়ে যে, একজন ভোটান প্রতিনিধি কতক সৈন্য সমেত রাজধানীতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাঁহার অসম্মতিতে কোনও গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারিত না। প্রত্যেক বৎসর বাক্সাদ্বারের সুবেদার চেকা খাতাতে আগমন করিত; তথায় রাজা, দেওয়ান ও নাজির সহ গমন করিতেন এবং উপঢৌকন আদান প্রদান করিতেন। ভুটীয়ারা রাজাকে যে সকল বস্তু উপহার দিত তাহার দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ মূল্যের বস্তু রাজাকে দিতে হইত। এই রাজত্ব সময়ে ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে ১২ই আগষ্ট বাঙ্গলার সুবেদারের ক্ষমতা বিধ্বংস হয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গলার শাসন ভার প্রাপ্ত হন। এখন হইতে বোদা প্রভৃতি পরগণার জন্য যে খাজনা দিতে হইত তাহা কোম্পানিকে দিতে হইল। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ দুই বৎসরের অধিককাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। রাজগুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামানন্দ গোস্বামীর* ষড়যন্ত্রে, রতিদেব শর্ম্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণ, রাজবাটীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণস্থিত পদ্ম পুষ্করিণীর পারে এক তরবারি আঘাতে রাজার মস্তক ছেদন করে; অল্প বয়স্ক রাজা সঙ্গীদিগের সহিত খেলায় রত ছিলেন। রতিদেব শর্ম্মা পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। রাজবাটী শোকসাগরে নিমগ্ন হইল প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ রাজধানীতে আসিলেন, নাজিরদেবও উপস্থিত হইলেন।

নাজিরদেব স্বকীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পাছে লোকে মনে করে যে তাঁহারই চক্রান্ত বলে রাজা বিনষ্ট হইয়াছেন এই আশঙ্কায় দেওয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর অভিমতে দেওয়ান দেবের তৃতীয় পুত্র ধৈযেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এদিকে ভোটানাধিপতি দেবরাজ, দেবেন্দ্রনারায়ণের হত্যাকাণ্ড অবগত হইয়া, চক্রান্তকারী রামানন্দ গোস্বামীর প্রাণদণ্ড করিলেন এবং তাঁহার একজন

* রামানন্দের পিতাই প্রথমে রাজগুরুর পদ প্রাপ্ত হন।

প্রতিনিধি রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিনিধির অসম্মতিতে কোনও কাজ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াই দেওয়ানদেব রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবরাজের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে পুনরায় নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক রাজার বিদ্বেষভাব বিদূরিত হইল না এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ দেওয়ানের ক্ষমতায় অসূয়া পরবশ হইয়া রাজাকে নানারূপ কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। রাজা প্রথমে সম্মত হইয়াছিলেন না বটে, কিন্তু কুচক্রীর চক্রভেদ করা তাঁহার অসাধ্য হইল। তিনি পরিশেষে দেওয়ান দেবকে প্রাণে নষ্ট করাই সঙ্গত মনে করিলেন এবং এক দিবস রাজবাটীতে আহ্বান করিয়া স্বহস্তে তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিলেন; অতঃপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনারায়ণকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। ভোটান প্রতিনিধি স্বয়ং এই হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রতিবিধান না করিয়া চক্রান্তকারীদিগের নাম অবগত হইয়া দেবরাজ সমীপে গমন করিলেন। দেবরাজ এতচ্ছ্রবণে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজেন্দ্র-নারায়ণকে রাজা করিবার মানস করিলেন। তিনি কতকগুলি ভূটীয়া সৈন্য সমেত ২।৩ জন প্রধান লোককে এরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মানুসারে বার্ষিক ভোজ ইত্যাদির ভান করিয়া চেকা খাতাতে রহিল। এবং রাজা ও দেওয়ানকে তথায় উপস্থিত হওয়ার জন্য যত্ন করিতে লাগিল। রাজা অসুস্থতার ভান করিয়া প্রথমতঃ তথায় যাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু তাহারা কোন মতেই ক্ষান্ত হইল না। রাজা ও দেওয়ানকে তথায় উপস্থিত হইতে হইল। রাজা তথায় উপস্থিত হইলে ভূটীয়ারা দেওয়ান এবং চক্রান্তকারিগণ সহ রাজাকে বন্দীভাবে দেবরাজের সমীপে লইয়া গেল। নাজিরদেব তাঁহার সৈন্যসহ তথায় উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ভূটীয়াগণ রাজধানীতে আগমন করিয়া রাজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল এবং বিহার রক্ষার জন্য কতকগুলি ভূটীয়া সৈন্য সহকারে একজন প্রতিনিধি এস্থানে রাখিয়া গেল। মহারাণী রাজপুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া অন্দর মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন।

রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া দেখিলেন পূর্ব্বের কর্ম্মচারিগণ কেহই লজ্জা বশতঃ কাজ করিতে স্বীকৃত নহে। তিনি হরেশ্বর কার্জিকে খাশ নবিশের (Personal Secretary) কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এস্থলে ইহাও

বলা আবশ্যক যে, রাজার নিকট কন্যা বিবাহ দিলে কন্যার পিতা এবং বংশধরেরা কার্জি উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং রাজবংশের দৌহিত্র সন্তানগণ ঈশর নামে খ্যাত।

এই রাজত্বে প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী কিছুই নাই। ভূটীয়াদিগের পরাক্রম ক্রমেই বলবৎ হইয়া উঠে, তাহাদের প্রতিনিধিই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছিল। রাজা এবং নাজির প্রতিনিধির হস্তে ক্রীড়া পুত্তলি মাত্র ছিলেন। মহারাজ বিবাহের সাত দিবস পরে পরলোক গমন করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ভোটান রাজের সহিত ভয়ানক বিসম্বাদ উপস্থিত হইল। নাজিরদেব স্বকীয় ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী সকলেই ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দেবরাজ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, বন্দীকৃত রাজার পুত্র কখনই রাজা হইতে পারিবে না। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র বজ্রেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিতে হইবে। দুই পক্ষে তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। নাজিরদেব মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, রাজা মনোনীত করার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত আছে, কাজেই তিনি মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ভোটান রাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ রাগান্বিত হইলেন। এবং স্বকীয় ভাগীনেয় জিম্পিকে বহুল সৈন্য সহকারে বিহার অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে নাজিরদেব অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ সহ যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইলেন। ভূটীয়ারা রাজধানী আক্রমণ করিয়া রাজা এবং রাজমাতাকে ভোটানে লইয়া যাওয়ার প্রয়াস পাইয়াছিল বটে কিন্তু নাজিরদেব অতুল সাহসের সহিত তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন এবং স্বকীয় আবাস বাটী বলরামপুরে পাঠাইয়া দিলেন। তথায়ও রাজা এবং রাজমাতা নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না বিবেচনা করিয়া পাঙ্গায় প্রেরণ করিলেন। নাজিরদেব তাঁহার নিজ পরিবারও রাঙ্গামাটীতে পাঠাইয়াছিলেন। রাজকীয় অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ নানা স্থানে পলায়ন পর হইলেন। জিম্পি ক্রমে ক্রমে সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া রাজবাটীতে শিবির সন্নিবেশ করিল এবং তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। স্বকীয় প্রাবল্য প্রদর্শনার্থ বজ্রেন্দ্রনারায়ণ কুমারকে রাজাসনে

স্থাপন করিল। প্রায় সমুদয় রাজ্য তাহার অধিকৃত হইয়াছিল। রহিমগঞ্জ পরগণা অধিকার করিতে পারিল না। রূপান সিংহ জমাদার অতি সাহসের সহিত তাহা রক্ষা করিয়াছিল। সে স্থানে যাহা আয় হইত তদ্দ্বারা সৈন্যের খরচ বাদে অতি কষ্টে রাজা ও রাজমাতার খরচ চলিতে লাগিল। জিম্পি কেবল রাজধানী অধিকার এবং তথায় দুর্গ সংস্থাপন পূর্ব্বক বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, পরিণাম বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত নানাস্থানে সেনানিবেশ স্থাপন করিল। গীতলদহ, মোওয়ামারী ও বালাডাঙ্গাতে তাহার কতক সৈন্য গড়খাই করিয়া অবস্থিত ছিল। জিম্পির সৈন্য মধ্যে কতকগুলি ভোটানের উত্তর প্রান্তবাসী লোক ছিল। তাহারা সর্ব্বদাই মাদক সেবন করিত এবং মাংস ভোজন করিত। প্রবাদ আছে অন্য মাংসের অভাব হইলে এস্থানের লোক ধরিয়া নরমাংস আহার করিত। ভূটীয়ারা বিহার অধিকার করিলে, নাজিরদেব গোঁসাই এবং খাশনবিশ অনন্যোপায় হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহায়তা প্রার্থনা করিলেন এবং রাজ্যোদ্ধারের পারিতোষিক স্বরূপ কোম্পানিকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস তখন গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। তিনি বলিলেন, কোম্পানি নির্দ্দিষ্ট টাকা বিনিময়ে পরিশ্রম বিক্রয় করেন না। মহারাজ বার্ষিক কর প্রদান করিলে রাজ্যোদ্ধার করিয়া দিতে পারেন। নাজিরদেব অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। উভয়পক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

নিকটবর্ত্তী স্বাধীন রাজগণ একত্রে যোগ করিয়া রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করার মানসে তাঁহার রাজ্যে উৎপাত করিতেছে এবং তজ্জন্য তাঁহার রাজ্যের যথেষ্ট দুরবস্থা হইয়াছে, এই বিষয় কোচবিহাররাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতার মান্যতম অধ্যক্ষ ও সভাসদের নিকট জ্ঞাপন করাতে মান্যতম অধ্যক্ষ এবং সভাসদ ন্যায়ে অনুরাগ এবং অসহায়ের উপকারেচ্ছাবশতঃ, চারি দল সিপাহী সৈন্য ও একটী কামান, রাজা এবং তদীয় রাজ্য শত্রুপক্ষ হইতে উদ্ধার করার জন্য তথায় পাঠাইতে সম্মত হইলেন, উভয় পক্ষে নিম্নলিখিত রূপ সন্ধি হইল।

১। যে সকল সৈন্য কোচবিহারের সহায়তার জন্য আসিবে তাহাদের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে মহারাজকে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা রঙ্গপুরের কালেক্টরের নিকট এখনই আমানত করিতে হইবে।

২। এই টাকায় ব্যয় নির্ব্বাহ না হইলে যত অধিক লাগিবে, তাহা

রাজারই দিতে হইবে ; সমুদয় টাকা ব্যয় না হইলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তিনি ফেরত পাইবেন।

৩। শত্রুপক্ষ হইতে উদ্ধার হইলে রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করিবেন এবং তাঁহার রাজ্য বাঙ্গলা বিভাগের এক প্রদেশরূপে পরিগণিত হইবে।

৪। মহারাজ প্রতিবৎসর কোম্পানিকে তাঁহার রাজস্বের অর্দ্ধাংশ দিবেন।

৫। অপরার্দ্ধ তাঁহার এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের জন্য থাকিবে। তাঁহারা কোম্পানির বাধ্য থাকিলে তাহা চিরকাল উপভোগ করিতে পারিবেন।

৬। প্রকৃত রাজস্ব ঠিক করিবার জন্য মান্যতম অধ্যক্ষ ও সভাসদ তৎপক্ষে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া প্রেরণ করেন, তাঁহার হস্তেই রাজা হস্তবুদ অর্থাৎ রাজস্ব সম্বন্ধীয় কাগজপত্র দিবেন এবং তদ্দ্বারাই রাজা কত মালগুজারী দিবেন তাহা ধার্য্য হইবে।

৭। কোম্পানির প্রেরিত যে কোন ব্যক্তি মালগুজারী নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহাই চিরস্থায়ী থাকিবে।

৮। আবশ্যক হইলে কোম্পানি তাঁহাকে সৈন্য দ্বারা সহায়তা করিবেন কিন্তু সৈন্যের ব্যয় ভার রাজাকেই বহন করিতে হইবে।

৯। এই সন্ধি দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় কোর্ট অব্ ডিরেক্টর সন্ধি মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা পত্র, মান্যতম অধ্যক্ষ এবং সভাসদকে প্রদান না করেন তৎ সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৭৭৩ সনের ৫ই এপ্রিল তারিখে ফোর্ট উইলিয়মে এক পক্ষে মান্যতম অধ্যক্ষ ও সভাসদের স্বাক্ষর অপর পক্ষে ৬ই মাঘ ১৭৭৯ সন ধরেন্দ্রনারায়ণ নাবালক রাজার পক্ষে নাজিরদেব খগেন্দ্রনারায়ণের স্বাক্ষর। নবম ধারার লিখিত মঞ্জুরী কার্য্য প্রকৃত পক্ষে সংঘটিত হয় নাই। এই সন্ধি সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা আমাদের বক্তব্য আছে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে।

সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইলে সৈন্যাধ্যক্ষ জোন্স্ সাহেব চারি দল সিপাহী সৈন্য এবং একটী কামান সহ এরাজ্যে আগমন করিয়া ভূটীয়াদিগকে দূরীকৃত করেন। তিনি তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে একেবারে পর্ব্বতে তাড়াইয়া দেন এবং তাহাদের ডালিং-কোর্টের দুর্গ অধিকার করেন। ভূটীয়ারা এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল যে, তিব্বতের তিসুলামার পরামর্শে তাহারা সন্ধি করিতে সম্মত হয়, সেই সন্ধিতে ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ কারামুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে

প্রত্যাগমন করেন। ডাক্তর বুকানন বলেন, ভোটান রাজের সহিত সীমা নিরূপণ বিষয়ে যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কারণ ভুটীয়াদিগের সহিত বন্ধুভাব থাকিলে বাণিজ্য সম্বন্ধে বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, বত্রিশ হাজারীর যে অংশ ভোটানের অধিকৃত হইয়াছিল না, তাহাতে রায়কত দর্পদেব স্বত্ববান হয়। তাঁহার মতে বিহার আক্রমণে দর্পদেব একজন সহায়কারী ছিলেন। বাস্তবিক আমরাও বুকানন সাহেবের মত সমর্থন করিব। সন্ধিপত্রের প্রথমে লিখিত আছে স্বাধীন রাজগণ, রাজগণ বলিলেই ভোটান রাজ ব্যতীত অন্য কোন রাজা ছিল এরূপ অনুমান করিতে হইবে। এই সন্ধিতে দর্পদেব একজন জমীদাররূপে পরিগণিত হইলেন, কোচবিহারে তাঁহার কোন ক্ষমতা বা অধিকার রহিল না।

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ কারামুক্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে সকলে তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার মন এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, তিনি কোন মতেই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে সম্মত হইলেন না। রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণই নিয়মিত মতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ কারামুক্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ, নাজিরদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নাজির? কেন তোমরা কোম্পানিকে রাজত্ব প্রদান করিলে? যে রাজার হস্তী এবং মুদ্রা ঈশ্বর প্রদত্ত, সে অন্যকে কর প্রদান করিলে, তাঁহাকে কি প্রকারে ছত্রধারী রাজা বলা যাইবে? নাজিরদেব বলিলেন, মহারাজ! আপনাকে মুক্ত করার জন্যই আমরা কোম্পানিকে কর প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছি; মহারাজ বলিলেন আমার পূর্ব্ব জন্মের কার্য্যের যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছে। যদি বিশ্বসিংহের বংশ লোপ পাইত, যদি অন্য রাজা এদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহাও অনেক ভাল ছিল। আমি স্বাধীন রাজা হইয়া অন্য রাজার বশ্যতা স্বীকার করিব ইহা হইতে আর লজ্জাকর বিষয় কি হইতে পারে?

রঙ্গপুরের কালেক্টরগণই এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের যাহা কিছু করিবার ইচ্ছা হইত এবং রাজপক্ষ হইতে যে বিষয় গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করান আবশ্যক হইত তাহা কালেক্টরগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইত। তাঁহাদের হস্তেই কর আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। কর গ্রাহীরা সাজোয়াল নিযুক্ত করিয়া এরাজ্যের সমুদয় রাজস্ব আদায় করিতেন এবং অর্দ্ধ গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতেন, অপরার্দ্ধ রাজার ট্রেজারিতে জমা করিয়া দিতেন।

১৭৮০ খ্রীঃ কালেক্টর মেঃ পার্লিং সাহেবের প্রতি রাজস্বসম্বন্ধীয় হস্তবুদ প্রস্তুত করার আদেশ হয়। তিনি হস্তবুদ প্রস্তুত করিলে ঐ বৎসরই স্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত হয়; সেই বন্দোবস্তে এরূপ ধার্য হয় যে, রাজা বার্ষিক কোম্পানিকে ৬৭৭০০৮৴ কর দিবেন, তাহা কোন কালেও বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। ঐ সময়ে ইহাই প্রায় রাজস্বের অর্দ্ধেক ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যদিচ রাজার রাজস্ব সম্বন্ধীয় আয় প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে তদনুরূপ করই দিতে হয়। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করেন, তাহার অন্যূন বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল; প্রকৃত পক্ষে কর্ণওয়ালিশ কৃত বাঙ্গলার স্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত এই বন্দোবস্তের কোন সংশ্রব নাই।

ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সন্ধিতে নাজিরদেবের স্বত্ব সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। উল্লেখ না থাকাতে, কোচবিহারের অশুভ সাধনই হইয়াছিল বলিতে হইবে। পরে নাজিরদেব সম্বন্ধে বিশেষ গণ্ডগোল হইয়াছে তাহা যথা স্থানে বিবৃত করা যাইবে। ১৭৮০ খ্রীঃ মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে মন্ত্রিবর্গের বিশেষ অনুরোধে ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অনেক দিবস কারাগারে থাকাতে তাঁহার শরীর ও মন এত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি কেবল নামে মাত্র রাজা হইলেন, রাজকীয় সমুদয় কার্য্যই মহারাণী এবং তদীয় প্রিয় মন্ত্রী সর্ব্বানন্দ গোঁসাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজা হইয়া তিনি একবার গয়া ও কাশীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন; মহারাণী ও গোঁসাই এই সুযোগ পাইয়া রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবের সহযোগে নাজিরদেবের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; যে নাজিরদেব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এরাজ্যের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার মন্ত্রণাবলে ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি বদ্ধ হইয়া এরাজ্য ভোটান রাজের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছিল, সেই নাজিরদেব এখন সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিলেন। তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ও সমুদয় মর্য্যাদা লোপ পাইল। অগত্যা দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে আসামে পলায়ন করিতে হইল।

রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজত্বের শেষভাগে উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন ইহা মহারাণী এবং তদীয় প্রিয় মন্ত্রী সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর যত্ন প্রসূত ফল। সকলে তাঁহাকে পাগলা রাজা বলিত। বস্তুতঃ তিনি নিজে কিছুই কাজ করিতেন না, সমুদয় ক্ষমতা রাণী ও সর্ব্বানন্দের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

১৭৮৩ খৃঃ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

রঙ্গপুরের কালেক্টরগণ রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়া এরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে রাজার টাকশাল বন্ধ করিয়া দিতেন। কারণ এই টাকা দ্বারা বিনিময় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। কোন সময় এরূপ আদেশ প্রচার করিতেন যে, সহস্রের অধিক টাকা মাসিক মুদ্রিত হইতে পারিবে না। আদেশ লঙ্ঘন অপরাধে সময়ে সময়ে রাজকর্ম্মচারিগণকে কারাবাস দণ্ড প্রদান করিতেন। অধিকাংশ কালেক্টরগণই রাণীর পক্ষ সমর্থন করিতেন। নাজিরদেব কাজেই ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হইলেন। মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তদীয় উইল অনুসারে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইলেন এবং তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার মহারাণীর হস্তে সমর্পিত হইল।

ইতিমধ্যে গুডলাড নামক কালেক্টর নাজিরদেবের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। নাজিরদেব আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া কালেক্টরের নিকট বলিলেন যে, মহারাণীর হস্তে রাজ্যের ভার থাকিলে গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত কর প্রাপ্তির বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইবে। নাজিরদেব স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া এক বৎসর কর আদায়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং রাজ-মোহর আত্মসাৎ করিলেন। নিজ পুত্রকে যুবরাজ উপাধি প্রদান করিলেন। রাণী এবং তদীয় প্রিয় পাত্রের প্রতি নানারূপ উৎপাত আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই সকল গণ্ডগোলের বিষয় অবগত হইয়া রাজা ও রাণীকে রক্ষা করার জন্য কাপ্তান স্মিথকে পাঠাইয়া দিলেন। নাজিরদেবের হস্ত হইতে কর আদায়ের ভার উঠাইয়া দিয়া, মৃত রাজার উইল অনুসারে রাণীর হস্তে সমুদয় কার্য্যভার অর্পণ করিলেন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক নৃপতি হরেন্দ্রনারায়ণের উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করিয়া ১৭৮৪ খৃঃ ২৮শে মে তারিখে রঙ্গপুরের কালেক্টর মুর সাহেবের দ্বারা নিম্নলিখিত ঘোষণা পত্র রাজ্য মধ্যে প্রচারিত করিলেন। গবর্ণর এবং তদীয় সভাসদ দেখিলেন, কোচবিহারের মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ এক উইল দ্বারা তদীয় পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণকে রাজত্বে বরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল পর্য্যন্ত রাজ্যের সম্যক্ ভার মহারাণীর হস্তে রাখিয়াছেন, সুতরাং মান্যতম অধ্যক্ষ এবং সভাসদ বিবেচনা করেন যে, রাজা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত, মহারাণীকে মেনেজারের ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতে

পারে। এজন্য কোচবিহারবাসীদিগকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা মহারাণীর আদেশ পালন করে।

উপরোক্ত উইলের সত্যতা সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ করিয়াছেন। কর্ণেল হটন বলেন "যখন কমিসনর মার্সার এবং চিবাট সাহেব এরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা তদন্ত করেন, তখন প্রত্যেক সাক্ষীই এরূপ জবানবন্দী দিয়াছিল যে, তাহাদের সাক্ষ্য, শিক্ষিত কথার ন্যায় বোধ হইল। সকলেই বলিয়াছিল যে রাজা তাঁহার মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে এই উইল করিয়াছিলেন কিন্তু জয়নাথ মুন্সী তদীয় রাজোপাখ্যানে লিখিয়াছেন যে মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উইল হয়। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে সকলে পাগলা রাজা বলিত। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি পাগল হইয়াছিলেন সুতরাং এই উইলের সত্যতা সম্পূর্ণ সন্দেহজনক।"

মেজর জেঙ্কিন্স বলেন যে, মহারাণী এবং সর্ব্বানন্দ গোঁসাইর চক্রান্তেই রাজা পাগল হইয়াছিলেন সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে মহারাণী গোঁসাইর সহায়তাতে এই উইল বাহির করিয়াছিলেন। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট সবিশেষ তদন্ত না করিয়াই উল্লিখিত ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু এরূপ বন্দোবস্তে কিছুই ফল হইল না, মহারাণী তদীয় প্রিয়পাত্র সর্ব্বানন্দ গোঁসাইর মন্ত্রণায় ক্রমে ক্রমে সকলকে পুনরায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তুলিলেন। নাজিরদেব আসামে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তথায় থাকিয়াই ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। রাণীর রাজত্বে দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। নাজিরদেব, দেওয়ানদেব প্রভৃতি সমুদয় প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাদের স্বকীয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এরূপ ভয়ানক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া নাজিরদেবের ভ্রাতা ভগবন্তকুমার দেওয়ানদেব এবং অন্যান্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং হঠাৎ এক দিবস রাজবাটী আক্রমণ করিয়া রাজা, রাজমাতা এবং গোঁসাইকে বন্দীভাবে বলরামপুরে প্রেরণ করিলেন। ১৭৮৮ খৃঃ।

এই সময়ে নাজিরদেব বাড়ী ছিলেন না। সৈন্যগণ মহারাণীর দুরবস্থা করিতে ত্রুটী করিয়াছিল না। রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেব এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একদল সিপাহী সৈন্য বলরামপুরে পাঠাইয়া দেন এবং রাজা ও রাজ-মাতাকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। নাজিরদেবের সৈন্যের সহিত সাধারণ সংগ্রাম হইয়াছিল এবং কতক লোকও নিহত হইয়াছিল। চক্রান্তকারীদিগকে ধৃত করিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ অপেক্ষায় রঙ্গপুরের কারাগারে রাখা হইল।

গবর্ণর জেনেরেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ পূর্ব্বে এরাজ্যের দুরবস্থার বিষয় বিশেষ

অবগত ছিলেন, কারণ উভয়পক্ষই সর্বদা তাঁহার নিকট আবেদন পাঠাইতেন। তিনি অধুনাতন গণ্ডগোলের সংবাদ অবগত হইয়া ১৭৮৮ খ্রীঃ ২রা এপ্রিল তারিখে আদেশ প্রচার করিলেন যে, লরেন্স মার্সার এবং মেঃ চিবাট এরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিষয়ে তদন্ত করিয়া সম্যক রিপোর্ট করেন। তাঁহাদের প্রতি নানা বিষয়ের তদন্তের ভার অর্পণ করা হয়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী প্রধান।

১ম। নাজিরদেবের স্বত্ব এবং অধিকার সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় মীমাংসা করা। ২য়। এরাজ্যের শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্যে ইংরেজ ক্ষমতা কতদূর প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহার নিরাকরণ করা।

১৭৮৮ খ্রীঃ মে মাসে প্রথমে রঙ্গপুরে তদন্তের কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে মোগলহাট এবং কোচবিহারে ২৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত তদন্ত হয়। ১০ই ডিসেম্বর কমিসনরগণ তাঁহাদের রিপোর্ট প্রেরণ করেন।

নাজিরদেবের তিনটী দাবী ছিল। ১। রাজা মনোনীত করার ক্ষমতা। ২। রাজ্যের আয়ের $\frac{১}{১৬}$ অংশ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজে উপভোগ করা। ৩। বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া।

প্রথম দাবী সম্বন্ধে নাজিরদেব বলেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ শান্তনারায়ণ কুমার হইতে এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দাবী সম্বন্ধে কমিসনরগণ কিছুই বলেন নাই। বাস্তবিক এরূপ ক্ষমতা থাকা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না, তজ্জন্য কমিসনরগণ নাজিরদেবের এই দাবী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তদ্বিষয়ে আর কিছু উল্লেখ করেন নাই।

নাজিরদেবের তৃতীয় দাবীও কমিসনরগণ অগ্রাহ্য করেন। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, বস্তুগত্যা এই সকল পরগণাতে নাজিরদেবের কোন স্বত্ব ছিল না, কেবল তাঁহার নামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। রাজা স্বীয় নামে মুসলমান সুবেদারের নিকট কর প্রদান অবমাননা বোধ করিয়া এই তিন পরগণা নাজিরদেবের নামে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্য সময়ে নাজিরদেব স্বকীয় ক্ষমতা ও চতুরতা বলে অনেক সময় ইহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়াছেন, এক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইলেন।

নাজিরদেবের দ্বিতীয় দাবী সম্বন্ধে কমিসনরগণ তাঁহাকে তাঁহার উপাধি এবং পদে বলবৎ রাখেন। এবং বলরামপুরের চতুর্দ্দিকের দুই ক্রোশ পরিমিত স্থানের স্বত্ব তাঁহাকে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন। রাজ্যের $\frac{১}{১৬}$ অংশ

প্রাপ্তি বিষয়ে কমিসনরগণ মীমাংসা করেন যে, বার্ষিক কর এবং শাসন খরচ বাদে যাহা আয় হইবে তাহার ১/৬ অংশ তিনি পাইতে পারেন। কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট ভূমির স্বত্ব তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু অবশেষে এই স্বত্ব মাসিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা বৃত্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ১৭৯৮ সনের এপ্রিল মাসে নাজিরদেব এই সকল নিয়মে সম্মত হইতে অস্বীকৃত হন। পরে ১৮১০ খৃঃ অব্দের প্রতিজ্ঞাপত্র অনুসারে এই বিষয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত নাজিরদেবের প্রতিপালন জন্য দেওয়া হইবে এরূপ ধার্য্য হয়। যাহা হউক ইহার পর হইতে নাজিরদেব রাজ্যের শান্তির কোন ব্যাঘাত করেন নাই। ডাক্তার বুকানন বলেন, সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এই তিন পরগণার রাজস্ব নাজিরদেব পাইতেন, কারণ তিনি প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। কিন্তু যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজার সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন তখন আর রাজার সৈন্য রাখার আবশ্যক হইল না সুতরাং নাজিরদেবও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট রাজার পক্ষ সমর্থন করিয়া পরগণা ত্রয় জমিদারী স্বত্বে রাজাকে প্রদান করিলেন।

সন্ধি ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহিত রাজ্যের সম্বন্ধ সূচক প্রস্তাবে কমিসনরগণ বলেন ; "আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে এই সন্ধি পরস্পর সুবিধার জন্য দুই স্বাধীন রাজগণের মধ্যে স্থাপিত হইল। দুর্ব্বল পক্ষ সবল পক্ষের নিকট আংশিক অধীনতা স্বীকার করেন বটে কিন্তু তাহার নিয়মাবলীও স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। সন্ধির তৃতীয় নিয়মে প্রকাশিত আছে যে, রাজা সহায়তার মূল্য স্বরূপ ইংরেজদিগের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবেন এবং তাঁহার রাজ্য বাঙ্গলা বিভাগের সহিত সংযুক্ত হইবে। কিন্তু যখন ইহা বিবেচনা করা যায় যে, রাজার সহিত গবর্ণমেণ্ট অতঃপর কিরূপ সম্বন্ধে সংস্পৃষ্ট থাকিবেন, তখন দেখা যায় যে, সন্ধির নিয়মাবলীতে তাহা স্পষ্টতঃ নির্দ্দিষ্ট রূপে প্রকাশিত আছে। প্রথমতঃ রাজা তাঁহার রাজ্যের একাংশের রাজস্ব প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টকে দিবেন, তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট ; তাহা বৃদ্ধি পাইতে পারিবে না। এবং রাজা গবর্ণমেণ্টের বাধ্য থাকিবেন। সুতরাং সন্ধির অভিপ্রায় ন্যায়তঃ বিবেচনা করিতে গেলে, ইহা স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইবে যে, দুর্ব্বল পক্ষের মতের বিরুদ্ধে বশ্যতা এবং সংযোগ এই দুই শব্দ দ্বারা সুবিধা অনুসন্ধান করা উচিত নহে। তাঁহার আপন রাজ্যে স্বাধীন স্বত্বের কোনও প্রকার ন্যূনতা হওয়া সন্ধির অভিপ্রেত নহে, যেহেতু দুইটী রাজ চিহ্ন তাঁহার স্পষ্ট বর্ত্তমান আছে। ১। স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করা এবং ২। বিচার ক্ষমতা।"

উপরোক্ত ঘটনাবলী দ্বারা এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে সন্ধির অভিপ্রায় নিম্নলিখিতরূপ ছিল। "কোচবিহার ভবিষ্যতে করদ রাজ্যরূপে গণ্য করা যাইবে এবং গবর্ণমেণ্ট তাহার রক্ষার সহায়তা করিবেন তজ্জন্য কোচবিহার রাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং অংশতঃ তাঁহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহার স্বাধীনতা অক্ষত রহিয়াছে।"

এই সকল বিষয় ১৮১৬ খ্রীঃ গবর্ণর জেনেরল এবং তদীয় সভাসদ মীমাংসা করেন। তাহাতে এরূপ নিষ্পত্তি হয় যে, কোচবিহারের আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রতি গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না।

রাজ্য মধ্যে অসূয়া পরবশ বিভিন্ন পক্ষ বর্ত্তমান থাকাতে এবং কর আদায়ের প্রণালীর সুব্যবস্থা না থাকাতে এবং স্থানীয় মুদ্রার প্রচলন দূষণীয় বোধ হওয়াতে, গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া এরাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ হস্তক্ষেপ সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে হয় নাই। বরং তদ্দ্বারা রাজ্যের অনিষ্টই সংঘটন হইয়াছে।

এই সকল কারণে কমিসনরগণ এরাজ্যে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট রাখার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ১৭৮৯ খ্রীঃ হেনরী ডগ্লাস সাহেব কমিসনর নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তাঁহার আগমনে রাজ্যে একরূপ শান্তি স্থাপিত হয়। কমিসনর বিচার এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় আফিসের কাজ কর্ম্ম নিজেই করিতেন ও নিম্ন আদালতের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেন এবং তথাকার বিচার্য্য মোকদ্দমার আপীল শুনিতেন। তিনি ক্রমে ক্রমে রাণী এবং তদীয় প্রিয় মন্ত্রীর ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার রেবিনিউ বোর্ডে এবং সদর দেওয়ানী আদালতে, তাঁহার ত্রৈমাসিক রিটার্ণ দাখিল করিতেন।

রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত রঙ্গপুরের জিলায় রাজার যে সকল জমিদারী ছিল, তাহার শাসন সংরক্ষণের ভারও কমিসনরের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এমন কি কার্য্য বাহুল্য বিষয়ে তিনি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৯০ খ্রীঃ এতদ্ব্যতীত অধিকতর কার্য্যভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহাকে গোয়ালপাড়ার রেসিডেণ্টের কাজও করিতে হইত। তিনি ১৭৯০ খ্রীঃ ভূমি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াও করিতে পারিলেন না। অতঃপর যখন আমুটী সাহেব এরাজ্যের কমিসনর ছিলেন, তখন রাজ্যের ভূমি সম্বন্ধে নিয়মিত বন্দোবস্ত হয়, এবং ঐ সঙ্গে রঙ্গপুরের অন্তর্গত জমিদারীরও পাঁচসনা ম্যাদে এক বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ১৮০১ খ্রীঃ মহারাজ

হরেন্দ্রনারায়ণ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে আমুটী সাহেব তাঁহাকে রাজ্যভার অর্পণ করিতে আদিষ্ট হন এবং তিনি চলিয়া যান।

ডগ্লাসের সময় হইতে ডগ্লাস, বুস, স্মিথ্ এবং আমুটী সাহেব রেসিডেণ্ট কমিসনর ছিলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে রঙ্গপুরের কালেক্টর লামস্‌ডেন এবং রাইট সাহেব সময়ে সময়ে প্রতিনিধি কমিসনরের কাজ করিতেন। উপরোক্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে এরূপ কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, তদ্দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট এরাজ্যে কিরূপ আধিপত্য প্রকাশ করিবেন। টাকশাল সম্বন্ধেই কেবল কতিপয় বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৯৫ খৃঃ কমিসনর স্মিথ্ সাহেব রিপোর্ট করেন যে, রাজা পুনরায় মুদ্রা নির্ম্মাণে অভিলাষী এবং গবর্ণমেণ্ট যখন বার বার নিষেধ করিয়াছেন তখন আর তিনি গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় জ্ঞাত করান আবশ্যক বোধ করেন না। ১৭৯৬ খ্রীঃ বোর্ড অব্ রেবিনিউ কোচবিহারে সিক্কা টাকা প্রচলনের জন্য প্রস্তাব করেন বটে, কিন্তু সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় না। ইহাও দেখা যায় যে ১৭৯৯ খ্রীঃ টাকশালের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিতেছিল, কারণ ঐ বৎসর কমিসনর আমুটী সাহেব ঐ কার্য্য তিন মাস স্থগিত রাখার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ১৭৯৬ খ্রীঃ মুদ্রাঙ্কনের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। এবং মুদ্রাযন্ত্র কমিসনরের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল না। রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে কমিসনরগণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া টাকশাল সম্বন্ধে কোনও নিয়ম প্রচার করিতে পারিতেন না।

এই সময়ের আর একটী প্রধান ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। ১৭৯২ খ্রীঃ ১০ই আগষ্ট লামস্‌ডেন সাহেবের প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে এরূপ অনুজ্ঞা প্রচারিত হয় যে, রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল পর্য্যন্তই ভূমির বন্দোবস্ত স্থায়ী থাকিবে; রাজা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে এই বন্দোবস্তে তিনি বাধ্য হইবেন না। এই ঘটনাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা এবং শাসন সম্বন্ধীয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী ছিলেন না; এবং প্রকৃত পক্ষে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই।

১৭৯৩ খ্রীঃ হাজারা সিংহ নামক এক ব্যক্তি বিহার আক্রমণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল কিন্তু পাটগ্রামের নিকট একদল সিপাহী সৈন্য তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল।

১৭৯৪ খ্রীঃ মহারাজ, যদুনাথ ঈশর এবং পদ্মনাথ কার্জির কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন, তদুপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়াছিল।

১৮০১ খ্রীঃ কমিসনর চলিয়া গেলে পুলিসের তত্ত্বাবধারণের ভার রঙ্গপুরের কালেক্টরের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। ১৮০৩ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিলেন যে, পুনরায় কমিসনর নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং মেঃ পিরার্ডকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার প্রতি এরূপ অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, তিনি রাজার সহযোগে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কতিপয় সুনিয়ম সংস্থাপন করিবেন, বিচার বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবেন, পুলিস আফিস ভাল করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। পিরার্ডের নিযুক্তি পত্রে ইহাও দেখা যায় যে, রাজার ইচ্ছামত তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যকালে রাজা তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন এবং পিরার্ড কোচবিহার আগমন করিলে, তাঁহার উপস্থিতি বিষয়ে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কাজেই গবর্ণমেণ্ট ১৮০৪ খ্রীঃ ১লা আগষ্ট পিরার্ডকে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

এই বৎসরই ফ্রেঞ্চ সাহেব পুনরায় এরাজ্যের কমিসনর নিযুক্ত হইয়া আইসেন, তাঁহাকে এরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছিল যে, রাজা যাহাতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রীতি অনুসারে আফিস সকল সংস্থাপন করেন এবং নিয়মাদি প্রচার করেন, তদ্বিষয়ে তিনি মত লওয়াইবেন। আফিসে রাজার নিজ কর্ম্মচারিগণই থাকিবে। যতদিন কমিসনর রাজাকে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত করিতে অসমর্থ থাকেন, ততদিন কেবল রাজকীয় বিচার এবং অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করিবেন। এবং কোনও ভয়ানক অবিচার হইলে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন।

ফ্রেঞ্চ সাহেবও রাজার মত পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইলেন না; কাজেই ১৮০৫ খ্রীঃ কোচবিহারের কমিসনরী এবালিস হইয়া পুনরায় রঙ্গপুরের কালেক্টরের হস্তে এরাজ্য সম্বন্ধীয় ভার অর্পিত হইল এবং রাজাকে এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে, গবর্ণমেণ্ট আপন মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, কেবল সংপ্রতি এই সকল বিষয় স্থগিত রাখিলেন। কারণ অভিজ্ঞতাবলে রাজা ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই সকল কার্য্যে সম্মত হইবেন। ১৮০৫ খ্রীঃ ১৩ই নভেম্বর।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ গবর্ণর জেনেরল থাকা সময়ে রাজাকে শিক্ষিত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। এবং শিক্ষাও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু রাজা স্বাধীনতা পাইয়াই কুক্রিয়াশক্ত হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার বুকানন বলেন, রাজা সর্ব্বদা মাদক দ্রব্য সেবন করিতেন এবং অসংসর্গেই দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতেন। রাজকার্য্যের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ দিতেন

না। এই সময়ে বাঙ্গালী বাবুরা এরাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। রাজগণেরা অলসতা প্রযুক্ত কাজ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, দক্ষিণ দেশীয় লোকের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয় এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর পদ তাহারাই অধিকার করিয়া লয়।

কোচবিহার কমিসনরী উঠিয়া গেলে, রঙ্গপুরের কালেক্টর মণ্টগোমারী এবং ডিগবী এরাজ্য সম্বন্ধীয় ভারপ্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের সময়ের প্রধান ঘটনা এই : রাজা অসূয়াবশতঃ দেওয়ানদেব ও নাজিরদেব এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলে, ডিগবী সাহেবকে এরূপ আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল যে, তিনি আবশ্যক হইলে রঙ্গপুর হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া নাজিরদেবকে মার্সার ও চিবাটের রিপোর্ট অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকারী রাখেন।

এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের মত স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। ১৮১১ খ্রীঃ ডিগবী, নীলধন তেওয়ারি নামক এক প্রজার দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন, তাহাতে রাজার অনেক দোষ বর্ণিত ছিল। রাজা পাঁচ ছয় মাসে একবার বাহির হন, তাহাতেও কোন প্রজার সঙ্গে দেখা হয় না, প্রজারা রাজ্য ছাড়িয়া যাইতেছে ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে এরূপ আদেশ প্রচার করেন যে, রাজার স্বাধীন স্বত্ব বিষয়ে পূর্ব্বে যেরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে এখন আমরা হস্তক্ষেপ করা উচিত বিবেচনা করি না। ব্যক্তিগত বিচার সম্বন্ধীয় যাবতীয় ভার রাজার হস্তেই থাকিবে।

মেজর জেঙ্কিন্স বলেন, এই নালিশ ব্যক্তিগত ছিল না, ফৌজদারী কোর্ট, অন্যায়পূর্ব্বক দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীর বাধকতা জন্মাইলে, রাজার ফৌজদারী কোর্টের বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত হয়, তথায় রাজার দেওয়ান গুরুপ্রসাদ প্রধান কর্ম্মকারক ছিলেন। ১৮১৪ খ্রীঃ মেক্লিয়ড সাহেব এই বিষয় গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করাতে, গুরুপ্রসাদকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার আদেশ হইয়াছিল।

ক্রমে নাজিরদেব, দেওয়ানদেব প্রভৃতির প্রতি অত্যাচার না কমিয়া বরং বৃদ্ধিই পাইতেছিল। একদা দেওয়ানদেবের মোক্তার হরিশ চক্রবর্ত্তীকে রাজা কারাগারে রুদ্ধ করেন। মণ্টগোমারী কোচবিহার আসিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর মোক্তারকে মুক্ত করিয়া এক দল দেশীয় সৈন্য তাহার রক্ষার্থে রাখিয়া যান। কিন্তু সেই সকল সৈন্য চলিয়া গেলেই, রাজা পুনরায় মোক্তারকে কয়েদ করেন এবং কেহ কেহ বলেন, কয়েক দিবস পরে তাহাকে নিহত করেন। দেওয়ানদেব

স্বকীয় জীবনের বিপদাশঙ্কা জ্ঞাত করাইলে, এক দল সৈন্য তাঁহার রক্ষার্থ প্রেরিত হয় এবং ডিগবী সাহেব কোচবিহার আসিয়া এরূপ রিপোর্ট করেন যে, দেওয়ানদেবের প্রতি রাজার এতদূর বিদ্বেষ এবং তিনি এরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছেন যে, আমার বিবেচনায় উপদেশে কিছুই ফল হইবে না।

এই অত্যাচারের সংবাদ গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইলে, ১৮১৩ খ্রীঃ পুনরায় মেক্লিয়ড সাহেব এথাকার কমিসনর নিযুক্ত হইয়া আইসেন। কমিসনরের আগমনে রাজা প্রথমে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে সম্মত আছেন।

কমিসনরকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আফিস সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালীর সুশৃঙ্খলা করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। পুলিশ বিভাগের উন্নতি সাধনার্থ কমিসনরকে রঙ্গপুরস্থ কয়েকটী থানার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাও প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনও রূপ পরিবর্ত্তনে তিনি রাজাকে সম্মত করাইতে পারিলেন না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট দ্বারা রাজ্য শাসন চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। ১৮১৬ খ্রীঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাজা ও কমিসনরকে এই বিষয় লেখা হইল।

এই সময় হইতে কমিসনরগণ উপদেশ ব্যতীত এরাজ্যের প্রতি কোনও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

১৮২২ খ্রীঃ এরাজ্যে অতিবৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদির পক্ষে বিশেষ হানি হইয়াছিল।

মেক্লিয়ডের পর স্কট্ সাহেব কমিসনর নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধ-কার্য্যে লিপ্ত থাকায়, এরাজ্য সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন নাই। তিনি দেওয়ানদেব এবং নাজিরদেব সম্বন্ধীয় কতিপয় আপত্তি মীমাংসা করেন; এবং রাজার রাজকার্য্যে অমনোযোগিতা এবং অপরিমিতব্যয়িতা দোষে গবর্ণমেণ্টের যাহা বাকী পড়িয়াছিল, তিনি তাহা আদায় করিতে সযত্ন হয়েন। রবার্টসন নামে এক সাহেব ১৮৩০ হইতে ১৮৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত কমিসনর ছিলেন কিন্তু তিনি কখনও কোচবিহারে পদার্পণ করেন নাই। ১৮৩৪ খ্রীঃ মেজর জেঙ্কিন্স এথাকার কমিসনরের পদে নিযুক্ত হয়েন।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভেটাগুড়ী ও ধলুয়াবাড়ীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া অনেক দিন অবস্থিতি করেন। ঐ সকল স্থানে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

১৮৩৫ খ্রীঃ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কাশী যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অনেক স্থলে হিন্দু নিয়ম মতে পূজা অর্চ্চনা ও দানধ্যান করিয়াছিলেন। বারাণসীতে পৌছিয়াও বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। মহারাজ কাশীযাত্রার পূর্ব্বেই তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ এবং চতুর্থ পুত্র বজ্রেন্দ্রনারায়ণকে একত্রে রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া যান।

নবম অধ্যায়।

১৮৩৯ খ্রীঃ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কাশীধামে পরলোক গমন করিলে, কুমার বজ্রেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসন পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ স্বকীয় বুদ্ধি এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সহায়তাবলে, সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ অপরিমিত গুণশালী ছিলেন। কোনও ভূপতি তাঁহার মত সুচারুরূপে রাজকার্য্য সমাধা করিতে পারেন নাই। তদীয় পিতা তাঁহাকে ঋণজালে যেরূপ আবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, মহারাজ মিতব্যয়ী এবং সুশৃঙ্খলাস্থাপক না হইলে এরাজ্যের অদৃষ্টে যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা বলা যায় না। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াই রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ বিধান করিতে লাগিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের প্রতি বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন। কাজেই রাজস্বে অধিক আয় হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় মিতব্যয়িতাগুণে এবং গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে, কর বাবদে গবর্ণমেণ্টের যত দেনা ছিল, তাহা সমুদয় পরিশোধ করিয়া, রাজ্যকে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা হইতে মুক্ত করিলেন। তিনি যে কেবল গবর্ণমেণ্টের দেনা পরিশোধ করিলেন এমত নহে, হরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের সাময়িক অন্য প্রকারের বহুতর দেনা ছিল, তিনি তাহাও পরিশোধ করিলেন এবং মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত রাখিয়া গেলেন। বাস্তবিক এই ভূপতিই রাজ্য রক্ষার একমাত্র মূল।

ইনি পাঁচগড়ের বজ্রধর কার্জির কন্যা এবং পর্ব্বত জোয়ারের ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা মহিষী শ্রীশ্রীমতি কামেশ্বরী আই দেবতীকে, শ্রীশ্রীডাঙ্গর আই দেবতী বলে। তিনি এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন এবং রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় তাঁহার আদেশ ব্যতীত হইতে পারে না। ইঁহাকে যেরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা এবং বুদ্ধিমতী দেখা যায়, তাহাতে অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই মহারাণীর ক্ষমতা প্রভাবেই মহারাজ কোনও

অসদাচরণ করিতে পারেন নাই এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় কোনও দোষে দূষিত হইতে পারেন নাই।

এই রাজত্বে ধর্ম্মশালা নামক একটী অতিথিশালা স্থাপিত হয়। অদ্যাপি তাহার কার্য্য চলিতেছে এবং নিয়মিত অতিথি সেবা হইতেছে। ১৮৪২ খ্রীঃ অতি বৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৪৬ খ্রীঃ মহারাজ কাশীযাত্রা করেন, যাত্রাকালে তিনি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত মহেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যের মেনেজার নিযুক্ত করেন এবং মৃত্যুর পর বজ্রেন্দ্রনারায়ণ (সরবরাকার সাহেব)-কে মেনেজার মনোনীত করিয়া যান এবং উক্ত সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

১৮৪৭ খ্রীঃ কাশীধামে মহারাজের মৃত্যু হইলে, মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ যথারীতি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৬ বৎসর ছিল। রাজার প্রার্থনানুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরেজী অধ্যয়ন করিতে দেন এবং বজ্রেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যের ও জমিদারীর মেনেজার নিযুক্ত হন।

দশম অধ্যায়।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তের এজেণ্ট জেন্‌কিন্স সাহেব ১৮৩৪ খ্রীঃ হইতে এরাজ্যের কমিসনরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ তিনি এরূপ রিপোর্ট প্রদান করেন যে, তাঁহার সময়ে ১৮৩৬, ১৮৪১, ১৮৪৫, ১৮৪৯ খ্রীঃ চারিবার কোচবিহার পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টের উপসংহার-কালে লিখিয়াছেন যে, বিগত ৩৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকীয় সমুদয় কার্য্যভার রাজা এবং তদীয় কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহাতে কমিসনরের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না। ২৬ বৎসরকাল কোনও স্থানীয় কমিসনর ছিল না এবং একাদিক্রমে চতুর্দ্দশবৎসর কোনও কমিসনর কোচবিহার পরিদর্শন করেন নাই।

মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ কিয়দ্দিন কৃষ্ণনগরে থাকিয়া কলিকাতা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে আনীত হন এবং তথায় রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে রাজ্যের শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্য নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইত। মৃত রাজার অনুমত্যানুসারে সরবরাকার সাহেব মেনেজার নিযুক্ত

হন। তাঁহার মৃত্যুর পর শাসনভার শ্রীশ্রীমতি মহারাণী কামেশ্বরী ও বৃন্দেশ্বরী আই দেবতীর হস্তে ন্যস্ত ছিল।

ফৌজদারী আদালতে একজন আহেলকার, একজন নাএব আহেলকার ও একজন আপীলের জজ ছিলেন। দেওয়ানী আদালতে একজন সদর আমিন, একজন আহেলকার এবং একজন আপীল জজ ছিলেন। আপীল জজের পদে বজ্রেন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র অধিষ্ঠিত ছিলেন। অপর সকল কর্ম্মচারীই ভিন্ন দেশীয় ছিল। এদেশে বিচারককে আহেলকার বলে। সাধারণ-ব্যবস্থা-প্রথা সমন্বিত প্রদেশ সকলের মাজিষ্ট্রেটের যেরূপ ক্ষমতা আছে, ফৌজদারী আহেলকারের তদ্রূপ ক্ষমতা ছিল। তিনি ফৌজদারী আদালত এবং পুলিশের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মেজর জেন্‌কিন্স বলেন, এই আদালতের বিচার এবং ইহার কর্ম্মচারিগণের দক্ষতা অন্যান্য প্রদেশের কর্ম্মচারিগণের দক্ষতা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তিনি আরও বলেন যে, অল্প বেতন পাইলে লোক অসৎপথ অবলম্বন করিতে পারে বটে; কিন্তু এই সকল কর্ম্মচারী অল্প বেতন পাইয়াও সৎপথেই ছিলেন। সকলেরই আয়ের অন্য উপায় ছিল। তিনি ফৌজদারী আদালত পরিদর্শন করিয়া কখনও অসন্তুষ্ট হন নাই। সদর অর্থাৎ কোতোয়ালী, দীনহাটা, মেকলীগঞ্জ, গিলাডাঙ্গা, ভবানীগঞ্জ, শ্যামগঞ্জ এবং চক্রবন্দী নামক ৬টী থানা বা ফাঁড়ি ছিল। পূর্ব্বে থানার কাজ অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়ই হইত। নায়েব আহেলকার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন ছিলেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। ফৌজদারী আদালত ও আপীল আদালতের উপর রাজসভা নামে বিচারালয় ছিল, তথায় রাজা স্বয়ং কিম্বা সরবরাকার সাহেব সভাপতি থাকিতেন। দেওয়ান ও মুস্তফী প্রভৃতিরা মেম্বর ছিলেন।

দেওয়ানী আদালতে একজন সদর আমিন এবং একজন আহেলকার ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে যেরূপ মূল্যের ষ্টাম্প দিতে হয়, এখানে ষ্টাম্পের পরিবর্ত্তে তৎপরিমিত মূল্য ফিস্ স্বরূপ দিতে হইত। ঐ ফিস্ দ্বারাই ঐ আফিসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এখানে বিশেষ নিয়ম এই ছিল যে, দরখাস্ত দাখিল করিলেই আসামীকে জামিন দিতে হইত। জামিন দিতে অসমর্থ হইলে তাহাকে কারাগারে রাখিবার নিয়ম ছিল। অনেক দিন হইতেই এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, কারণ অধমর্ণ প্রায়শঃ বিদেশীয় লোক, তাহারা অনায়াসেই ভূটানে কি রঙ্গপুরে পলায়ন করিয়া যাইতে পারিত।

বর্ষিক কর আদায়ের জন্য চারিটী আফিস ছিল এবং তাহাতে চারিজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। উপরোক্ত শাসন প্রণালী বহুকাল হইতে

চলিয়া আসিতেছিল। উক্ত কর-আদায়-প্রণালীর সুশৃঙ্খলা না থাকায় ১৭৪০ এবং ১৭৯০ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট আবোয়াব, নজর, সেলামি প্রভৃতি যত প্রকারের অন্যবিধ উপায় ছিল, তাহা উঠাইয়া দেন এবং ১৮১৪ খৃঃ এ রূপ নিয়ম প্রচার করেন যে, খাস ও খানগি মহালে কোনও প্রভেদ থাকিবে না। কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্তে রাজাভিষিক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব নিয়ম প্রচার করেন এবং পূর্ব্বমত অন্যবিধ কর আদায় হইতে থাকে এবং তাহা উল্লিখিত সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। খাসমহালের কর আদায়ের ভার দেওয়ানের হস্তে ছিল। আজ জমা ব্যতীতও প্রজাদিগকে অনেক প্রকারে অধিক টাকা দিতে হইত। খাসভূমি ব্যতীত নূতন আবাদি জঙ্গলা ভূমির (যাহাকে দেওয়ান বস্ বলে) কর আদায়ের ভারও দেওয়ানের হস্তে ছিল। খাসজমী সকল কয়েক বৎসরের ম্যাদে ইজারা দেওয়া হইত। এই সকল খাসমহাল শস্য বিবেচনায় ছয়ভাগে বিভক্ত ছিল। ইক্ষু ও সরিষা ক্ষেত্রের জন্য অধিক কর দিতে হইত। রাণীগণ, রাজার জ্ঞাতিগণ এবং আফিসের কার্য্যকারকগণই সচরাচর ইজারা গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা স্বকীয় চাকর বা আত্মীয়ের নামে পাট্টা লইয়া নিজেরা প্রতিভূ থাকিতেন। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপতি রাজস্ব সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ নিয়ম করেন যে, ইজারাদারগণ শতকরা তিন টাকা অগ্রিম দিলে, তাহারা প্রত্যেক পঞ্চম বৎসরে ইজারা পুনঃগ্রহণ করিতে পারিবে। ইজারা সকলের মধ্যে অনেকগুলি পৃথক পৃথক জোত ছিল। বস্তুগত্যা ইজারা সকল একজনের হস্তেই থাকিত, এবং জোতদার ও রাইয়তগণ স্থায়ীরূপে পাট্টা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা ভোগ করিত। যদিচ কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক ছিল না, কিন্তু এই নিয়মে প্রজারা কোনও আপত্তি করে নাই বরং জোতদার দিগকেই আপত্তি উত্থাপন করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু ভাল শস্য উৎপাদনের উৎসাহ কিছুমাত্র প্রদর্শন করা হইত না।

খানগি মহাল অর্থাৎ যে ভূমির উপস্বত্ব দ্বারা রাজ পরিবার প্রতিপালিত হইতেন, তাহার কর আদায়ের ভার, তিনজন কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং তজ্জন্য তিনটী আফিস ছিল। ইহার প্রধান মহালের কর আদায়ের ভার ফৌজদারী আহেলকারের হস্তে ছিল। তাঁহার সংগৃহীত রাজস্ব, দেওয়ানের সংগৃহীত রাজস্বের অর্দ্ধ পরিমাণ ছিল। অপর এক মহালের নাম খাসবস, তাহা রাজার নিজহস্তে ছিল। অন্যটী বাজেমহাল, দেবত্র ও জায়গীর ইহার অন্তর্গত।

জমিদারী পরগণাত্রয়ের কর আদায়ের ভার মুস্তফীর হস্তে ছিল, তিনি বাজে-

মহালেরও কর আদায় করিতেন। পরগণা পূর্ব্বভাগ, কোনও ইউরোপীয়কে পত্তনি দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে রাজার বিলক্ষণ লাভ হইত। কিন্তু এতদ্দ্বারা অনেক গুলি কর্ম্মচারীর ক্ষতি এবং প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার হইবার আশঙ্কায়, মুস্তফী পুনরায় তাহা নিজহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খৃঃ রাজার তিন শ্রেণীর সৈন্য ছিল। পুরাতনদলে ৮১ এবং নূতনদলে ৫৮ জন সৈন্য ছিল। একজন রেসেলদার ও একজন বরকন্দাজের অধীন ২০০ লোক ছিল। উল্লিখিত সময়ে নাজিরদেবের সৈন্যাধ্যক্ষ পদ ছিল না।

১৮৫৪ খ্রীঃ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এরাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। রাজকর্ম্মচারিগণ, সেরাজগঞ্জ হইতে ধান্যাদি আনিয়া এখানে খরিদ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। তদ্দ্বারা স্থানীয় লোকের বিশেষ আনুকূল্য হইয়াছিল। এরাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণ জন্য কোনও কৃত্রিম নদী ইত্যাদি খনন করার আবশ্যক করে না, কারণ অনাবৃষ্টি কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি প্রশমনের জন্য কোনও প্রকৃষ্ট উপায় এখানে সংস্থাপিত হইতে পারে না, কারণ এরাজ্যের সর্ব্বত্রই সমতল ভূমি। ১৮৬৩ খ্রীঃ পঙ্গপালও এরাজ্যের শস্যের বিশেষ হানি করিয়াছিল।

১৮৬০ খ্রীঃ মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজ্যভার তদীয় হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি বহুবিধ সৎকার্য্য করিবার প্রয়াস পান বটে, কিন্তু মন্ত্রিবর্গের দুরভিসন্ধিতে সফল মনোরথ হইতে পারেন না। তিনি ১৮৫৯ খ্রীঃ জেন্‌কিন্স স্কুল স্থাপন করেন। পূর্ব্বে ষ্টাম্প প্রচলিত ছিল না, তিনিই ষ্টাম্প সম্বন্ধীয় নিয়ম এদেশে প্রচার করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে ভূটিয়াদিগের দৌরাত্ম আরম্ভ হয়। তাহারা কয়েকজন লোককে ধরিয়া নেয়। মহারাজ পুণ্ডিবাড়ী নামক স্থানে কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দেন এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা প্রার্থনা করেন কিন্তু ইতিমধ্যে ভোটানরাজ হইতে বন্ধুতাদ্যোতকপত্র পাওয়াতে আর ইংরেজ সহায়তা আবশ্যক করে না।

রাজত্বের প্রারম্ভে মহারাজ উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন কিন্তু ক্রমেই কুক্রীড়াসক্ত হইয়া উঠিলেন, পূর্ব্বসঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি নাশ করিলেন। তাঁহার অপরিমিত পানদোষ ছিল, অবশেষে সেই দোষেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ ৬ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়; তাঁহার তিন সন্তান: জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রনারায়ণ কুমার, কনিষ্ঠ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, সর্ব্বজ্যেষ্ঠা রাজকুমারী শ্রীশ্রীমতি আনন্দময়ী আই দেবতী।

একাদশ অধ্যায়।

মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে, তদীয় উইল অনুসারে শ্রীশ্রীমতি মহারাণী কামেশ্বরী, বৃন্দেশ্বরী এবং নিস্তারিণী আই দেবতীর প্রতি রাজ্যের শাসন ভার সমর্পিত হয় এবং মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ গদিতে আরোহণ করেন। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের নামে টাকা মুদ্রিত হয় এবং মৃত রাজার সংকারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কয়েকদিন পর্য্যন্ত মহারাণীগণ নির্ব্বিবাদে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের মধ্যে মতান্তর এবং বাদ বিসম্বাদ হওয়াতে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে এ সংবাদ অবগত করান। গবর্ণর জেনেরল এবং তদীয় মন্ত্রিসভা এ সংবাদ অবগত হইয়া, কর্ণেল হটন সাহেবের প্রতি এ রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা তদন্তের ভার দেন। উইলের সত্যতা এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে, এই সকলই হটন সাহেবের তদন্তের প্রধান কার্য্য ছিল। কর্ণেল হটন ১৮৬৩ খ্রীঃ ১৫ই অক্টোবর এখানে আইসেন এবং সমুদয় বিষয় সম্যক্ তদন্ত করিয়া ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তদীয় রিপোর্ট প্রদান করেন। তাঁহার রিপোর্ট অনুসারে গবর্ণমেণ্ট মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করেন। হটন সাহেব উইল অবিশ্বাস করিয়াছিলেন সুতরাং রাণীদিগের হস্তে রাজ্যভার না রাখিয়া, মহারাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল পর্য্যন্ত, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং রাজ্য-শাসন-ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৬৪ খ্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী কর্ণেল হটন সাহেবকে মাসিক দুই সহস্র টাকা বেতনে এরাজ্যের কমিসনর নিযুক্ত করেন। তাঁহার বেতন রাজকোষ হইতেই দিতে হইত। তিনি ১১ই ফেব্রুয়ারী এখানে পৌছিয়া চার্জ্জ গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বের কমিসনরগণ সময়ে সময়ে গুদাম এবং দীনহাটাতে অবস্থিতি করিতেন। কর্ণেল হটনই প্রথমে নীলকুঠীতে স্বকীয় আবাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে কর্ণেল হটনের প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। "তিনি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কোনও মৌলিক পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খল করার জন্য চেষ্টা করিবেন। কোনও প্রকারের টেক্স ও অন্যান্য খরচ ন্যূন করিতে চেষ্টা করিবেন। রাজা ও তদীয় জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে স্বকীয় রাজ্যশাসনদক্ষ করিতে চেষ্টা করিবেন। স্কুলগুলি ভাল অবস্থায় রাখিবেন। পুলিসের অবস্থা ভাল করিবেন এবং অন্যান্য এই প্রকারের সৎকার্য্য করিতে প্রয়াস পাইবেন।"

কর্ণেল হটন এখানে আসিয়াই রাজসভা উঠাইয়া দেন এবং রাজসভার কার্য্য কমিসনরের আফিসের দেওয়ানীবিভাগ ভুক্ত করেন। এ রাজ্য হইতে যে

কর দেওয়া হয়, তাহা পূর্ব্বে রঙ্গপুরের কালেক্টরীতে দেওয়া হইত, পরে গোয়ালপাড়া দিতে হইত কিন্তু ১৮৬৪খ্রীঃ কোচবিহারে গবর্ণমেণ্টের একটী শাখা-ট্রেজারী হওয়াতে ঐ কর কোচবিহার ট্রেজারীতে দাখিল করার নিয়ম হয়। কর্ণেল হটন এখানে আসিয়াই ভূমি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব ও উদ্যোগ করেন এবং পরিশেষে তাহা কার্য্যেও পরিণত হয়, এই বিষয়ের সম্যক বিবরণ আমরা সাধারণ বিবরণ প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

হটন সাহেবের এখানে আগমনের পূর্ব্বে এ স্থানের সৈন্য সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু সৈন্যগণ নিতান্ত অশিষ্ট ছিল এবং অসজ্জিত থাকিত। ভোটান যুদ্ধে এ সকল সৈন্য দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে পারিবে এই বিবেচনায়, এ বৎসর কাপ্তান হেদাতালীকে মাসিক ৫০০৲ শত টাকা বেতনে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তিনি সৈন্যদিগকে এরূপ সুশিক্ষা প্রদান করেন যে, উক্ত যুদ্ধে এই সকল সৈন্য দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভোটান যুদ্ধে এ রাজ্য হইতে যে সকল সৈন্য গিয়াছিল তাহাদের পাথেয় রাজকোষ হইতে দিতে হইয়াছিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ১৮৬৫ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে ইহা নির্দ্ধারিত হয়।

এই বৎসরই প্রথম থানার ডাকের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে এরাজ্যে দাস বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব সময়ে তিনি এই প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, পরিশেষে হটন সাহেব ১৮৬৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন এবং দাস ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন এরাজ্যে প্রচারিত করিয়াছেন। এরূপ কার্য্য দ্বারা হটন সাহেব যে এ দেশীয় লোকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১৮৬৫ খ্রীঃ নাজিরদেব প্রতাপনারায়ণ পরলোক গমন করিলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ নাজিরদেবের পদে অভিষিক্ত হন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কর্ণেল হটন ভোটান যুদ্ধে বিশেষ লিপ্ত থাকায়, এখানকার শাসন ভার মেঃ বিভারিজ ডেপুটী কমিসনরের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি কমিসনরগণের অনুমতি মতে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনিই ১৮৬৪-৬৫ সনের বার্ষিক শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্ট দাখিল করেন। ইঁহার শাসন সময়ে ১৮৫৯ সনের ১০ আইন অংশতঃ এদেশে প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের সহিত সংশ্রব

রাখিয়া বিচার করা যাইতে পারে সেই বিষয়ে ফৌজদারী কর্ম্মকারকগণকে আদেশ করা হয়। পুলিস সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। পূর্ব্বে দারোগাগণ ৭।৮ টাকা (নারাণী) বেতন পাইত, কাজেই তাহাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন না করিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইত। এখনে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল এবং কোনও প্রকারের উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিবেন না এরূপ নিয়ম করা হইল। এই সময়ে কর্ণেল ক্রস প্রতিনিধি কমিসনর ছিলেন। ভূমির রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ানের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এই সময়েই শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ জন্য একটী সভা স্থাপিত হয়। স্থানীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ সভার মেম্বর নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে হটন সাহেবের যত্নে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও সময়ে সময়ে আহ্বান করা হইত এবং তাহাতে রাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব করা হইত।

এই সময়ে সৈন্যসংখ্যা ন্যূন করা হয়। আবশ্যক মতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদ্বারা সহায়তা করিবেন, কাজেই এরাজ্যে সৈন্য রাখার কিছুই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। বিশেষতঃ এই বৎসরেই ভোটানরাজের সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হওয়াতে কোচবিহার ভাবী-বিপদাশঙ্কা হইতে একবারে মুক্ত হয় সুতরাং সৈন্যসংখ্যা ন্যূন করিয়া মাত্র ৮০ জন রাখা হয়। এত অল্প সৈন্যদ্বারা রাজ সম্মান রক্ষা পায় না লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর টেম্পল সাহেব এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু এ পর্য্যন্ত সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। সৈন্যসংখ্যা ন্যূন হওয়াতে কাপ্তান হেদাতালীর আবশ্যকতা থাকে না। তাঁহাকে পুলিসের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের কাজ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া শারীরিক অসুস্থতা ব্যাপদেশে বিদায় লইয়া চলিয়া যান এবং মৌলবী আনোয়ার জেমান পুলিসের কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে কমিসনরের অভিমতানুসারে রাজার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের শিক্ষা-জন্য রাজব্যয়ে একটী ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়, তাহাতে অদ্যাপি রাজগণেরা অবস্থিতি করিয়া শিক্ষা পাইতেছে। তাহাদের সমুদয় ব্যয়ভার রাজাই বহন করেন। জেঙ্কিন্স স্কুলে অধ্যয়ন জন্য নাজিরদেবকে বিহারে আনা হয় এবং তাঁহার ঋণ পরিশোধার্থ শতকরা বার্ষিক চারি টাকা হারে সুদে ৩০০০০ টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়।

১৮৬৬ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে তুফানগঞ্জে একটী মহকুমা স্থাপিত হয়; সম্প্রতি সেখানে একটী থানা মাত্র আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিভারিজ সাহেবের পর স্মিথ সাহেব এস্থানের ডিপুটী কমিসনর হইয়া আইসেন। ইঁহার সময়ে বিচারাদি সম্বন্ধে ভূরি ভূরি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। দেওয়ানী আদালত, বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের জেলা কোর্টের ন্যায় করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। দেওয়ানী আপীল জজের কার্য্য, ডিপুটী কমিসনরের হস্তে ন্যস্ত হয়। ষ্টাম্প সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন নিয়ম প্রচারিত হয়। এথাকার পুলিস বিভাগ, বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় করার জন্য বিশেষ যত্ন করা হয়। বর্ত্তমান ছাপাখানার দালান এবং বিহার হইতে ধুবড়ি যাতায়াতের পথ এই সময়ে প্রস্তুত হয়।

রাজ বাটীতে অগ্নিকাণ্ড হইয়া সমুদয় কাঁচা ঘর পুড়িয়া যায়। অনাবৃষ্টি বশতঃ কথঞ্চিৎ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল বটে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে কোনও অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে নাই।

১৮৬৮ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী পাঙ্গার রাজকুমারের সহিত রাজকুমারী শ্রীশ্রীমতি আনন্দময়ী আই দেবতীর বিবাহ হয় এবং মহারাজ বেনারসের কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে নীত হন।

কাপ্তান হেদাতালী বিদায় অন্তে উপস্থিত হইলে পুলিসের প্রধান তত্বাবধায়কের কাজ প্রাপ্ত হন। তিনি এখানে অনেক দিন অবস্থিতি করেন নাই, এই সময়েই তিনি চলিয়া যান, তিনি পরে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের এডিকং হইয়াছিলেন। ভোটান যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শনই এইরূপ পদোন্নতির মূল কারণ।

ভূমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতে থাকে, এই সময়ে মেঃ বেকেট সাহেবের হস্তে উক্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৮৬৮ খ্রীঃ দেওয়ান নীলকমল সান্যালের মৃত্যু হয় এবং অন্য দেওয়ান মনোনীত হওয়া পর্য্যন্ত বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ দেওয়ানের পদে প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হন। পূর্ত্ত বিভাগের তত্বাবধারণ জন্য নেশ নামক জনৈক ইউরোপীয় নিযুক্ত হন। মেঃ স্মিথ বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, তৎপদে প্রথমে মেজর লেন্স এবং পরে বেকেট সাহেব ক্রমান্বয়ে প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনরের কাজ করিতে

থাকেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ দেওয়ান আনন্দচন্দ্র ঘোষ কোনও ফৌজদারী মোকদ্দমাতে আবদ্ধ থাকাতে প্রায় চারি মাস কাল রাজস্ব আদায়ের কার্য্য বন্ধ ছিল।

এ বৎসর বর্ত্তমান ফৌজদারী আহেলকার বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পরে সেপ্টেম্বর মাসে বর্ত্তমান দেওয়ান বাবু কালিকাদাস দত্ত মহোদয় স্থায়ী রূপে দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া চার্জ্জ গ্রহণ করেন। এ বৎসর স্থানে স্থানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ১৮৭০ খ্রীঃ আগস্ট মাসে রবিন্‌সন সাহেব শিক্ষা বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তিনি অক্টোবর মাসে চলিয়া গেলে পূর্ব্ববৎ স্থানীয় কমিটীর হস্তে শিক্ষা বিভাগের ভার অর্পিত হয়। এ বৎসর পোর্ট ব্লেয়ারের এক জন পলাতক আসামী এখানে ধৃত হইয়াছিল। ১৮৭১ খ্রীঃ নেশ সাহেব চলিয়া গেলে ভমজিলিকম সাহেব পূর্ত্ত বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন।

এ বৎসর সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড নেপিয়র সাহেব এরাজ্য পরিদর্শন করেন। নাজিরদেব রামনারায়ণের মৃত্যু হইলে ১৮৭০ খ্রীঃ ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী তাহার সম্পত্তি রাজ সরকার ভুক্ত করা হয়। পূর্ব্বে নগরস্থ বেশ্যা সকল স্থানে স্থানে বাস করিত, এমন কি ভদ্রলোকের বাটীর নিকটও তাহাদের আবাস বাটী ছিল; এ বৎসর নগরের পূর্ব্বভাগে এক স্থান মনোনীত করিয়া তথায় সমুদয় বেশ্যাদিগকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইটী একটী সু মহৎ কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১৮৭১ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় শিক্ষা বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন; তিনি এ বৎসরের অধিকাংশ সময় মহারাজার শিক্ষা কার্য্যে বাঁকিপুরে অবস্থান করেন। এই সময়ে মহারাজ বাঁকিপুরে থাকিয়া, পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে স্মিথ সাহেব পুনরায় ফিরিয়া আইসেন; বন্দোবস্তের কার্য্য শেষ হওয়াতে জোতদারগণকে নূতন পাট্টা দেওয়া হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত ইজারাদারী প্রণালী একবারে উঠিয়া যায়। রাজপরিবারের স্ত্রীলোকগণের ভরণ পোষণ জন্য পূর্ব্বে কতক জমি দেওয়া হইত। সেই সকল জমি সরকারে জব্দ করিয়া তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রদান করার নিয়ম হয়। এই বিষয়ে

১৮৬৬ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল বটে কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল না। খাস তহশীলের নিয়ম প্রচারিত হওয়াতে তহশীল কাছারি অধিক হওয়ার আবশ্যকতা জন্মে। অতিশয় দূরতর স্থানে মহকুমা থাকিলে প্রজালোকের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা বিধায়, মফঃসলে তিনটী মহকুমা স্থাপন করা হয়। মহকুমার কার্য্যকারকদিগকে দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং কালেক্টরীর ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই তিনটী মহকুমা যথা স্থানে প্রজালোকদিগের সুবিধামত সংস্থাপিত হওয়াতে তুফানগঞ্জ এবং লালবাজারে মহকুমা রাখার আবশ্যক করে না, কাজেই ঐ দুই মহকুমা উঠিয়া যায়।

এই সময়ে প্রশস্ত রাজপথ গুলির পার্শ্বে সারবান্ বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ১৮৭২ খ্রীঃ পুলিশের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। এবং ১৮৭৩ খ্রীঃ বর্ত্তমান সিবিল সার্জ্জন মেঃ ব্রিস্কো চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া আইসেন। এই সময়ে প্রত্যেক মহকুমাতে এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ মেয়র সাহেব চলিয়া গেলে বর্ত্তমান সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় পূর্ত্ত বিভাগের প্রধান কার্য্যকারক নিযুক্ত হন।

এ বৎসরের প্রধান ঘটনা দুর্ভিক্ষ। দীনহাটা বিভাগের দক্ষিণাংশ এবং লালবাজারের কতক অংশ এই দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইয়াছিল। স্থানীয় অনাবৃষ্টিই দুর্ভিক্ষের কারণ। নিকটবর্ত্তী ইংরেজাধিকৃত প্রদেশ সমূহে প্রথম দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে এ রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ যত্ন এবং অধ্যবসায়ে প্রজালোকের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে নাই। রাজকোষ হইতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল। সাগরদীঘী এবং লটকাবাড়ী নামক স্থানে সহায়তার কার্য্য আরম্ভ হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই উপলক্ষে উক্ত উভয় স্থানে কতকগুলি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। পর বৎসরের কয়েক মাস পর্য্যন্তও দুর্ভিক্ষকষ্ট বর্ত্তমান ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ দুর্ভিক্ষ সহায়তা কার্য্যে রাজকোষ হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

স্মিথ সাহেবের পর কাপ্তান লুইন সাহেব এ রাজ্যের ডিপুটী কমিসনর হন; তিনি প্রায় এক বৎসর কাল এখানে ছিলেন। তাঁহার সময়ে আবকারী

সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় ফলি মারী নামক যে জঙ্গলাবৃত স্থান আছে, তাহা জেলখানার কএদীদ্বারা অংশতঃ আবাদ করা হয় এবং তথায় প্রজালোক বসতি করিতে থাকে। এই সময়ে জ্বর, বসন্ত ও ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

কলিকাতার লর্ড বিশপ এ রাজ্যে আগমন করেন। তিনি এ রাজ্যের স্কুল ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়া, বিশেষ সন্তুষ্টি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর টেম্পল সাহেবও এ রাজ্য পরিদর্শন করেন; তদীয় আগমন উপলক্ষে, গোবরাছাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার, বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তফী টেম্পল নামে একটী বৃত্তি স্থাপন করেন। সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে ছাত্র সরকারী বৃত্তি পায় না, তাহাকে ঐ বৃত্তি প্রদান করা হয়। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এ রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহার অবিকল অনুবাদ অংশতঃ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

১৮৭৫ সনের ৬ই জুলাই তারিখের বঙ্গ দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের মন্তব্য, প্রথমতঃ এ রাজ্যের শাসন কার্য্যে সম্পূর্ণ একাগ্রতা লক্ষিত হয়। রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে, ব্রিটীশ কর্ম্মচারীর উপর রাজ কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা রাজ্যের মঙ্গল বর্দ্ধনার্থ অত্যন্ত যত্নশীল এবং উৎসাহী। কর্ণেল হটনের বিজ্ঞতা, কার্য্যদক্ষতা এবং দূরদর্শিতাই ইহার মূল কারণ। আমি সর্ব্বত্র কেবল যে, রাজা ও রাজ পরিজনবর্গের উন্নতি চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি এমত নহে, যে প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল, সেই প্রজাপুঞ্জের উন্নতি চেষ্টাও বিলক্ষণ দেখিতে পাইলাম। প্রজা বৃন্দ অধিকাংশ কৃষিজীবী বলিয়া, রাজস্বের বন্দোবস্ত ও ভূমির স্বত্ব নিরাকরণ সম্বন্ধে, তত্বাবধায়ক সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হইয়াছেন। তত্বাবধায়ক, দেশীয় কর্ম্মচারিগণ এবং প্রজাবর্গ, সকলেই আমার নিকট এই বন্দোবস্তের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। বন্দোবস্তদ্বারা আয় বৃদ্ধির ফল সন্তোষ জনক হইয়াছে। বাৎসরিক কর সংগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া, ১০ বৎসরের মধ্যে ৩৫০০০০ টাকা হইতে ৫২৫০০০ টাকা হইয়াছে এবং ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, সকলেই স্বীকার করেন। রাজকোষেও অধিক পরিমাণে অর্থাগম হইয়াছে। পূর্ব্বে ভিন্ন দেশীয় লোকদিগকে ভূমি ইজারা দেওয়া হইত, এক্ষণে সে নিয়ম রহিত হইয়াছে। ভরসা করি কখনও পুনঃ প্রচলিত হইবে না। কোন প্রকার আবোয়াব এবং রাহাদারী মাশুল গৃহীত হয় না। সকল প্রকার কৃষি কার্য্যেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে, অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভূমি কর্ষিত

দৃষ্ট হয়। এখানে আর টাকা মুদ্রিত হয় না। কোম্পানির টাকা প্রচলিত আছে। কেবল নৃপতিগণের অভিষেক সময়ে, তাঁহাদের গৌরবার্থে অল্প পরিমাণ মুদ্রা মুদ্রিত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে, এখানেও দ্রব্যের উপর কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে দেখিয়া, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কর সংস্থাপন দ্বারা সুরাপান নিবারণ স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের ব্যবহার সঙ্গত বটে।

মুদ্রিত কাগজের কার্য্য ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। কিন্তু রাজার নামে বিলাত হইতে কাগজ মুদ্রিত করাইয়া আনা হয়। শকটের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া, পথ ও সেতুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে স্পষ্ট অনুভূত হয়। শিক্ষা বিভাগ সংস্থাপিত হওয়ায়, এ দেশের অনেক উপকার হইতেছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ হইয়াছে। পুলিসের সংখ্যা অধিক নহে, ১৯৫ জন মাত্র। আমি যে সকল পুলিসের লোক দেখিয়াছি, তাহারা সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত।

পূর্ব্বে আমি অনেক স্থলে প্রধান প্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণের প্রশংসা করিয়াছি, বাস্তবিক কতকগুলি উত্তম ও সুশিক্ষিত দেশীয় কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইয়া, রাজকার্য্যে নিয়োজিত হওয়ায়, রাজ্যের এক প্রধান গৌরবের কারণ হইয়াছে। রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, রাজকার্য্যে প্রবৃত্তিকালে এরূপ সুদক্ষ কর্ম্মচারিবৃন্দ পাইয়া, উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

সিপাহীর সংখ্যা অতি অল্প, এক শতের অধিক নহে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দত্ত দুইটী যুদ্ধের কামান আছে। ভোটযুদ্ধ সময়ে কোচবিহারের রাজার সহস্র সৈন্য ছিল; যুদ্ধান্তে তাহাদিগকে অবসৃত করা হয়; ইহাদের মধ্যে কয়েক জন যুদ্ধ কার্য্যে পারদর্শিতা জন্য রৌপ্য পদক পাইয়াছে, আমি স্বহস্তে তাহাদিগেকে ঐ সকল পদক দিয়াছি। যদিও এ রাজ্যে সৈন্য সংস্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি ভোটানের নিকটস্থ বলিয়া, রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য সৈন্য সংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ২০।৩০ জন অশ্বারোহীও নিযুক্ত হইতে পারে। এক্ষণে অশ্বারোহী প্রায় নাই বলিলেই হয়, আমার পরিদর্শন কালে অতি অল্প সংখ্যা এমন কি ৫।৬ জন মাত্র ছিল।

সংক্ষেপে কোচবিহার রাজ্য শাসন উত্তম রূপে চলিতেছে, এবং ভবিষ্যতে এরূপ ভাবেই চলিবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায়। আমি ভরসা করি বর্ত্তমান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তান লুইন সাহেব, এই রাজ্যের প্রাচীন আচার ব্যবহার এরূপ সংরক্ষণ করিবেন যে, রাজা রাজ্যভার গ্রহণকালে আপন রাজ্য, অন্য রাজ্যের আদর্শ স্বরূপ দেখিতে পান।

১৮৭৫।৭৬ সনের অধিকাংশ সময় কাপ্তান লুইন এখানে ছিলেন, পরে মেঃ ডেলটন ডিপুটী কমিসনর হইয়া আইসেন এবং ঐ সনের রিপোর্ট দাখিল করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মেঃ ডেলটনের সময়েই এ রাজ্যে গ্রাম্য চৌকিদার সৃষ্টির প্রস্তাবনা আরম্ভ হয় এবং পরিশেষে তাহা কার্য্যেও পরিণত হয়। এখন প্রত্যেক গ্রামেই দুইজন একজন, স্থান বিশেষে তিনজন চৌকিদার আছে। গ্রাম্য লোকেরাই তাহাদের বেতন প্রদান করিয়া থাকে। চৌকিদারগণ প্রতি সপ্তাহে থানায় হাজির হইয়া, গ্রামের সমুদয় সংবাদ প্রদান করে। গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত প্রদেশ সমূহের মত পঞ্চাইত প্রণালী প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাব হইতেছে, বোধ হয় শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। মেঃ ডেলটন সাহেবের সময়ে, ডাক্তারখানা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাছারী, রাজার স্নানগৃহ, জেলখানার চতুর্দ্দিকস্থ ইষ্টকময় প্রাচীর প্রস্তুত হয়। সুনীতি সেতু নামক একটী উৎকৃষ্ট লৌহসেতু রাজধানী হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে তোর্ষা নদীর উপর প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৭৭ খ্রীঃ প্রথমে অতি বৃষ্টি এবং শেষে নিয়মিত বৃষ্টি না হওয়াতে শস্যের পক্ষে বিলক্ষণ হানি হইয়াছিল; এমন কি, গড়ে দশ আনা শস্যও হইয়াছিল না; সেপ্টেম্বর মাসে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে তামাকেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

এই সময়ে শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটে। সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য যে সকল টাকা ব্যয় হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে বৃদ্ধি পাইতে পারিত; কিন্তু এখন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বিবেচনা করিলেন যে, ঐ বিষয়ে যত ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা হইতে আর অধিক বৃদ্ধি করা উচিত নহে। রাজা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, এত অধিক ব্যয় দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং তদ্ধেতু ব্যয় ন্যূন করিলে, সমুদয় সুশৃঙ্খলা বিলোপ পাইবার সম্ভাবনা সুতরাং এখন আর ব্যয় বৃদ্ধি করা যাইবে না।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ কলিকাতাতে আনীত হন। উক্ত সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লী নগরীতে যে প্রসিদ্ধ দরবার হয়, তাহাতে মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষ হইতে, তাঁহাকে ভারতেশ্বরীর নামযুক্ত পতাকা ও পদক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তদানিন্তনীয় গবর্ণর

জেনেরল লর্ড লিটন বাহাদুর, মহারাজকে এক মূল্যবান্ তরবারি প্রদান করেন।[1]

১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে, খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সুনীতি বালার সহিত মহারাজের বিবাহ হয়। ১৫ই মার্চ্চ তারিখে, মহারাজ ইংলণ্ডে চলিয়া যান। অনধিক এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করিয়া, ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। শেষোক্ত স্থানে তিনি রাজ বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে, তিনি মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের সঙ্গে, বিশেষ বন্ধু ভাব হইয়াছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ, তিনি স্বরাজ্যে পুনরাগমন করেন। অতঃপর কলিকাতাতে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই উত্তর বঙ্গ রাজকীয় রেল পথে লোক গমনাগমনের কার্য্য আরম্ভ হয়। বিহারের লোক সকল এ রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তস্থিত হলদিবাড়ী ষ্টেশন হইয়া যাতায়াত করিতে থাকে। হলদিবাড়ী হইতে বিহার পর্য্যন্ত ৪৩ মাইল দীর্ঘ একটী রাজ পথ, এই সময়েই সম্পূর্ণ রূপ প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি বিহার হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণে, মোগলহাট নামক স্থানে, রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। রাজধানীর এবং রাজ্যের অধিকাংশ লোক উক্ত ষ্টেশন হইয়া যাতায়াত করে। এইটী উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের একটী শাখা মাত্র। এই রেলওয়ে রাজ ব্যয়ে রাজধানী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করার প্রস্তাব হইয়াছে, শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে।

১৮৭৮ খ্রীঃ জুন মাসে বিলক্ষণ অতিবৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং জুলাই মাসে বন্যা হইয়া, প্রায় সমুদায় কোচবিহার প্লাবিত করিয়াছিল: এমন কি রাজধানীর উপর ৩ ফুট জল উঠিয়াছিল। দেওয়ান মহোদয়ের মতে বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে এরূপ বন্যা কখন হয় নাই। বৃদ্ধ লোকেরা বলে তাহাদের জীবনে আর এক বার মাত্র এরূপ বন্যা দেখিয়াছে। কিন্তু কোন্ সময়ে দেখিয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারে না। এই বন্যাতে রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। শস্যাদি একে বারে নষ্ট হইয়া যায়। বিগত বৎসর শস্যের অল্পতা এবং বর্ত্তমান সনের সম্পূর্ণ হানিতে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সুদৃষ্টি থাকাতে, লোক সমূহের অধিক ক্ষতি হইতে পারে নাই। বন্যার প্রভাবে কাষ্ঠ সেতু সকল অধিকাংশ বিনষ্ট হয়; পর বৎসর সে সকল পুনরায় প্রস্তুত

হইয়াছে। এই বৎসর স্থানীয় অবস্থা তদন্তের জন্য মাল কাছারীর অধীনে ৬ জন কানুনগু নিযুক্ত হন।

এই বৎসরই আমেরিকীয় এবং স্পেন দেশীয় প্রণালী অনুসারে তামাক প্রস্তুতির কার্য্য আরম্ভ হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার অধীনে কাউয়ারডারা এবং অন্যান্য স্থানে তামাকের আবাদ হইত এবং কাউয়ারডাড়ার কারখানাতে প্রস্তুতি কার্য্য নির্ব্বাহ হইত; প্রথমে এক জন আমেরিকীয় প্রণালীর কার্য্যকারক এবং পরে এক জন স্পেনীয় প্রণালীর কার্য্যকারক নিযুক্ত হন। এ বৎসর এই কার্য্যে দশ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু উৎপন্ন তামাকের মূল্য ৫ কি ৬ সহস্র টাকার অধিক হয় নাই। এই রূপ তামাক প্রস্তুতির কার্য্য পর বৎসরও কথঞ্চিৎ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্যয় বাহুল্য বিধায় ঐ কার্য্য স্থগিত আছে।

১৮৭৯ খ্রীঃ রেজেষ্টরী সম্বন্ধীয় ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সনের তিন আইন এ প্রদেশে প্রচলিত হয়। দেশীয় মদ্য প্রস্তুত প্রণালীও প্রবর্ত্তিত হয়। এ বৎসর তমাদি আইন সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হওয়াতে, মোকদ্দমার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। এবং ষ্টাম্প বিক্রী দ্বারাও রাজকীয় লাভ যথেষ্ট হইয়াছিল।

১৮৮০ খ্রীঃ হইতেই লোক সংখ্যা নির্ণয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে ১৮৮১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে লোক সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে। এই কার্য্যে অনেক স্থানের প্রজাগণ অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রতিবাদ করিতে থাকে এবং কার্য্য-কারকদিগের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মায়। কিন্তু সময় কালে সমুচিত শাসনে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই, কার্য্য সুন্দর রূপ নির্ব্বাহিত হইয়াছে। এই কার্য্যে প্রায় ছয় মাস কাল রাজকীয় অধিকাংশ কার্য্যকারক এত দূর ব্যাপৃত ছিলেন যে, কেহই স্বকীয় কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোভিনিবেশ করিতে পারেন নাই, কাজেই প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যেরই আংশিক ক্ষতি হইয়াছিল। এই কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার শ্রীযুক্ত দেওয়ান মহোদয়ের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই কার্য্য সম্বন্ধে তিনি অপরিসীম পরিশ্রম এবং দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই বৎসরই গবোৎপাদক কার্য্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়, পশ্চিম দেশ হইতে কয়েকটী ষাঁড় আনা হয়। এই বিষয়ের সম্যক বিবরণ আমরা ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

এই সময়ে রঙ্গপুরের পুলিশ সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেঃ হেরিশ, এ রাজ্যের পুলিশের কার্য্য তদন্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তিনি এ রাজ্যের যাবতীয় পুলিশ ষ্টেসন পরিদর্শন করিয়া, সন্তুষ্টি লাভ করেন এবং গবর্ণমেণ্টে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রদান করেন। পুলিশের উন্নতি পক্ষে সামান্য

সামান্য পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, এ রূপ তদীয় মন্তব্যে প্রকাশ পায়। তাঁহার মন্তব্য অনুযায়ী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

রাজকীয় সাহায্য শতকরা দশ টাকা ন্যূন হওয়াতে, এ বৎসর অনেকগুলি স্কুল ও পাঠশালা উঠিয়া যায়। ১৮৮০ সনের আগষ্ট মাসে, শিক্ষা বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়, পরলোক গমন করাতে, বর্ত্তমান প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দাস, ডিসেম্বর মাসে তৎপদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

১৮৮১ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে, মেঃ ডেল্টন মহোদয় বিদায় লইয়া চলিয়া যান এবং তৎপদে কাপ্তান গর্ডন প্রতিনিধি নিযুক্ত হন, এবং ১৮৮০।৮১ সনের বার্ষিক শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রদান করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর এশলি ইডেন সাহেব, তদীয় বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে এ রাজ্যে উপস্থিত হন। তিনি আট দিবস কাল এ রাজ্যে অবস্থিতি করেন। এ রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত জঙ্গলময় প্রদেশে শিকার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শিকার স্থানেই সমুদয় সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। যে দিবস এখানে আগমন করেন, সেই দিবস আফিসাদির প্রতি এক বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার আগমনে বিলক্ষণ সমারোহ হইয়াছিল। সমুদয় নগরী আলোকিত করা হইয়াছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ ১১ই এপ্রিল তারিখে রাজকুমার জন্মগ্রহণ করেন; তদুপলক্ষে কলিকাতা এবং রাজধানীতে কয়েক দিবস বিলক্ষণ আমোদ হইয়াছিল।

১৮৮২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে, বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর রিভার্স টমসন সাহেব, এ রাজ্যে আগমন করেন। এ রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা পরিদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মাত্র ২৪ ঘণ্টাকাল এখানে অবস্থিতি করেন এবং আফিসাদি পরিদর্শন করেন।

১৮৮২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে, প্রতিনিধি ডিপুটী কমিসনর কাপ্তান গর্ডন চলিয়া যান এবং পুনরায় মেঃ ডেল্টন আগমন করেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

এ বৎসর এ দেশীয় প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তামাক এবং কোষ্টা অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হওয়াতে, প্রজা সমূহের আয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হয়, তদ্ধেতু রাজস্বও নিয়মিত মতে আদায় হয় না; এমন কি বিগত বৎসর হইতে প্রায় ২১০০০ টাকা ন্যূন আদায় হয়।

এই সময়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ভার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত হয়। অনেকগুলি মহাল ত্যাগ করিয়া, মাত্র ৪।৫ টী রাখা হয় এবং তজ্জন্য এক জন জেনেরল মেনেজার নিযুক্ত করা হয়। মহালের খাজানাদি আদায় সম্বন্ধেও বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হয়।

এই সময়ে কৃষি ও বন বিভাগ নামে একটী নূতন বিভাগ সংস্থাপিত হয়। ইংলণ্ডের সাইরান সিষ্টার কলেজের কৃষি-বিদ্যা পরীক্ষোত্তীর্ণ কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ এই বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যে নিযুক্ত হন। গবোৎপাদক কার্য্যালয়ের কার্য্যও এই বিভাগ সন্নিবিষ্ট হয়। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান মহোদয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন।

এ বৎসর স্থানীয় পুলিশের অবস্থা তদন্ত জন্য, গবর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেঃ মনরো এ রাজ্যে আগমন করেন। তিনি পুলিশ বিভাগ সম্যক্ তদন্ত করিয়া, হিসাবাদি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ প্রদর্শন করেন বটে কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েরই প্রশংসা করিয়াছেন।

এ বৎসর কোচবিহারের সর্ব্বত্রই ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সদর ও দীনহাটা বিভাগেই অধিক দিন স্থায়ী ছিল।

বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী ইনিস্পেক্টর বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক, এ রাজ্যস্থ সাহায্যকৃত স্কুলগুলির অবস্থা তদন্ত করার জন্য, গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে, এ স্থানে আগমন করেন। বর্ত্তমান সময়ে, কি নিয়মে সাহায্য দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে কি নিয়মে সাহায্য প্রদান করিলে এতদপেক্ষা ভাল হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় তদন্ত করার ভার তাঁহার প্রতি ছিল। তিনি প্রায় দুই মাস কাল এ স্থানে অবস্থান করিয়া, অনেকগুলি স্কুল পরিদর্শন করেন এবং গবর্ণমেণ্টে এক বিস্তৃত রিপোর্ট প্রদান করেন। মহারাজ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করাতে, গবর্ণমেণ্ট সেই রিপোর্টে কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, তাহা মহারাজ এবং তদীয় মন্ত্রি সভায় প্রেরণ করেন। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বহুবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

১৮৮৩ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে কোচবিহারে রাজকুমারের অন্নারম্ভ হয়, এবং তিনি রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ নামে অভিহিত হন।

কৃষ্ণনগর মেলেরিয়া প্রধান স্থান এবং অস্বাস্থ্য কর বোধে বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকগণ আপত্তি উত্থাপন করে, কাজেই রাজগণ বোর্ডিং স্কুল কৃষ্ণনগর হইতে বাঁকিপুরে নীত হয়।

১৮৮৩ খ্রীঃ জুলাই মাস হইতে থানার ডাক উঠিয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের ডাকে রাজকীয় পত্রাদি প্রচলন জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। রাজকীয় কর্ম্মকারকগণ সার্ব্বিস ষ্টাম্প ব্যবহারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিংশ অধ্যায়।

উপসংহার।

১৮৮৩ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর তারিখে, মহারাজের রাজ্যভার গ্রহণ করার প্রকৃত সময় ছিল কিন্তু নানাবিধ অসুবিধা বশতঃ তিনি ৮ই নবেম্বর তারিখে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্যভার গ্রহণের অনতিপূর্ব্বে কমিসনর, ডিপুটী কমিসনর এবং দেওয়ান বাহাদুর একত্রে পরামর্শ করিয়া, ভবিষ্যৎ শাসন সম্বন্ধে এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। মহারাজ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, তাহা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সদনে পাঠান হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টও তাহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করাতে, ৯ই নবেম্বর মহারাজ ঘোষণা পত্রদ্বারা তাহা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান।

৮ই নবেম্বর তারিখে মহাসমারোহের সহিত মহারাজ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর রিভার্শ টমসন মহোদয়, তদীয় মন্ত্রিগণ সহ, এ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাজসাহী ও কোচবিহার বিভাগের কমিসনর এবং অন্যান্য কতিপয় ইংরেজ কর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩০।৪০ জন বেসরকারী ইয়ুরোপিয়ানও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দেশীয় মান্যগণ্য বহুবিধ ভদ্রলোকও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ, দীঘাপাতিয়ার রাজা, পাইকপাড়া নিবাসী কুমার ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ, নবাব আবদুল লতিফ্ খাঁ বাহাদুর এবং পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ইঁহারাই প্রধান।

দেশীয় এবং বিদেশীয় প্রায় ৫০ সহস্র লোক সহরে সমবেত হইয়াছিল। নাটকাভিনয়, যাত্রা, নাচ প্রভৃতি বিবিধ আমোদ বহু দিবস পর্য্যন্ত ছিল।

নীলকুঠীতে মহাসমারোহের সহিত সাহেবদিগের নাচ ও ভোজ হইয়াছিল। নবদ্বীপ এবং বিক্রমপুরের কয়েক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবদিগকে যথোচিত দান করা হইয়াছিল। ৮ই নবেম্বর রাত্রে বহুবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আতস বাজী হইয়াছিল।

৮ই নবেম্বর বেলা ১১ ঘটিকার সময় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রকাশ্য দরবারে মহারাজকে রাজ্যভার প্রদান করেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলেন: "মহারাজ? আমি অদ্য এস্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার রাজ্য আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আপনার অপ্রাপ্ত বয়স্কতা নিবন্ধন, এ রাজ্য প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে ছিল। ইহা আমার অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, আপনাকে অনেক দিন হইতে জানি এবং আমরা উপযুক্ত পাত্রে ক্ষমতা অর্পণ করিতেছি। উত্তরাধিকারী স্বত্বেই যে আপনি এ রাজ্যে স্বত্ববান্ কেবল এমত নহে, আপনার শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতা গুণেও আপনি রাজ্য শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বত্ববান্। আমার ইহাও সুখের বিষয় যে, গবর্ণমেণ্ট যে অভিপ্রায়ে এ রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপ সুসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে রাজ্যের সম্যক উন্নতি হইয়াছে। আমার এমত সময় নাই যে, প্রত্যেক বিভাগে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা বিশদ রূপে বর্ণন করি; কিন্তু সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সমুদয় বিভাগের কার্য্যই গবর্ণমেণ্ট আদর্শে সুশৃঙ্খল করা হইয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে যখন গবর্ণমেণ্ট এ রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন এ রাজ্যে ২টী স্কুল এবং ১৫০ জন মাত্র ছাত্র অধ্যয়ন করিত, সম্প্রতি ৩৩০টী স্কুল এবং প্রায় ১০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, তন্মধ্যে ২৪টী বালিকা স্কুলে ন্যূনাধিক তিনশত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে।

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে, পূর্ত্ত বিভাগের বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, রাজপথ সকল কাষ্ঠময় সেতু সহ, বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি কৃষি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ডাক ও টেলিগ্রাফ পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। এতদ্দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সুসভ্যতার প্রারম্ভ সূচক সকল কার্য্যই আরম্ভ হইয়াছে। যদিচ এই সকল বিভাগে লাভের সম্ভাবনা নাই, তথাচ আমি ভরসা করি এ সকল বিভাগ আপনি রীতিমত স্থায়ী রাখিবেন। যিনি শিক্ষা এবং পূর্ত্ত বিভাগাদি উঠাইয়া দিয়া, ব্যয় সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন, তিনি আমার মতে উত্তম শাসন কর্ত্তা নহেন; কারণ লোকের অজ্ঞানতা বৃদ্ধি এবং স্বাধীনতার

ন্যূন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরিদ্রতা ঘটিয়া উঠে; তদ্ধেতু রাজার আয়েরও অনেক লাঘব হয়। আপনার বহুদর্শী দেওয়ান সমুদয় রাজ্য সুন্দররূপ জরিপ করিয়া, রাজস্ব সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি সংসাধন করিয়াছেন। আমি ভরসা করি, ভবিষ্যতে বন্দোবস্ত করিতে সহজহারে, অধিক দিনের জন্য, বন্দোবস্ত করিবেন; যেন কৃষকেরা সেই সময় মধ্যে, কথঞ্চিত উন্নতি সাধন করিতে পারে।

আপনি রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যেরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন, প্রকাশ করিয়াছেন; তাহা হইতে আর উত্তম নীতি কি হইতে পারে? রাজ সভা সংস্থাপন সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। আপনার অনুপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে। আপনি অনেক দিন ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়াছেন। নানা স্থানে বহু বিধ ভদ্র ইংরেজের সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। আপনি যে কেবল ইংরেজী ভাষাতেই অধিকার লাভ করিয়াছেন এমত নহে; আমাদের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার অনেক শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আমাদের কোন দোষকর ব্যবহার অনুকরণ করেন নাই।

আপনার এই রাজ্যভার গ্রহণে আমি নিতান্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনি স্বকীয় দুরভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই এ রূপ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন এমত নহে, অদ্য জগৎপাতা পরমেশ্বর প্রায় ৬ লক্ষ লোকের প্রতিনিধিত্ব আপনার হস্তে সমর্পণ করিলেন, সুতরাং সেই গুরুতর ভার আপনার এরূপ সতর্কতা এবং বিশ্বাসের সহিত বহন করা উচিত, যেন অন্তিম কালে আপনার কার্য্যভার স্মরণ করিয়া, আপনি আনন্দ অনুভব করিতে পারেন।"

পরিশেষে মহারাজ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন:

"আমি এবং আমার রাজ্য যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে সমধিক উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি প্রকাশ্য সভাতে, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যাঁহার প্রতিনিধিগণ হইতে আমি ও আমার রাজ্য নানাপ্রকারে উপকৃত হইয়াছি, সেই শ্রীশ্রীমতি মহারাণী সম্রাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্টে, আমার অসন্দিগ্ধ ভক্তি কখনও বিচলিত হইবে না।

এ রাজ্য সুচারু রূপ শাসন সম্বন্ধে, আমি কমিসনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন, ডিপুটী কমিসনর মেঃ ডেল্টন এবং দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্তকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাকে আমার পৈত্রিক গদিতে বসাইবার জন্য, মহামতি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে বঙ্গদেশের এক প্রান্তভাগে আসিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ

কৃতজ্ঞ ও আপ্যায়িত হইলাম। যে ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা আমি ন্যায় মতে সম্পন্ন করিতে যত্নের ত্রুটী করিব না।"

৯ই নবেম্বর তারিখে মহারাজ স্বয়ং এক দরবার করেন। সেই দরবারে দেওয়ান মহোদয় অন্যান্য রাজ কর্মচারী, জমিদার এবং ভদ্রলোকদিগকে, মহারাজের নিকট পরিচিত করিয়া দেন।

উপাধিধারী পণ্ডিত ভানুনাথ, রামশঙ্কর, মদনাথ এবং সীতানাথ ভট্টাচার্য মহারাজের নিকট পরিচিত হইলে, তাঁহাদের প্রত্যেকের মাসিক দশ টাকা হারে, জীবিত কালের নিমিত্ত, বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়।

সীতাই নিবাসী জোতদার খেরুনস্য পাটোয়ারী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণের উপকারার্থ, একটী ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে বলিয়া, তাহাকে খেলাত এবং চৌধুরী উপাধি প্রদান করা হয়। পরে সর্ব-সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত ঘোষণা পত্র প্রকাশ্য দরবারে পাঠ করা হয়।

৯ই নবেম্বর তারিখের ঘোষণা পত্র।

"মহারাজ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঘোষণা পত্রদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে, বর্ত্তমান রাজ্য শাসন প্রণালীর জন্য, মহারাজ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সমধিক ঋণী আছেন, কারণ এতদ্দ্বারা তাঁহার রাজ্যের এবং প্রজাবৃন্দের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে। এই শাসন প্রণালী উৎকৃষ্ট মনে করিয়া, মহারাজ ইহার সার মর্ম্মানুসারে, রাজ্য শাসন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তদীয় পূর্ব্ব পুরুষেরা রাজ্য শাসন বিষয়ে, যে সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতেন, অতঃপর আবশ্যক বিবেচনা করিলে, সেই সমস্ত ক্ষমতা তিনি স্বয়ং পরিচালন করিবেন। সম্প্রতি কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে, সুপরামর্শ গ্রহণ করিবার অভিলাষে, একটী রাজ সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাপ্তান এ ইভান্স গর্ডন, দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর এবং অতঃপর যিনি প্রধান দেওয়ানী বিচারক নিযুক্ত হইবেন,* এই তিন জন উক্ত সভার সভ্য মনোনীত হইলেন,

* শ্রীযুক্ত রায় বলরাম মল্লিক বাহাদুর এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট প্রদেশে সাবর্ডিনেট জজ ছিলেন।

মহারাজ স্বয়ং সভাপতি থাকিবেন। মহারাজের অনুপস্থিতিতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সহকারী সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

ফৌজদারী, পুলিশ, সেনা, জেল, পূর্ত্ত, শিক্ষা এবং অডিট বিভাগ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের শাসনাধীনে থাকিবে। তিনি এই সকল বিভাগের কার্য্য প্রণালীর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধারণ করিবেন। তিনি সেসন জজের কার্য্য করিবেন। সেসন জজের নিকট সাধারণতঃ যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল হইয়া থাকে, ঐ সমস্ত আপীল তাঁহার নিকট হইবে। তিনি রাজসভা ব্যতীত অন্যত্র দেওয়ানী বিচারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

রাজস্ব বিভাগের সম্পূর্ণ ভার দেওয়ানের হস্তে থাকিবে। তিনি সর্ব্ব প্রকার রাজকর আদায়ের জন্য দায়ী থাকিবেন। এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। রাজ সভার অন্যতর সভ্য প্রধান দেওয়ানী বিচারক, দেওয়ানী এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় কয়েক শ্রেণীর মোকদ্দমার আপীল শুনিবেন। এবং দেওয়ানী বিচার সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। চূড়ান্ত আপীল সমস্ত রাজ সভায় হইবে।

মহারাজের চাকলাজাত জমিদারীর কার্য্য, রাজ সভার কর্ত্ত্বাধীনে শ্রীযুক্ত রায় তারকনাথ মল্লিক বাহাদুর নির্ব্বাহ করিবেন। এই সকল জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে, তিনি রাজ সভার একজন সভ্য হইবেন। অন্যান্য সভ্যদিগের ন্যায় তাঁহারও মতামত দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

কয়েকটী কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মচারী তাঁহাদের বর্ত্তমান পদে এবং বেতনে স্থায়ী রহিলেন। মহারাজের পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, যে সকল আইন প্রচলন করিয়াছেন এবং যে সকল অঙ্গীকার পত্র এবং পেন্সন প্রদান করিয়াছেন, তাহা বলবৎ রহিল। বৃটিশ রাজ্যের প্রচলিত নিয়মানুসারে যেরূপ পেন্‌সন দেওয়া হইতেছে সেই রূপ দেওয়া হইবে।

রাজস্ব সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান প্রচলিত বন্দোবস্ত, ১২৯১ সাল হইতে ৫ বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে। কেবল যে সমস্ত পতিত ভূমি, বন্দোবস্তের সময় হইতে আবাদী হইয়াছে, তাহার পূর্ণ নিরিখে কর অবধারিত হইবে।

মহারাজ রাজধানীর সহিত বঙ্গ দেশীয় রেলওয়ে সমূহের যোগ করিবার অভিলাষী থাকায়, গীতলদহ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন।"

১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে নবেম্বর, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সমূহের ক্ষমতা বিষয়ে রাজ সভা হইতে নিম্নলিখিত ঘোষণা পত্র প্রচারিত হয়।

১। রাজ্যের শ্রীযুক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহোদয়, সেসন জজ অর্থাৎ দণ্ডরার বিচারপতি হইলেন ; তিনি সেসন জজের বিচার্য্য ফৌজদারী আপীল সমূহের বিচার করিবেন।

২। শ্রীযুক্ত ফৌজদারী আহেলকার বাবু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, তাহার আপীল শুনিবেন। যে সকল মোকদ্দমার বিচার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা করিবেন, তাহার আপীল সেসন জজের নিকট হইবে।

৩। শ্রীযুক্ত দেওয়ান রায় বাহাদুর মহোদয়, বিচার সম্বন্ধীয় কোনও ক্ষমতা পরিচালন করিবেন না। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মকারকগণ রাজস্ব বাকী সম্বন্ধে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন, তাহার আপীল দেওয়ানী আদালতে হইবে। কিন্তু নিম্ন আদালত রাজস্ব বাকী জন্য নিলাম ও নামজারী ইত্যাদি রাজস্ব সম্বন্ধীয় যে সকল মোকদ্দমার সরাসরী বিচার করিয়া থাকেন, তাহার বিরুদ্ধে আপীল শ্রীযুক্ত দেওয়ান বাহাদুরের নিকট হইবে। এই সকল মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী এরূপ হইবে যে, চূড়ান্ত আদেশ, প্রথমতঃ মহকুমার বিচারক প্রদান করিবেন, সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দেওয়ান মহোদয়ের নিকট হইবে ; আইনে বিধান থাকিলে তাঁহার বিচার্য্য মোকদ্দমার আপীল রাজ সভায় করিতে হইবে।

৪। দেওয়ানী প্রধান বিচারক কোচবিহারে সিভিল জজ নামে অভিহিত হইবেন।

৫। ১০০৲ শত টাকা পর্য্যন্ত দাবী বিশিষ্ট, রাজস্ব বাকী মোকদ্দমার আপীল, শ্রীযুক্ত সিভিল জজ মহোদয়ের নিকট হইবে।

৬। মাল কাছারীর নাএব আহেলকার বাবুকে কার্য্যতঃ সদর মহকুমার কার্য্যকারকরূপে গণ্য করিতে হইবে। তিনি সমস্ত আসল আরজী এবং দরখাস্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে অন্যান্য মহকুমার নাএব আহেলকারের ন্যায় চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। রাজ সভার দেওয়ানী বিভাগের সভ্য মহোদয়, দেওয়ানী ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় এক শত টাকার অধিক এবং অনধিক দাবীর ছোট আদালতের মোকদ্দমার, এবং ৫০৲ টাকার অধিক ও অনধিক দাবীর অন্যান্য প্রকারের মোকদ্দমার আপীল শুনিবেন। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী ও রাজস্ব বাকীর মূল মোকদ্দমা পাঁচ শত টাকার অধিক দাবীর হইলে তাঁহার নিকট রুজু হইবে। দেওয়ানী বিচার সম্বন্ধীয় কার্য্য কর্ম্মের এই স্থিরতর বন্দোবস্ত নহে। আবশ্যক

হইলে, ইহার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে। বৃটিশ শাসনাধীন প্রদেশ সমূহের সিভিল জজেরা সার্টিফিকেট ঘটিত এবং অন্যান্য এই প্রকারের যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, এ স্থানের সিভিল জজও তদ্রূপ করিবেন। নিম্নলিখিত আপীল সকল রাজ সভায় হইতে পারিবে।

ক। সেসন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল।

খ। দেওয়ানী আপীল, যাহাতে আইন এবং বৃত্তান্ত ঘটিত তর্ক আছে এবং যে মূল মোকদ্দমা সিভিল জজ নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

গ। অন্যান্য ও রাজস্ব বিষয়ক মোকদ্দমার খাস আপীল, যাহাতে কেবল আইন ঘটিত কোন তর্ক আছে।

প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যেক স্থলে রাজ সভাদ্বারা মঞ্জুর করাইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আপীল অনাবশুক।

অন্যান্য বিষয় যাহা উপরে বিধিবদ্ধ হয় নাই, সেই সকল বিষয়ে কার্য্যকারকগণ বর্ত্তমান সময়ে, যে যে ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন এবং যে যে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাই করিবেন।

কোচবিহারের ইতিহাস

সংযোজন

ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল

রাজ বংশাবলী

রাজা বিশু বা বিশ্বসিংহ
রাজা নরনারায়ণ
রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ
গোঁসাই মহীনারায়ণ (প্রথম নাজিরদেব)
রাজা বীরনারায়ণ
জগৎনারায়ণ কুমার
রাজা প্রাণনারায়ণ
রাজা রূপনারায়ণ
রাজা মোদনারায়ণ
রাজা বসুদেবনারায়ণ
বিশুনারায়ণ
মননারায়ণ
রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ
রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ
খড়্গনারায়ণ (দেওয়ানদেব)
রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ
রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ
রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ
রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ
রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ
বজ্রেন্দ্রনারায়ণ
রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ
রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ
রাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ
রাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ
ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ
হিতেন্দ্রে নারায়ণ
রাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ
ইন্দ্রজিৎনারায়ণ
রাজা বিরাজেন্দ্রনারায়ণ

	রাজার নাম	রাজ্যাভিষেকের সময়	রাজত্বকাল
১।	চন্দন	১৫১০ খ্রীঃ	১৩
২।	বিশ্বসিংহ (বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)	১৫২৩ "	৩১
৩।	নরনারায়ণ (পুত্র)	১৫৫৪ "	৩৪
৪।	লক্ষ্মীনারায়ণ (পুত্র)	১৫৮৮ "	৩৩
৫।	বীরনারায়ণ (পুত্র)	১৬২১ "	৫
৬।	প্রাণনারায়ণ (পুত্র)	১৬২৬ "	৩৯
৭।	মোদনারায়ণ (পুত্র)	১৬৬৫ "	১৫
৮।	বসুদেবনারায়ণ (ভ্রাতা)	১৬৮০ "	২
৯।	মহেন্দ্রনারায়ণ (ভ্রাতৃ পৌত্র)	১৬৮২ "	১২
১০।	রূপনারায়ণ (জ্ঞাতি ভ্রাতা)	১৬৯৪ "	২০
১১।	উপেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৭১৪ "	৪৯
১২।	দেবেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৭৬৩ "	২
১৩।	ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ (জ্ঞাতি ভ্রাতা)	১৭৬৫ "	৫
১৪।	রাজেন্দ্রনারায়ণ (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)	১৭৭০ "	২
১৫।	ধরেন্দ্রনারায়ণ (ভ্রাতুষ্পুত্র)	১৭৭২ "	২
১৬।	ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ (পিতা)	১৭৭৪ "	৯
১৭।	হরেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৭৮৩ "	৫৬
১৮।	শিবেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৮৩৯ "	৮
১৯।	নরেন্দ্রনারায়ণ (দত্তক পুত্র)	১৮৪৭ "	১৬
২০।	নৃপেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৮৬৩ "	৪৮
২১।	রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৯১১ "	২
২২।	জিতেন্দ্রনারায়ণ (ভ্রাতা)	১৯১৩ "	৯
২৩।	জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ (পুত্র)	১৯২২ "	৪৮
২৪।	বিরাজেন্দ্রনারায়ণ (ভ্রাতুষ্পুত্র)	১৯৭০ "	বর্তমান

কমিসনরগণের নাম	কোন্ সময় হইতে
কর্ণেল হটন	১৮৬৪ ফেব্রুয়ারী
কর্ণেল ক্রস ও এগন্যু (প্রতিনিধি)	১৮৬৫ জুলাই
কর্ণেল হটন	১৮৬৭ জানুয়ারী
রিচার্ডসন্ ও মেট্কাফ্	১৮৭৩ মার্চ্চ
হর্শেল	১৮৭৪
ককারেল*	১৮৭৫
লর্ড ইউলিক ব্রাউন	১৮৭৬ হইতে ১৮৮৩ নবেম্বর

ডিপুটী কমিসনর

মেঃ বিভারিজ	১৮৬৪ নবেম্বর
মেঃ স্মিথ	১৮৬৬ মে
মেজর লেন্স (প্রতিনিধি)	১৮৬৮
মেঃ বেকেট ঐ	১৮৭০ ডিসেম্বর
মেঃ স্মিথ	১৮৭২
কাপ্তান লুইন	১৮৭৫
মেঃ ডেন্টন	১৮৭৬
কাপ্তান গর্ডন (প্রতিনিধি)	১৮৮১ এপ্রিল
মেঃ ডেন্টন	১৮৮২ হইতে ১৮৮৩ নবেম্বর

* ইনিই রাজসাহী ও কোচবিহার বিভাগের প্রথম কমিসনর।

শতাধিক বর্ষের রাজ-ইতিহাস

নৃপেন্দ্রনারায়ণ

(১৮৬২-১৯১১)

১৮৬২ সনের ৪ঠা অক্টোবর শনিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় রাণী নিশিময়ীর গর্ভে নৃপেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়। পুত্রের জন্মের সংবাদ শুনিয়া রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্র-সঙ্গত বিধান অনুসারে অমাত্যবর্গ সহ রাজপুত্র দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের পাঁচ (কোথাও চার) রাণীর মধ্যে নিস্তারিণী আই দেবতী পাটরাণী ছিলেন। নিস্তারিণীর গর্ভে আনন্দময়ীর জন্ম হয়। বর্তমান নিশিগঞ্জের কালাচাঁদ কার্যী মহাশয়ের নিশিময়ী নামে সুলক্ষণা কন্যাকে দেখিয়া মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের যোগ্যপত্নী বিবেচনা করিয়া রাজার সহিত মহাসমারোহে বিবাহ দেওয়া হয়।

মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে দোলযাত্রা এবং দুর্গাপূজা ধুমধাম সহকারে হইত। দুর্গাপূজায় বলির সময় মহারাজা অনেক সময় বড় বড় মহিষ বলি দিতে নিজেই খড়্গ ধরিতেন। একবার একটি বাঘ আনিয়াও নিজে ছেদন করিয়াছিলেন। দোলের সময় পুকুর কাটিয়া তাহাতে আবির দিয়া জল লাল করিয়া অমাত্য বন্ধুবর্গকে লইয়া মহারাজা জলক্রীড়া করিতেন।

মহারাজা সংগীত ও চিত্র বিদ্যার চর্চায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তিগণও বিশেষ সমাদর পাইতেন।

নরেন্দ্রনায়ারণের পুত্র-কন্যা ও মহিষী

(১) নিস্তারিণীর গর্ভে কন্যা আনন্দময়ী,

(২) হরসুন্দরীর গর্ভে পুত্র যতীন্দ্রনারায়ণ,

(৩) নিশিময়ীর গর্ভে পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণ,

(৪) ব্রজেশ্বরী

জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

মাত্র ২২ বৎসর বয়সে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ দেহত্যাগ করিলে রাজধানীতে সিংহাসন লইয়া ঘোর বিরোধ আরম্ভ হয়। মহারাণী নিস্তারিণীর ভগ্নীপুত্র কুমার যতীন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য তৎপর হইলে রাজমাতা

কামেশ্বরী এবং বৃন্দেশ্বরীর আজ্ঞাক্রমে দেওয়ান বিশ্বস্ত কর্মচারীর মাধ্যমে সিংহাসন রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপূত পুষ্প দ্বারা আশীর্বাদ করিয়া নৃপেন্দ্রনারায়ণকে রাজ-তিলক প্রদান করিলেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণ যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র দশ মাস। দেশে কি হইতেছে পিতৃহীন নাবালক রাজা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শিশু রাজা সিংহাসনে বসিয়া সমস্ত পণ্ডিতবর্গ এবং অমাত্যবর্গের কানে আতর দিলেন। এই অনুষ্ঠান শেষে মৃত রাজার শবদাহের জন্য নিশান, ডঙ্কা, তুরী, ভেরী, অশ্ব, গজ সহ শবযাত্রা আরম্ভ হইল এবং যথাযথ মর্যাদায় তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হইল।

রাজা নরেন্দ্র-বিয়োগ ব্যথায় নবকান্ত মজুমদার লিখিত একটি কবিতা উল্লেখ্য—

নরেন্দ্র-বিয়োগে—১৮৩২

রাগিণী : বাগেশ্রী—তাল : আড়া।

এ শঙ্কটে ত্রাণ কর (শ্যামা) দুর্গতি হারিণী।
অকালে হরিয়ে নিলে নরেন্দ্র নৃপতি মণি॥
ভূপতি নয়ন তারা, কোন্ পাপে তায় হলেম হারা,
কেবা আছে রক্ষে তারা, তোমা বিনে কাল-বারিণী॥
লালিয়ে পালিয়ে ভূপে, বদ্ধ হলেম মায়া কূপে,
পড়িলাম অন্ধকূপে, মুক্ত কর মা ভবানী॥
রাজ্য পাট রাজমহিষী, কি আনন্দে দিবানিশি,
নবকান্তে কেঁদে বলে, রাখ মা চরণ তলে,
সদা হাসি পূর্ণ শশী, ঢাকিল শোক-যামিনী।
শিবাংশ তনয় বলে রক্ষ মা নৃপেন্দ্র মণি॥

নৃপেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ইংরাজ সরকার তাঁহার নিয়োগকে মানিয়া লইলেও প্রথমে মহারাণী কামেশ্বরী, বৃন্দেশ্বরী এবং নিস্তারিণী আই দেবতীগণের উপর রাজ্য শাসন ভার ন্যস্ত ছিল। পরে ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনারগণ শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সংগে কোচবিহারের স্বাধীন রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ বিষয়ে বিতর্ক, এক স্মরণীয় অধ্যায় হইয়া আছে। এই বিবাহ বিষয়ে ইংরাজ সরকারের বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাহাদের বিভিন্ন প্রতিনিধি এই বিষয়ে নানাভাবে যোগাযোগ করেন এবং প্রতিবাদের জট

খোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের পথ নির্দেশ দেন। বর এবং কনে উভয়ের বয়স কম ছিল, যাহা ছিল সরকারী আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু কেশবচন্দ্র সমস্ত কিছু উপেক্ষা করিয়া এই বিবাহে কেন মত দেন সে বিষয়ে বিতর্কের যে ঝড় ওঠে তাহার কয়েকটি তথ্য নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখিত "কুচবিহারের রাজকুমারের সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ বিষয়ক প্রতিবাদ" বইখানি হইতে পাওয়া যায়। এই ঘটনায় দেশব্যাপী তীব্র আলোচনার কিছু অংশ এখানে তুলিয়া ধরিতেছি—

"কেশব বাবুই সামান্য সাংসারিক সুখ, সম্মান ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত এরূপ মহাপাপকর বাল্য বিবাহ ও ব্রাহ্ম বিবাহের উচ্চতম আদর্শ বিস্মৃত হইতেছেন। প্রকৃত সত্যের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মস্তকে যে পদাঘাত করা হইতেছে, তাহা তিনি মনেও করিতেছেন না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন এই বিবাহ সম্পন্ন হইলে একটী রাজ পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে,—রাজকীয় সাহায্যে সমাজের আর্থিক অভাব বিদূরিত হইবে এবং কন্যা রাজমহিষী হইবেন, এই সকল লাভ প্রত্যাশায় কেশব বাবু এই-রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে কেশব বাবুর মানসিক দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পাইবে না।

ঢাকার অধিকাংশ ব্রাহ্ম কেশব বাবুর উল্লেখিত বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতিদান সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া এতদ্বিষয়ে অনভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।··· বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও···এরূপ প্রতিবাদ হইবে।

গত ২৯শে মাঘের সুলভ সমাচার ও ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় উক্ত বিবাহের সমর্থন দর্শনে পুনর্ব্বার ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলাম। উক্ত পত্রিকাদ্বয় কেশব বাবুর নিজের পত্রিকা; কারণ তাঁহার অধীনস্থ প্রচারক ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাই তত্তৎ পত্রিকার সম্পাদনা করিতেছেন; কেশব বাবু স্বয়ং রবিবারের মিরারের একজন লেখক।

কেশব বাবু বিবাহ বিধিতে যে বয়স নির্দ্ধারণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, অন্ততঃ নিজ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধেও কি তদ্বিরুদ্ধাচরণ উচিত হইতেছে?

১৩ বৎসরের বালিকা ও ১৫ বৎসরের বালক কতদূর সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন।

কেশব বাবু যেমন সত্য বলিদান করিয়াও এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে

আদেশ করিয়াছেন, তিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ করিয়া থাকেন এবং করিতে পারেন কিনা? এই রাজ-বিবাহে কুঁচবিহার রাজ-পরিবারের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত ও ব্রাহ্মসমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া যদি ঈশ্বর বাল্য বিবাহরূপ মহা পাপকর কায্য ও তদ্ধেতু ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আদেশ করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন। কারণ ঈশ্বর পক্ষপাত শূন্য।

…ব্রাহ্ম সমাজের মস্তক কেশব বাবুও সেই পরীক্ষাকালে দুর্ব্বল চিত্ত ব্রাহ্মগণের ন্যায় আচরণ করিবেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় নহে। আমরা শুনিয়া সবিশেষ চমৎকৃত ও কৌতুকাবিষ্ট হইলাম যে, ইতিমধ্যে কেশব বাবু তাঁহার ভাবী জামাতাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন।

যাঁহারা বহুকাল হইতে কেশব বাবুকে একজন বিলক্ষণ চতুর, যশঃপ্রিয় ও কৌশল-পটু বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সহজেই এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া আনন্দ সংকারে বলেন, কেশব বাবুর সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পূর্ব্বাপরের বিশ্বাস এক্ষণ সুন্দর রূপে প্রমাণিত হইল।

আমরা শুনিলাম যে, কেশবকন্যার বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌ হইতে নর্ত্তকীগণ কুঁচবিহার যাইতেছে এবং বিবাহোপলক্ষে সুরাপানেরও ক্রটি হইবে না। যে কেশব বাবু অল্পদিন হইল নৃত্য ও সুরাপানের বিরুদ্ধে মিরার পত্রিকায় ও বক্তৃতাদিতে চীৎকার করিয়াছেন, সেই কেশব বাবুর কন্যার বিবাহে নৃত্য ও সুরাপান হইবে, ইহা কি সামান্য আক্ষেপ ও ক্ষোভের বিষয়।

পাত্রটী বড় কম ব্যক্তি নন; কুঁচবিহারের স্বাধীন রাজা। কলিকাতার ডাক্তরেরা প্রায় একবারে বলিয়াছেন যে এদেশে কন্যাদিগকে ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে।

ব্রাহ্ম পিতা যদি পদের গৌরব ও ধনের গৌরব ধর্ম্মাপেক্ষা অধিকতর মনে করেন তাহা হইলে তাঁহার অব্রাহ্মোচিত কার্য্য করা হয়।" (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই কার্ত্তিক, ১৭৯৪)

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতিবাদ পত্র

ভক্তিভাজন শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজের মতের বিরোধী হইয়া কন্যার বিবাহ দিতেছেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ইহাতে কোন সজীব ব্রাহ্ম পোষকতা করিতে পারে?

আমি সম্পূর্ণ আপত্তি করিয়া কেশব বাবুকে পত্র লিখিলাম। আপনারা

তাঁহার অন্যায় কার্য্যে আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি, চিরকাল তাঁহারই চরণ ধরিয়া থাকিব। কোন মনুষ্যের অন্যায় মতে অনুমোদন করিব না। এজন্য যদি অনাহারে সপরিবারে শুকাইয়া মরি তাহাও সুখের বিষয় তথাপি সত্যের অবমাননা দেখিয়া নীরব থাকিতে পারিব না। আপনারা বিবিধ উপায়ে প্রতিবাদ করুন। আমাকে আপনাদের সঙ্গী বলিয়া গণ্য করিবেন।

সত্যস্বরূপ ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

নোয়াখালি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য তাঁর কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকট ঢাকাতে কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

আপনার পত্রখানা পাইয়া যার-পর-নাই দুঃখিত হইলাম। কেশব বাবু ১৫ বৎসর বয়স্ক বালকের সহিত নিজের বালিকা কন্যার বিবাহ দিতেছেন, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের মুখ ম্লান হইল। যিনি উদ্যোগ করিয়া বিবাহ-বিধি প্রচলিত করিলেন, তিনিই তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে চলিলেন; এমত অবস্থাতে ব্রাহ্মসমাজের গৌরব আর কি প্রকারে রক্ষা পায়। আপনারা প্রতিবাদ করিয়া ভাল করিয়াছেন। যদিও ইহার আশু ফল প্রত্যাশা করা যায় না, ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে লক্ষিত হইবে যে ব্রাহ্মসমাজ অন্ধভাবে এই কার্য্যের সমর্থন করে নাই। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ এক বাক্য হইয়া এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে ভাল হয়।

নোয়াখালি
২ ফাল্গুন, ১২৮৪

অনুগত
শ্রীভুবনমোহন সেন

কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ লইয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদের যে ঝড় ওঠে সে সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন এইখানে তুলিয়া ধরা হইল। শ্লেষ ও তির্যক বাক্যবাণে তাঁহাকে জর্জড়িত করিয়া ফেলা হয়। তাঁহার সততা, নিষ্ঠা বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখা হইতে এই বিবাহ লইয়া যে প্রতিবাদ আসে তাহার মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ,

দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং প্রভৃতি আছে। ইহা ছাড়াও এই বিবাহ লইয়া যে সমস্ত স্বনামধন্য ব্যক্তি জড়াইয়া পড়েন তাঁহাদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুনীতি দেবীর বিবাহপূর্ব, বিবাহ সময় এবং বিবাহ পরবর্তী নানা বিতর্ক আজ একটি ইতিহাস। কেশবচন্দ্র সেনের ইচ্ছা যে ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইবে কিন্তু কোচবিহারের রাজ-পরিবারের লোকজন এবং ব্রাহ্মসমাজ দাবী করিলেন হিন্দুমতে বিবাহ হইবে। এই বাক্‌বিতণ্ডায় বিবাহ দিতে অনেক সময় নষ্ট হয়। কোন্ মতে কিভাবে বিবাহ হয় সেই বিষয়ে এবং সুনীতি দেবীর চরিত্র বিষয়ে কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর 'আত্মকথা' পাঠে জানা যায়—

মহারাণী সুনীতি

"মহারাণী সুনীতি কেশবের বড় কন্যা। মহারাণী যখন আঁতুড়ে তখন ভয়ানক ঝড় হয়। মহারাণী ছেলেবেলা থেকে বেশ ভাল ছিলেন। পড়াশুনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিতেন না, সকলের সঙ্গে ভাব রাখিতেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর দয়ার ভাব বেশী ছিল। গরিব দেখিলেই দান করিতেন। ছেলেবেলা থেকেই বেশ ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন ছিল। কেশবের কুটীরের কথা যে তোমাকে বলিয়াছি, সেই কুটীরে কেশব যখন রাঁধিতে রাঁধিতে পাঠ করিতেন, সুনীতি সেই সময় তাঁর কাছে বসিয়া শুনিতেন। কেশবের খাওয়া হইয়া গেলে মহারাণী তাঁর পাতের প্রসাদ প্রায় খেতেন। মহারাজাও কেশবকে এত ভক্তি করিতেন যে একদিন কেশব খেয়ে উঠে গেলে তাঁহার পাতে খাইতে বসিলেন।

কুচবিহারে বিবাহ

যাদব চক্রবর্তী বিয়ের সম্বন্ধ আনেন। কেশব রাজাকে দেখিতে চাহিলেন, দেখিলেন ; কি কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমি ঠিক জানি না। আর একদিন যখন রাজা একলা এলেন, সেদিন রাজা, সুনীতি আর আমি ছিলাম। রাজা মহারাণীকে পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্ এবং গোলযোগ আরম্ভ হইল। বিবাহ ঠিক্ হইলে জুড়ুনি* এল। কলুটোলার বাড়ীতেই জুড়ুনি এল। কেশব এর আগে কলুটোলার বাড়ী

* বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে প্রেরিত বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি উপহার।—বঙ্গীয় শব্দকোষ।

হইতে যাইয়া নারিকেল ডাঙ্গায় বাড়ী করিয়াছিলেন। কেশব বলিয়াছিলেন, "জুড়ুনি আমার মার নিকট হইবে।" জুড়ুনি দেওয়ার কিছুদিন পর আমরা কুঁচবিহার যাত্রা করিলাম। আমি, ফুলেশ্বরী, কৃষ্ণবিহারী ও কৃষ্ণবিহারীর ছেলে কুমুদ, নবীনের দুই ছেলে, সেজ মেয়ের ছেলে নরেশ ও সুরেশ, ফুলেশ্বরীর ছেলে হেম, সুর্যি ও ব্রজ; নরেন্দ্র (রায় ৺নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর) তাঁর ছেলে সত্যেন্দ্র, আমরা এই কয়জন কলুটোলা হইতে গেলাম। মহারাণী ও কেশবের পরিবার আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা কুঁচবিহার পৌঁছিলে আমাদের থাকিবার জন্য দুইটী বাড়ী দেওয়া হইল, একটীতে মেয়েরা এবং অপরটীতে পুরুষেরা থাকিতেন। গায়ে হলুদ হইয়া গেল। তখন মহারাণীর বয়স তের বৎসর ছয় মাস। খুব ঘটা হইল। অধিবাসের দিন সকালে আমরা খেয়ে-দেয়ে বিয়ে বাড়ীতে গেলাম। বিয়ের জন্য একটী আলাদা বাড়ী ছিল। সেইদিন রাত্রে সেইখানে রহিলাম। তারপর দিন বিয়ে। মহারাজার নান্দীমুখের যোগাড় হইল, সারি সারি সিন্দুর মাখান মাছ সেখানে রাখা হইয়াছে দেখিলাম। মহারাণী বরাবর আমার সঙ্গে ছিলেন। নান্দীমুখ মহারাজা করিয়াছিলেন কিনা আমি জানি না। কিন্তু সুনীতি করে নাই, সে আমার আঁচল ধরিয়া সমস্ত ক্ষণ বসিয়াছিল, আমাকে স্নান করিতে পর্য্যন্ত দেয় নাই। সে ভয়েতে জড়সড় হইয়া বলিতে লাগিল, "ঠাকুরমা, তুমি আমার কাছে থাক, এরা নিশ্চয় আমাকে কি করিবে।" আমি রহিলাম। নান্দীমুখের কাছে তাঁহাকে লইয়া গেল। রাজার ঠাকুর-মা আসিলেন, আসিয়া পুরোহিতকে ডাকিলেন। তিনি পুরোহিতকে ডাকিতেই আমি বলিলাম, "পুরুত এখানে আসিয়া কি করিবে?" তিনি একটী মোহর দেখাইয়া বলিলেন, "এই মোহরটী আর ঐ জল, তুলসী ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ পুরোহিতের হাতে কনেকে দিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি সে সব রাণীর হাতে তুলিয়া দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত রাণীর হাত হইতে লইয়া ফেলিয়া দিলাম। আমি বলিলাম, "তোমাদের ওকি নিয়ম? এসব কুলক্ষণ করিতে নাই, ইহাতে তোমাদেরও অমঙ্গল আমাদেরও অমঙ্গল।" আমি এইসব বলাতে তিনি বুঝিলেন এবং বলিলেন, "আচ্ছা থাক," কিন্তু রাণীকে বলিলেন, "তুমি মোহরটী পুরোহিতকে দাও," আমি মোহর দিতে দিলাম না, বলিলাম "আপনিই দিন।" কিন্তু তিনি শুনিলেন না, নিজেই মোহরটী সুনীতির হাতে ছোঁয়াইয়া পুরোহিতকে দিলেন। তারপর আর কিছু হয় নাই, আমি বাড়ী গেলাম। খেয়েদেয়ে বিকেলে আসিলাম। রাত্রে বিয়েতে বড় গোল, সেসব কথা অনেকে বলিয়াছেন, আর বলিবার দরকার নাই।

কেশবের মত কেশব উপাসনা করিয়া রাজা-রাণীর বিবাহ দিলেন। রাজাকে আনিয়া ওরা আবার হোম ইত্যাদি করিয়াছিল, যদি রাজা হোমটা না করিতেন, তবে এইটীকে খাঁটী ব্রাহ্মবিবাহ বলা যাইতে পারিত।

ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইয়া যাইবার পরেই রাণীকে তুলিয়া আনা হইয়াছিল। বিবাহের পর রাজা যে হোম করিয়াছিলেন, রাণী তাহাতে একেবারে যোগ দেন নাই। আমরা বিয়ের দুই দিন পরেই রাণীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি। কলিকাতায় আসার পর চারিদিক হইতে কেশবের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। আমরা যেদিন এখানে আসি, তার পরদিনই মহারাজা বিলাত চলিয়া গেলেন। রাণীর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। এই বিবাহের জন্য কেশব যাহা সহ্য করিয়াছেন, লোকে তাহা পারে না। যে উদ্দেশ্যে কেশব এত সহ্য করিলেন কুঁচবিহার রাজ্যে তাহা পূর্ণ হোক্।”

(এক্ষণ পত্রিকা, ষোড়শ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, ১৩৯০)

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র-কন্যাদিগের নাম ও জন্মকাল

পুত্র—১। রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ—জন্ম ১৮৮২, ১১ এপ্রিল
২। জিতেন্দ্রনারায়ণ—জন্ম ১৮৮৬, ২০ ডিসেম্বর
৩। নিত্যেন্দ্রনারায়ণ—জন্ম ১৮৮৮, ২১ মে
৪। হিতেন্দ্রনারায়ণ—জন্ম ১৮৯০, ১ জুলাই

কন্যা—১। সুকৃতি দেবী—জন্ম ১৮৮৪
২। প্রতিভা দেবী—জন্ম ১৮৯১
৩। সুধীরা দেবী—জন্ম ১৮৯৪

রাজকুমার-রাজকুমারীদের নামাকরণ অনুষ্ঠান খুব ধুমধাম সহকারে হইত। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে মহারাজকুমার **হিতেন্দ্রনারায়ণ** অসীম বীরত্ব প্রকাশের স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া তাহার অনুলিপি সুনীতি দেবীর কাছে পাঠাইয়া দেয়। এই সংবাদ কোচবিহার গেজেটে প্রকাশ করা হয়। তিনি অবৈতনিক লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেনা বিভাগের প্রশিক্ষণ সহ কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যয়ন করেন।

১৯২০ সনের ৭ই নভেম্বর দার্জিলিং সহরে স্বল্প রোগভোগের পর তাঁহার সেইখানেই মৃত্যু হয়। তাঁহার শেষকৃত্য সমাপন করিয়া চিতাভস্ম কোচবিহারে আনিয়া পূর্ব-পুরুষদের সমাধিক্ষেত্রে রাখা হয়। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে স্কুল, অফিস, আদালত তিন দিন বন্ধ থাকে। ২২শে নভেম্বর ভ্রাতা নিত্যেন্দ্রনারায়ণ

হিন্দুমতে তাঁহার পারলৌকিক কার্যাদি করিলেও নববিধান মতেও যথারীতি অনুষ্ঠান হয়।

ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ কৃষি বিশারদ হিসাবে বিশেষ পরিচিত। ১৯০৭-৮ সনে তিনি কৃষি-বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আমেরিকাতে যান। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনাও করেন। প্রথমে তিনি দার্জিলিং সেণ্ট পল্‌ স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ইংলণ্ডের ফার্ণবরা বিদ্যালয়ে ও পরে ইটন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে আজমীর মেয়ো কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দেরাদুন ইম্পিরিয়েল কেডেট কোরে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করেন। সাহিত্য-চর্চা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহার গৃহশিক্ষক ইন্দুভূষণ মজুমদার লিখিত 'America through Hindu Eyes' বইটি ১৯১৮ সনে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। আমেরিকাতে তাঁহার ভ্রমণ বিষয়ে একটি অধ্যায় এই বইখানিতে সংযোজিত হইয়াছে। বইটি জিতেন্দ্রনারায়ণের নামে উৎসর্গীকৃত। সাহিত্যিকা নিরুপমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার তিন সন্তানের মধ্যে দুইজন অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। গৌতমনারায়ণ দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। ভিক্টর রাজপরিবারের বহু সুখ-দুঃখের সাথী। বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি কাজ করেন এবং ১৯১৩ সনের ২১শে নভেম্বর হইতে স্টেট কাউনসিলের বিশেষ সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩৭ সনের ৩১শে অক্টোবর ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ ইংলণ্ডে এক মোটর দুর্ঘটনায় দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদে মর্মাহত নাগরিকগণ কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে বিরাট শোক সভার আয়োজন করেন। তাঁহার সদাশয় ব্যবহার বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনী এই স্মরণ সভায় আলোচনা করা হয়। এই সভায় তাঁহার পুত্র গৌতমনারায়ণও উপস্থিত ছিলেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ধর্মমাতা হওয়ায় তিনি ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ নামে পরিচিত।

সুকৃতি দেবীর বিবাহ ১৮৯৯ সনের ২৯শে নভেম্বর অলিপুর উডল্যাণ্ডস্‌ রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মহারাজ-কুমারী **প্রতিভা দেবী** ১৯২৩ সনের ২৩শে জুলাই অপরাহ্নে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ একজন সুদক্ষ শিকারী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায়

বাঁকিপুরে থাকার সময় হইতেই তিনি অশ্বারোহণ ও শিকারে দক্ষতা অর্জন করেন। এই সময়ে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গভীর বন থাকায় বন্যপশুর আক্রমণে বহু নিরীহ প্রজাকে প্রাণ দিতে হইত। ডুয়ার্স এবং আসামের জঙ্গলের সঙ্গে কোচবিহারের বনাঞ্চলের সংযোগ ছিল। মহারাজা প্রজাদের প্রাণ এবং ফসল রক্ষা করার জন্য এই রাজ্যে শিকার বিভাগ করেন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় বন্দুক, হাতী ইত্যাদি শিকার বিষয়ক জিনিসপত্রও ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কয়েকটি হাতীকে শিকার বিষয়ে অভিজ্ঞ করিয়া তোলা হয় এবং এই কাজে কিছু কর্মচারীও নিয়োগ করা হয়। মহারাজার প্রচেষ্টায় পাতলাখাওয়া এবং তুফানগঞ্জের টাকোয়ামারীতে রিজার্ভ ফরেষ্ট তৈয়ারী করা হয়। এই সব জঙ্গলে বাঘ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, সম্বর, ভালুক, নানা জাতীয় হরিণ এবং বন্য মহিষ, শুকর প্রভৃতি বাস করিত। মহারাজার সঙ্গে শিকার যাত্রায় দেশী-বিদেশী বহু রাজা মহারাজা এবং ইংরাজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ অংশ গ্রহণ করিতেন। বৃটিশ ভারতের গবর্ণর জেনারেল, গবর্ণর, গৌরীপুরের রাজা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কোচবিহার রাজপরিবারের অনেকেই এই শিকার যাত্রায় অংশ গ্রহণ করিতেন। মহারাজার শিকার জীবনের স্মৃতি বিজড়িত বইটি আমাদের কাছে তাঁহার শিকার অভিজ্ঞতার একটি অমূল্য সম্পদ। বইটির নাম—Thir y-seven years of Big game shooting in Cooch Behar, the Duars and Assam, A Rough Diary. By the Maharaja of Cooch-Behar. প্রকাশ কাল ১৯০৮। ভূমিকায় এতৎ অঞ্চলের জলবায়ু, কোচবিহারের আয়তন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বনাঞ্চল এবং তাহার রূপ-বৈচিত্র্য বিষয়ে উল্লেখ রহিয়াছে। বার্ষিক শিকার যাত্রার সময় কাল বলিতে ফেব্রুয়ারী মাস স্থির থাকিলেও বর্ষার মাঝামাঝি কাল বাদ দিয়া যে কোন সময়ে তিনি শিকারে যাইতেন। বইটির মূল পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬১, ইহা ছাড়াও ভূমিকা, ছবি, মানচিত্র ইত্যাদিও তাহাতে আছে। আর্ট পেপারে বইটী ছাপা। এই বইটিতে ২৯টি অধ্যায় আছে। ভূমিকার এক জায়গায় তিনি লিখিতেছেন—"As regards the people, there is one important difference between Cooch-Behar and other Parts of India, in that the village system does not exist. This is due to the laws of land tenure, for the whole state is divided into small farms and here the farmer has his home, with his nearest relations and occasionally a tenant or two. All the buildings are encir-

cled by grover of plantain, bamboo and other quick growing trees, and these homesteads form one of the principal features of the country."

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের এই শিকার জীবনের ঘটনাবলীর শুরু হইয়াছে ১৮৭১ সন হইতে। এই ৩৭ বৎসরের শিকার জীবন ১৯০৭ সন পর্যন্ত বিস্তৃত। লেখক যদিও শুরুতেই বলিয়াছেন যে, প্রথম দিকের শিকার সংবাদ সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিতে হইয়াছে। এই শিকার জীবনের কথা ডাইরীর মত তারিখ ধরিয়া কবে কি ঘটিয়াছে, কি কি শিকার মিলিয়াছে তাহার উল্লেখ সহ বিবৃত এবং কিছু পরে বিভিন্ন ধরনের মাসিক, বাৎসরিক পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। বই-এর অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলি বর্তমানে দুর্লভ বলা যায়। শিকারে সংগৃহীত জন্তু জানোয়ারের বর্ণনা মনোরম। কোথাও কোথাও সম্ভব হইলে ওজন, আকার, পরিমাপ প্রভৃতি উল্লেখ করিতেও তিনি ভোলেন নাই। মাঝে মধ্যে রসিকতাও আছে। শিকারে রাজপরিবারের মধ্যে ভ্রাতা যতীন্দ্র, পুত্র ভিক্টর, জিতেন্দ্র, মেয়ে সুকৃতি, রাজমহিষী সুনীতি দেবীও অংশ গ্রহণ করিতেন। ১৯০৪ সনে লর্ড কার্জনও মাদারিহাট ফরেষ্টে শিকার করিতে আসেন। এই শিকার যাত্রায় তিনি বিভিন্ন সময়ে বাঘ, হরিণ, ভালুক প্রভৃতি শিকার করেন। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের দীর্ঘ শিকার-জীবনের সাফল্যের একটি পরিসংখ্যান এখানে তুলিয়া ধরা হইল।

বাঘ—৩৬৩, চিতা বাঘ—৩১১, গণ্ডার—২০৭, বাইসন—৪৮, মহিষ—৪৩৮, ভালুক—১৩৩, সম্বার—২৫৯, বড় শিঙ্গা—৩১৮ ;

রাজা-মহারাজাদের খেয়াল খুশীর হিসাব রাখা দায়, কিন্তু এমন কিছু মজার মজার খেয়াল খুশীর কথা এই ইতিহাসের পাতায় ছড়াইয়া আছে, যাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়।

এইখানে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের জীবনের কিছু মজার কথা তুলিয়া ধরিতে চাই। আমরা জানি তিনি ছিলেন আধুনিক কোচবিহারের রূপকার। রাজ্য শাসনের সময় তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া কিছু কথা বলার মত বুকের পাটা খুব কম আমলারই ছিল। আবার দরবার হইতে বাহিরে আসিলেই তাঁহার মন-মেজাজ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইত। তখন একজন স্নেহশীল পিতার মত ব্যবহার করিতেন। হাসি-খুশীতে মজাদার মানুষ হইয়া উঠিতেন। পোষাক-আসাকের বিলাসিতা থাকিত না। শিকার যাত্রায় গল্পে আর খেলাধূলায় মাতিয়া উঠিতেন।

একদিন মহারাজা আলিপুর উডল্যাণ্ডস্ রাজপ্রাসাদের রেলিং-এর ধার দিয়া পায়চারী করিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন যে, রেলিং-এর বাইরে রাস্তায় এক খোঁড়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছে। মহারাজা একটু অবাক হইলেন। তাঁহার সন্ন্যাসীকে কিছু দান করার ইচ্ছা হইল। মহারাজার কাছে কিছু চাইতে বলায় সেই খোঁড়া সন্ন্যাসী তীর্থ যাত্রার কষ্ট লাঘবের জন্য একটি ঘোড়া প্রার্থনা করিল। মহারাজা তাঁহার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সন্ন্যাসীকে তিনি লোক দিয়া ঘোড়ার আস্তাবলে পাঠাইয়া দিলেন, পছন্দ মত ঘোড়া বাছিয়া লইবার জন্য। সন্ন্যাসী ঘোড়াশালায় গিয়া রাজার হৃষ্টপুষ্ট এক-একটি বিরাট চেহারার ঘোড়া দেখিয়া অবাক। এই চেহারার ঘোড়া লইয়া তাহার পক্ষে রোজ খাবার যোগার করা আর পরিচর্যা করা একেবারে অসম্ভব। নিজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঘোড়া না লইয়া খালি হাতেই সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিল। মহারাজা অবাক হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধুজী তাহার সমস্যাটা মহারাজাকে নিবেদন করিল। মহারাজা সাধুজীর কথা শুনিয়া তাহার নিজের পছন্দ মত একটি ঘোড়া কিনিবার জন্য অর্থ দান করিলেন। সাধুজী এইবার খুশী মনে বিদায় লইল।

আর একদিনের ঘটনা। মহারাজার নিত্য-দিনের ক্ষৌরকার আসিয়াছে তাঁহার দাড়ি কামানোর জন্য। মহারাজা সেই সময়ে বন্ধুদের সহিত হাসি-ঠাট্টায়, গল্প-গুজবে মশগুল ছিলেন। নাপিত মহাশয় কোন বাক্যব্যয় না করিয়া যন্ত্রপাতি সব প্রস্তুত করিতেছে, হঠাৎ মহারাজার মাথায় এক খেয়াল চাপিল। তিনিই আজ ক্ষৌরকারের কাজ করিবেন এবং তাঁহার ক্ষৌরকার্যের রাজকীয় দক্ষতা প্রমাণ করিবেন। কথা শুনিয়া সকলের আক্কেল গুড়ুম। রাজার ইচ্ছা বলিয়া কথা। না করে কে? রাজা নিজেই প্রস্তাব দিলেন, এক বন্ধুর এক গালে তিনি এবং অন্য গালে নাপিত ভায়া ক্ষুর চালাইবেন। তখন দেখা যাইবে দাড়ি চাছার যোগ্যতা কার কতটুকু। দুই-একজন বন্ধু বিপদ বুঝিয়া পালাইবার পথ খুঁজিতেছিল। কিন্তু সুবিধা হইল না। এক বন্ধুকে ধরিয়া তিনি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। তাহার উপরেই দাড়ি কামানোর প্রতিযোগিতা সুরু হইবে। চেয়ারে বসিয়া বন্ধুটী বলির পাঁঠার মত দুরু দুরু বুকে ভাবিতে লাগিল—"আজ বোধ হয় আর অক্ষত অবস্থায় বাড়ী ফেরা যাইবে না।" ফাঁসীর আসামীর মত বসিয়া বন্ধুটি তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম স্মরণ করিতে লাগিল। অন্য বন্ধুরা ফিস্-ফিস্ করিয়া রাজার এই খামখেয়ালীর বিষয়ে

আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিল। আর নাপিত মহাশয়ের অবস্থা এখানে না বলাই ভাল। বন্ধুটি চোখ বুজিয়া চেয়ারে শক্ত কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। ক্ষৌরকার্য শুরু হইল। মহারাজার অনারে মহারাজার ফার্স্ট চান্স। মহারাজা দিলেন এক পোঁচ…দুই পোঁচ…তিন পোঁচ। ব্যাস ক্লীন সেভ। নাপিত মহাশয় অপর গালে ভয়ে ভয়ে ক্ষুর চালাইলেন। নরসুন্দর ব্যাপার-স্যাপার দেখিয়া থ। তাহার হাতেও এত সুন্দর দাড়ি কাটা হয় না। দুই গালের দাড়ি কাটা হইল। ইতিমধ্যে বন্ধুটিও যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। সামনে রাখা আয়নার দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইয়া তিনি অবাক। কোথাও কোন কাটাকুটি নাই। ঝকঝকে পরিষ্কার মুখ। যাহাকে বলে ক্লীন সেভ। আর পাশে দাঁড়াইয়া ক্ষৌরকার মহারাজা গোঁফের ফাঁক দিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। সবাই হৈ-হৈ করিতে আরম্ভ করিল। প্রমাণ হইল তাঁহার ক্ষৌরকর্ম দক্ষতা।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের এই কাণ্ড-কারখানার কথা সারা শহরে মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল।

এখন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মহানুভবতা বিষয়ে একটি গল্প বলি। একদিন মহারাজা রাজপ্রাসাদে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়াছে। রাজা মহাশয় কাঁচের জানালা দিয়া রাস্তার দৃশ্য দেখিতেছেন, কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তিনি এক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বলতো, এই বৃষ্টির মধ্যেও আমার প্রজারা ছাতা বন্ধ করিয়া যাইতেছে কেন? ছাতা নষ্ট হওয়ার ভয়েই কি নিজেরা এমন কষ্ট করিতেছে?" পাশে দাঁড়াইয়া থাকা একজন রাজকর্মচারী নরম গলায় বলিয়া উঠিল—"মহারাজ, ইহা প্রজাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নয়। মহারাজার সামনে দিয়া প্রজাগণ ছাতা খুলিয়া যাইতে শংকিত হয় বলিয়া, রাজবাড়ীর সামনের পথ দিয়া ছাতা খুলিয়া যায় না। এই ব্যবস্থা আজিকার নহে। কেউ কেউ বলে রাজভয়। আবার কেউ বলে রাজশ্রদ্ধা। এই সব কারণেই তাহারা এমনিভাবে কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে।"

এই কথা শোনামাত্র মহারাজার খুব দুঃখ হইল। জোর করিয়া কাহারও শ্রদ্ধা আদায় করা যায় না। ইহা হইল সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। ভয় দেখাইয়া প্রজার মন জয় করা যায় না। তৎক্ষণাৎ সেক্রেটারী বিগ্‌নেল্‌ সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি চাই না, আমাকে শ্রদ্ধা জানাইতে বৃষ্টির মধ্যেও ছাতা বন্ধ করিয়া চলিতে হইবে। রাজবাড়ীর পাশ দিয়া চলিতে গেলে ছাতা

বন্ধ করিতে হইবে ইহাও বাঞ্ছনীয় নয়। তুমি এখনই আমার ঘোষণাপত্র প্রচারের ব্যবস্থা কর। আমি কোন লোককে কখনও কষ্ট দিতে ইচ্ছুক নই।"

রাজার কথাই তখন আদেশে পরিণত হইল। ঘোষণাটি শোনা মাত্র প্রজারা মহারাজার গুণকীর্তন করিতে লাগিল।

আমি এইখানে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ লিখিত একটি পারিবারিক চিঠি তুলিয়া ধরিতেছি। রাজার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার যতীন্দ্রনারায়ণকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। কলিকাতা হইতে ১৮৭৯ সনের ১৩ সেপ্টেম্বরের এই চিঠির মাধ্যমে তাঁহার সিংহাসন আরোহণ, রাজকার্য পরিচালনা এবং ভ্রাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে অনুরোধ-সূচক আবেদন রহিয়াছে। চিঠিখানির বানান অপরিবর্তিত রাখিয়াই এখানে তুলিয়া ধরিলাম।

(রাজকীয় সীলমোহর)

২৯ নম্বর থিএটর রোড
১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯

প্রিয়তম দাদা,

আপনার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। আমার উপরে সকল কার্য্যে নির্ভর করিবেন আপনার ভালর কারণেই আমি আপনাকে লেখিয়াছিলাম। আপনি দস্তুর মত আফিসে যাইয়া কার্য্য সকল ভালরূপে শিক্ষা করিবেন এইসব আমার প্রথম ইচ্ছা। আর বাঙ্গলা ও সাইনের প্রতি মনোজোগ করিবেন। আমার আগামি বৎসরে রাজ্য পাইবার অনেক সম্ভব আছে। ককবেল সাহেব যে কুচবেহারে কমিসনর ছিলেন বলিয়াছেন কি Government তোমাকে বলপূর্ব্বক ২১ বৎসরের সময় রাজ্য দিতে পারেন— তোমার ১৮ বৎসরের সময় রাজ্য লইতে পার। আমি এই কথায় কমিসনরকে লিখিয়াছি এখন উত্তর পাই নাই।

আমি ভাল আছি আপনার মঙ্গল সতত লিখিবেন।

স্নেহপূর্ব্বক
নৃপেন্দ্র

১৮৬৩-৬৫ সনে ভুটান যুদ্ধ ও তাহার পরে লুসাই অভিযানে কোচবিহারের সৈন্যদল বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। সেই সময়ে নৃপেন্দ্রনারায়ণ নাবালক থাকিলেও তাঁহার সুগঠিত দেহ ও মানসিক শক্তিতে সেনানায়কের বিশেষ ভূমিকা পালন করিতে পারিতেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক

সম্মানজনক লেফ্‌টেন্যান্ট এবং পরে কর্ণেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। টিরা যুদ্ধে তিনি যোগদানের অনুমতি লাভ করেন। সামান গিরিশ্রেণীর যুদ্ধেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। দর্গাই দখল করিবার সময়ও মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। এই সকল যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য নৃপেন্দ্রনারায়ণ ইংরাজ সরকার ও সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট হইতে অভিনন্দন ও সম্মান লাভ করেন। তাঁহার উপাধিগুলির মধ্যে—সি. বি. জি. সি. আই. ই. বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৮৫ সনে লর্ড লিটন বড়লাট বাহাদুর তাঁহাকে 'মহারাজা ভূপ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং পরে ইহা বংশানুক্রমিক উপাধি হিসাবে স্বীকৃতি পায়। মহারাণী স্নীতি দেবীকেও সি. আই. উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রাজ্যের প্রশাসনে নূতন জোয়ার আসে। নূতন নূতন বিভাগ খোলা হয়। প্রশাসনকে আধুনিক করার জন্য বহু অভিজ্ঞ লোককে বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে আনিয়া বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হয়।

১৮৯০-৯১ সনে কোচবিহারে জন-গণনা আইন পাশ হয়। এই সময়ে এখানকার লোক-সংখ্যা ছিল ৫,৭৮,০৫৪ জন।

১৮৯১-৯২ সনে উর্ধতন রাজকর্মচারীগণ কোন স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবেন না বলিয়া নৃপেন্দ্রনারায়ণ আইন করেন।

১৮৯০-৯১ সনের বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে দেখা যায় যে রাজমাতা নিশিময়ীকে 'দেও আই দেবতী' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল।

১৯০৬-৭ সনে কোচবিহার শহরে পুনঃ জরিপ হয় এবং জলপাইগুড়ি জেলা ও কোচবিহারের মধ্যে পুনরায় সীমানা বিন্যাস করা হয়।

ইহা ছাড়াও গ্রামীণ প্রশাসনে গ্রামীণ চৌকিদারী আইন এবং পৌর ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপদানের উদ্দেশ্যে টাউন কমিটি আইন পাশ করা হয়।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে কোচবিহার রাজপ্রাসাদ, মদনমোহন বাড়ী, ভিক্টোরিয়া কলেজ (বর্তমান এ, বি, এন, শীল কলেজ), সুনীতি একাডেমী প্রভৃতি গড়িয়া ওঠে। কোচবিহারের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগও স্থাপিত হয় তখন।

খেলাধূলার জগতে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মরণীয় এক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। তিনি নিজেই বিলিয়ার্ড, টেনিস, পোলো প্রভৃতি খেলায় সুনিপুণ ছিলেন। কলিকাতার ইণ্ডিয়া ক্লাব সহ বিভিন্ন স্থানে তিনি একাধিক ক্লাব

তৈয়ারী করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার সময়েই ভিক্টোরিয়া কলেজ ইলিয়ট শীল্ড জয় করে।

আনন্দময়ী দেবী সৎ বোন হইলেও মহারাজা তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। ১৮৬৮ সনের ২০শে জানুয়ারী মাত্র আট বৎসর বয়সে পাঙ্গার রাজকুমার যোগেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে মহা সমারোহে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ১৮৬৯ সনে পতিহীনা হইয়া ভাইয়ের সঙ্গেই বাস করিতে থাকেন এবং পাঙ্গার সম্পত্তি নৃপেন্দ্রনারায়ণের নামে লিখিয়া দেন। কামেশ্বরী দেবীর সহিত বারাণসীতে অবস্থান কালে আনন্দময়ী হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হন। তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য চুঁচুড়াতে আনা হয়। সেখানে চিকিৎসার সকল প্রকার ব্যবস্থা করা সত্বেও ১৮৮৭ সনের ২৩শে ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন। বোনের স্মৃতি রক্ষার্থে মহারাজা মদনমোহন ঠাকুর বাড়ী সংলগ্ন এলাকায় ১৮৯০ সনে আনন্দময়ী ধর্মশালা স্থাপন করেন।

মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের মহিষী কামেশ্বরী দেবী ১৮৮৭ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর বারাণসীতে রাজ্যের যুগ্ম ম্যানেজারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার ভরণ-পোষণ এবং তীর্থ ভ্রমণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। দীর্ঘকাল বিভিন্ন দায়িত্বে থাকিয়া রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯১১ সনে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ অসুস্থ হইয়া পড়ায় ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরে বেক্স হিল নামক স্থানে তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ১৯১১ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিঃ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে শোকের ছায়া নামিয়া আসে। গোওার্স গ্রীণের শ্মশানে তাঁহার সৎকার করা হয়। মহাসমারোহে কামানের গাড়ীতে করিয়া অন্ত্যেষ্টিযাত্রা হয়। গাড়ীর সঙ্গে ছিলেন রাজকুমার রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ, জিতেন্দ্রনারায়ণ, ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ ও হিতেন্দ্রনারায়ণ সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ দেশী বিদেশী বহু পত্রিকায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়। তাঁহার চিতাভস্ম কোচবিহারে আনিয়া কেশব বাগানে রাজকীয় সমাধি ক্ষেত্রে রাখা হয়।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কি ভাবে হইবে সেই বিষয়ে একটী পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়, কারণ ব্রাহ্মমতে কোচবিহারে এই প্রথম অনুষ্ঠান। পুস্তিকাটির নাম 'শ্রাদ্ধ পদ্ধতি',

কলিকাতা আর্ট প্রেসে এবং আর্ট পেপারে মুদ্রিত। লেখক, প্রকাশক, প্রকাশ কাল বা মূল্য কিছুই নাই। প্রথম পাতায় বাংলা সাল হিসাবে ১৩ই কার্তিক, ১৩১৮ লেখা আছে। প্রতি পাতায় কালো বর্ডার দেওয়া আছে। এখানে সেই শ্রাদ্ধ পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তিকার অংশটুকু তুলিয়া ধরিতেছি—

শ্রাদ্ধ পদ্ধতি

(নব-সংহিতা)

কুচবিহার

১৩ই কার্তিক, ১৩১৮

[স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের এই পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ হইয়াছে]

শ্রাদ্ধ পদ্ধতি

(নব-সংহিতা)

সমাধিস্থলে উপনীত হইলে পুরোহিত এইরূপে একটী প্রার্থনা করিবেন ,—

হে স্বর্গের পিতা, তোমার আদেশে পবিত্র স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ পরলোকগত ব্যক্তির চিতাভস্ম এই স্থলে স্থাপন করিতেছি। যাঁহার আত্মা তোমার সমীপে গমন করিয়াছে তাঁহার এই দেহাবশিষ্ট ভস্মরাশিকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর। পরলোকগত আত্মা এবং তাঁহার জীবিত আত্মীয় বন্ধুগণকে তোমার নিত্য শান্তি বিধান কর।

পুরোহিত স্বহস্তে কর্ণিক লইয়া ইষ্টক এবং তাহার বন্ধনী উপাদান দ্বারা ভস্মাধারকে আবৃত করিয়া দিবেন।

অনন্তর বন্ধুদল তথা হইতে দেবালয়ে অথবা শ্রাদ্ধস্থলে আসিয়া একত্রিত হইবেন এবং সেখানে সকলে আপনাপন আসনোপরি উপবিষ্ট হইলে আচার্য্য প্রচলিত প্রথানুসারে উপাসনা করিবেন।

আচার্য্য দুইজন অধ্যাপক সহ নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় মন্ত্রবচন পাঠ করিবেন এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন ;—

মাতরং-পিতরঞ্চৈব
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্,
মত্বা গৃহী নিষেবেত
সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ ॥ ১ ॥

গৃহী ব্যক্তি মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা মনে করিয়া সদা সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদিগের সেবা করিবেন ॥ ১ ॥

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং
সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ
সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ ২ ॥

কুলপাবন সৎপুত্র সর্ব্বদা মৃদু বাক্য শ্রবণ করাইবে, প্রিয় আচরণ করিবে এবং পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে ॥ ২ ॥

গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং
মাতা পরমকো গুরুঃ ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ
খাৎ পিতোচ্চতর স্তথা ॥ ৩ ॥

সমুদায় গুরুজনের মধ্যে মাতা পরম গুরু। মাতা পৃথিবী হইতে এবং পিতা আকাশ হইতেও উচ্চ ॥ ৩ ॥

যং মাতা পিতরৌ ক্লেশং
সহেতে সম্ভবে নৃণাং,
নতস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা
কর্ত্তুং বর্ষশতরপি ॥ ৪ ॥

মনুষ্যের জন্মে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, শতবর্ষেও কেহ তাহা পরিশোধ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

নামুত্র হি সহায়ার্থং
পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ,
ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতি
ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥ ৫ ॥

পরলোকে সাহায্যার্থ পিতা-মাতাও থাকেন না, পুত্র কলত্রও থাকে না, জ্ঞাতি স্বজনও থাকে না, কেবল এক ধর্ম্মই অবস্থিতি করেন ॥ ৫ ॥

একঃ প্রজায়তে জন্তু
রেক এব প্রলীয়তে,
একোহনু ভুঙ্‌ক্তে সুকৃত—
মেক এব তু দুষ্কৃতম্ ॥ ৬ ॥

একাকী জীব জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়, একাকীই সুকৃত এবং দুষ্কৃত ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মৃতং শরীর মুৎ সৃজ্য
কাষ্ঠ লোষ্ট সমং ক্ষিতৌ,
বিমুখা বান্ধবা যান্তি
ধর্ম্মস্তমনু গচ্ছতি । ৭ ॥

কাষ্ঠ লোষ্ট সম মৃত শরীর ভূতলে নিঃক্ষেপ করিয়া বন্ধুগণ বিমুখ হইয়া চলিয়া যান, এক ধর্ম্মই কেবল তাহার অনুগমন করে ॥ ৭ ॥

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং
নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন
তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥ ৮ ॥

সহায়তা জন্য নিত্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম সহায় হইয়া দুস্তর নরক উত্তীর্ণ করাইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

পাঠান্তে প্রধান শোককারী ভ্রাতাদিগকে পার্শ্বে বসাইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তারূপে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন ;—

পরমেশ্বর, তুমিই দিয়াছিলে এবং তুমিই লইয়া গেলে। আমাদের ভক্তিভাজন এবং প্রিয়তম পিতার পরলোকগমনে আমরা পিতৃহীন ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় তিনি গিয়াছেন, আমরা তাহা জানি না। যে অপরিচিত অজ্ঞাত দেশে মৃতেরা আহূত হন, এবং যে দেশ হইতে তাঁহারা আর কখন ফিরিয়া আসেন না, তাহার বিষয় কোন মনুষ্য অবগত নহে। আমরা ইহাই জানি আমাদের পিতা এই পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা পরীক্ষা হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্য এক জগতে গমন করিয়াছেন। হে পিতার পিতা, আমাদের পিতার আত্মাকে তোমার চরণে স্থান দান কর এবং কৃপা কর, যেন তিনি তোমার সহবাসে অনন্তকাল স্বর্গের পবিত্রতা এবং শান্তি সঞ্চয় করিতে পারেন। তাঁহার নিকট তুমি তোমার উজ্জ্বল প্রেমমুখ প্রকাশিত কর, এবং তোমার মধুর প্রেমামৃত পান করাইয়া তোমার আনন্দে তাঁহাকে মগ্ন থাকিতে দাও। পৃথিবীর পরীক্ষা বিপদের মধ্যে যিনি আমাদের রক্ষক, প্রতিপালক, আশ্রয় এবং বল ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে, হে ঈশ্বর, আমরা কিরূপ অসহায় হইয়া পড়িয়াছি তাহা তুমি জান। কিন্তু তুমি যখন অসহায়দিগের সহায়, এবং পিতৃহীনদিগের পিতা, তখন এই উপস্থিত বিরহ শোক এবং দুঃখের অবস্থায় আমরা তোমারই

আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছি। আমাদের সন্তপ্ত এবং ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি বিধান কর এবং তোমার সুমধুর সান্ত্বনা বাক্য আমাদের শোকবিহ্বল চিত্তকে স্থির করুক। তুমি মর্ম্মাহত শোকার্ত্তজনের সান্ত্বনা এবং আনন্দ। প্রিয় পরমেশ্বর, পৃথিবীর অনিত্য সুখ এবং সম্মান হইতে আমাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্যের দিকে লইয়া চল। আশা বচনে এই প্রবোধ দাও যে, যে সকল ব্যক্তি এই জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা তোমার আলয়ে একত্রিত হইয়াছেন, এবং যখন সময় আসিবে তখন আমরাও সেই সুখ নিকেতনে অমরাত্মাগণের সহিত গিয়া পুনর্ম্মিলিত হইব। আমাদের জীবনকে পবিত্র করিয়া দাও এবং গৌরবের রাজ্য সেই নিত্যধামে চিরকাল বাস করিবার জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত কর। হে নিত্য রাজ্যেশ্বর, জয় জয়, তোমারি জয়।

তদনন্তর আচার্য্য প্রার্থনা করিয়া এইরূপে শান্তিবচন উচ্চারণ করিবেন ;—

মহান্ ঈশ্বর, এই সুগম্ভীর শ্রাদ্ধ বাসরে কেবল তুমি একমাত্র সার সত্য, চিরকালের সত্য, আর আমরা ধূলি সদৃশ, ইহা যেন অনুভব করিতে পারি। মনুষ্য এই ছিল, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আর নাই। এই দেখিলাম পরিবার বন্ধু-বান্ধব পার্থিব সম্পদরাশি আমাদিগকে আহ্লাদিত এবং উল্লাসিত করিতেছে, পরক্ষণে সে সকল কোথায় চলিয়া গেল; কেবল আত্মা একাকী নিঃসম্বল হইয়া অনন্ত সাগরে ভাসিল। অতএব, নিত্যদেব, তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, যাহা আধ্যাত্মিক এবং নিত্য সেই সকল বিষয়ে আমাদের হৃদয়কে বদ্ধ করিয়া রাখ। পরলোক সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসকে ঘনীভূত কর এবং অনন্ত জীবনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লও। পরলোকগত আত্মাকে তুমি স্বর্গের সমগ্র আলোক এবং মহিমা প্রদান কর। যদিও আমরা বাহ্যভাবে তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আমরা যেন তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক যোগে চিরকাল অবস্থিতি করিতে পারি। তোমার অপার করুণা গুণে এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হউক এবং আমরা এখানে থাকিতে থাকিতেই যেন তাহার আনন্দের পূর্ব্ব স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তোমার সুখী অমরাত্মা সাধু পরিবারের সহিত তোমার মধ্যে বাস করিতে পারি।

করুণাময় পরমেশ্বর এই পরিবারের প্রতি স্বর্গের শান্তি বিধান করুন এবং গৃহকে স্বর্গ করুন।

অতঃপর শ্রাদ্ধকর্ত্তা এইরূপে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবেন ;—

আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এবং সমস্ত পিতৃপুরুষগণ ধন্য হউন। আমার প্রিয়তম আত্মীয় বন্ধুগণ ধন্য হউন। এদেশের প্রাচীন আর্য্য ঋষি মুনিগণ

ধন্য হউন, দেশীয় এবং বিদেশীয় সমস্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাজন ও ধর্ম্মনেতৃগণ ধন্য হউন। আমাদের পরিচিত শত্রু মিত্র, সাধু অসাধুগণের যে সকল অশরীরী আত্মা আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন প্রকার অবস্থায় বাস করিতেছেন তাঁহারা ধন্য হউন।

পরে তিনি শ্রাদ্ধের দান সামগ্রী সকলের বিষয় এইরূপে বিজ্ঞাপন করিবেন—

অদ্য ১৮৩৩ শকে, কার্ত্তিক মাসে, ত্রয়োদশ দিবসে, সোমবারে, শুক্ল পক্ষে, অষ্টমী তিথিতে ঈশ্বরের নামে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত পরলোকগত আত্মার সম্মানার্থ ও জনসমাজের উপকারার্থ এই সকল দান উৎসর্গ করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

নৃপেন্দ্র-মহিষী মহারাণী সুনীতি দেবী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও সতী জগন্মোহিনী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবী ১৮৬৪ সনের ৩০ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পাঁচ ভাই পাঁচ বোন। সুনীতি দেবীর লেখাপড়া শুরু হয় পিতার কাছে, পরে ভারতাশ্রমে, কিছুদিন বেথুন কলেজে এবং য়ুরোপীয় গৃহ শিক্ষয়িত্রীর কাছে।

১৮৭৮ সনের ৬ই মার্চ কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কোচবিহারে তাঁহার বিবাহ হয়। পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি ট্রেনে কলিকাতা হইতে কোচবিহারের হলদীবাড়ীতে আসেন এবং সেখান হইতে পাল্কীতে কোচবিহারের রাজধানীতে আসেন। এই ঐতিহাসিক বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া বিতর্কের ঝড় ওঠে। নূতন বিবাহ আইন (Act III of 1872) অনুযায়ী দুইজনের বয়সই কম ছিল, সেইজন্য কেশব সেন বুদ্ধি করিয়া বলিলেন, যতদিন ইঁহারা প্রাপ্ত বয়স্ক না হইবে ততদিন বাগদানের মত ধরিতে হইবে। এই শর্ত অনুসারে নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিবাহের কিছুদিন পরেই উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত চলিয়া যান এবং সুনীতি দেবী কলিকাতায় পিতার কাছেই থাকেন। মহারাজা দেশে ফিরিয়া আসিলে ১৮৮০ সনে 'ভারতীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে' তাঁহাদের বিবাহ-পরিপূরক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

সুনীতি দেবীর চরিত্রে পবিত্রতা, নিষ্ঠা, স্বাভাবিক তেজস্বিতা, উৎসাহ ও মাতৃপ্রাণতা বিদ্যমান ছিল। প্রজাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, মাদকদ্রব্য নিবারণ, জনসেবা ও তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সংস্কার দূরীকরণে তিনি উদ্যোগী হন। কলিকাতার যশস্বী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও অধ্যাপকদের কোচবিহার

ভিক্টোরিয়া কলেজ ও বিদ্যালয়ে আনিয়া রাজ্যে শিক্ষার ও বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রবর্তন করেন। বহু যোগ্য বাঙ্গালী কর্মচারীকে এখানে আনিয়া রাজ্য শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক, কীর্তনীয়া এবং বক্তাদের এখানে আনিয়া উৎসব, কীর্তন, কথকতা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া রাজ্যে নূতন ধর্মচেতনার সৃষ্টি করেন। এই সকলের ভিতর দিয়া মহারাণী সুনীতি দেবী চিরদিনের জন্য নূতন কোচবিহার গঠনের অধিনেত্রীরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা ছাড়াও দানশীলতা, বাগ্মিতা, কথকতা প্রভৃতি গুণের সঙ্গে সামাজিক চেতনা বোধেও উদ্‌বুদ্ধ ছিলেন তিনি। তাঁহার কোচবিহারে আগমন ভগবান প্রদত্ত আশীর্বাদ স্বরূপ। পরিণত জীবনে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার ও প্রসার কাজেই সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি ও ভাই-বোনদের প্রতি ভালবাসার তুলনা নাই। বোন ময়ূরভঞ্জের রাণী সুচারু দেবী তাঁহাকে 'দিদিভাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কেশব সেনের দ্বিতীয়া কন্যা সাবিত্রী দেবীরও কোচবিহার রাজ পরিবারের গজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বিবাহ হয়। তিনিও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন।

বাংলায় ও ইংরাজীতে লেখা ও বলার ক্ষমতা মহারাণীর ছিল। তাঁহার কথকতা, উপাসনা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিত, চিত্তকে স্বর্গীয় শক্তিতে শক্তিমান করিত। তিনি পিতার ন্যায় অভিনয়-প্রিয় ছিলেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লইয়া প্রায়ই সুন্দর সুন্দর অভিনয় ও টেব্‌লোর ব্যবস্থা করিতেন। পিতার জন্মদিনে 'কল্পতরু' উৎসবের সময় যাত্রা, কথকতা, কীর্তন ও আনন্দ-বাজারের ব্যবস্থা করিতেন ও আনন্দের জোয়ারে উৎসবকে ভাসাইয়া দিতেন। বিশেষ করিয়া পর্দানসীন মহিলাদের মুক্ত প্রাঙ্গণে, সকলের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার সুযোগ দান, নানান জ্ঞান ও বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করানো, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতার এই নূতন উপায়টিকে শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের ১৮৮৯ সনের একটি চিঠিতে দেখা যায় মহারাণী সুনীতি দেবী কোচবিহারে নারী শিক্ষার প্রসার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত হইতে বিভিন্ন অংশ লইয়া তিনি নাটকাদি করিতেন। অনেক সময়ে সুনীতি দেবীর লেখা নাটিকাও অভিনীত হইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য-সাধনায় যে নব জাগরণ আসিয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালী মহিলাদের অবদানও স্মরণীয়। এই সময়ে যে সমস্ত মহিলা ভারতীয় ভাবনাকে সাহিত্য-দরবারে হাজির করিয়া নূতন জোয়ার

আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুনীতি দেবী একজন। এই অধ্যায়ে তাঁহার সাহিত্য-কীর্তি বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করিতে চাই।

সুনীতি দেবী রচিত গ্রন্থ তালিকা

বাংলা :—

১। অমৃত বিন্দু (১ম খণ্ড, প্রকাশ-১৩২৫) সঙ্গীত পুস্তক
২। অমৃত বিন্দু (২য় খণ্ড, ১৩৩২) পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২
৩। কথকতার গান (১৩২৮) পৃষ্ঠা ২৯
৪। ঝড়ের দোলা (১৯২১) ৪টি ছোট গল্পের সংকলন
৫। সাহানা (১৯১৫) ছোট গল্প সংকলন
৬। শিশু কেশব (১৯২২) কেশব সেনের বাল্যজীবন কথা
৭। শিবনাথ (১৯২১) শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত।
৮। সংঘ শঙ্খ
৯। সতী (গীতিনাট্য) পৃষ্ঠা ৩৮

ইংরাজী :—

1. The Rajput Princesses
2. The Beautiful Mogul Princesses (1918)
3. Nine Ideal Indian Woman (1919)
4. The life of Princess Yashodara
5. The Bengal Dacoits and Tigers
6. The Autobiography of an Indian Princess (1921)
7. Indian Fairy Tales (1922)
8. Prayers.

সুনীতি দেবীর লেখা গ্রন্থ তালিকা উপরে তুলিয়া ধরিলাম। নীচে উপরোক্ত বইগুলি বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করিলাম।

অমৃত বিন্দু (১ম খণ্ড) ১৩২৫ সালে ছাপা। লেখিকা সুনীতি দেবী রচিত এই গানের সংকলনে মোট ১৮৪টি গান আছে। অনেকগুলি গানে সুর, তাল বিষয়ে উল্লেখ আছে। বিরাট সংকলনটি বৈচিত্র্যের স্বাদে ভরপুর।

এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলিয়া ধরিয়া তাঁহার কবি প্রতিভার মূল্যায়ণ করিতে চাই, ভক্তিরসপূর্ণ গীত রচনাতেই তাঁহার সমধিক কৃতিত্ব লক্ষণীয়। বিপদ-

সঙ্কুল জীবনে পরম পিতার উপর পূর্ণ নির্ভরতা প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নোক্ত গানটিতে—

জীবন তরণী মম
ভাসে কাল সাগরে
কঠিন তরঙ্গাঘাতে
উঠে পড়ে বারে বারে।
কোথা নাথ সখা
এস মোরে দাও হে দেখা
সাগরে যে ভাসি একা
ঘিরেছে তরা আঁধারে। (৪)

আবার অনন্ত সুন্দরের আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনায় তিনি বলিতেছেন—

(নাথ) দাঁড়ায়ে তোমার দুয়ারে
দ্বার খুলে দাও দ্বার খুলে দাও
ডেকে লও মোরে ঘরে। (৮)

ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া কখনও তিনি মুরলীধরকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—"তোমার প্রেমের বংশীধ্বনি আমি প্রাণ ভরে শুনি। তোমার কৃপাগুণে এই দীনহীনজনকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাও।" কোথাও আবার দয়াময়ীকে বলিতেছেন—"আমায় ভুলে আর থেকো না।" অনন্ত আনন্দের স্বরূপকে তিনি ভালবাসেন। আবার কোথাও তিনি বলিতেছেন—"অন্ধকার বিপদসঙ্কুল পথে তোমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আমি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন আমার পথ স্থির করিয়া দাও।" নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম হইয়াও হিন্দু-বন্দিত দেবদেবীর কথা বিভিন্ন গানে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। সেইজন্য দেখা যায় শিব, কালী, হরিদ্বার, গঙ্গাজল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁহার গানে আসিয়াছে। ইহাতে মনে হয় সুন্দর এক সমন্বয়ের ভাব তাঁহার মধ্যে ছিল। ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাবান ছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি কখনই ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান নাই। নিরাকার ব্রাহ্মী হইয়াও পৌত্তলিকতার উর্ধে উঠিতে পারেন নাই। তাই দেখা যায় মহাদেবের গুণ-কীর্তন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

এসেছি হে মহাদেব
তোমার কৈলাসপুরে

শুনেছি ভকত মুখে
হেথা চির শান্তি বিরাজ করে।

আশা করে এসেছি নাথ
স্বর্গে যাব সশরীরে। (৪৫)

কথনো দেখি, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ক্ষুব্ধ তিনি—

ওহে বংশীধর শুনাও বাঁশী নিশি দিনে,
মোহন বংশী ধ্বনি শুনি সজনে বিজনে। (১৩৫)

এইরূপ বহু ভক্তি-সঙ্গীত তিনি যেমন রচনা করিয়াছেন, তেমনি ব্রাহ্ম ধর্মের নববিধানের সুশীতল ছায়াতলে, ত্রিতাপে তাপিত, ক্ষুধিত তৃষিত জগতজনকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন এই গান গাহিয়া—

নূতন বিধানে জগত
নূতন ভাবে সেজেছে
নব প্রেম সুধা হাতে
নব প্রেমিক এসেছে। (৭)

আবার কোথাও নববিধানের প্রবর্তক পিতা কেশবচন্দ্রের সপ্রেম আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য প্রেরণা দিয়াছেন গানে—

প্রেমের বাঁশী আবার বেজেছে
প্রেমময়ের প্রেমের ডাক্ ঐ ডাকিছে,
দলে দলে আর্য্য নারী, নব দেবালয়ে মিলেছে
কোথা শান্তি, মুক্তি বলে কত কেঁদেছে
সুধাপানের আশে আজ সবাই এসেছে। (১৪)

আত্মকথা বা স্মৃতিচারণমূলক গাথাগুলির মধ্যে স্বামী, পুত্র, পৌত্র, পিতা, বোন প্রভৃতির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। আনন্দের চেয়েও দুঃখের প্রকাশই যেন বেশী দেখিতে পাই। এখানে বিশেষ করিয়া স্বামী বিয়োগ ব্যথার কথাই তুলিয়া ধরিতেছি যা আন্তরিকতায় ভরা—

ঘুরিয়া ফিরিয়া বৎসর বহিয়া
আবার আসিল এ দিন
ভীষণ আকারে ঘিরিয়া আমারে
কাঁদালো শোকে যে দিন।

নিঠুর হইয়া লইল কাড়িয়া
যত ছিল আভরণ
বিধবা সাজাল আঘাতে মুছাল
সুন্দর সিন্দুর মম।

যিনি অধ্যাত্মভাবে এত ভাবিত তিনি প্রকৃতি, ফুল প্রভৃতিকে ভাল না বাসিয়া পারেন না। তাহার পরিচয়ও দুর্লভ নহে। যেমন—

আমি ফুল যে ভালবাসি
আমি দেখি কেবল ফুলের মাঝে মায়ের মধুর হাসি
ফুলের মধু লব লুটে
ফুলের মত থাকব ফুটে
ফুলের মত ফুল্ল ভাবে থাকব দিবানিশি। (১৬২)

সুনীতি দেবীর রচনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করিলাম। পিতৃ-পরিবারের ভাব ও ভাবনা এবং শ্বশুরবাড়ীর প্রভাব বিভিন্ন কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরিবার পরিজনের স্নেহচিন্তা তাঁহাকে কতখানি বিভোর করিয়াছিল তাহাও তাঁহার বিভিন্ন কবিতার কলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের ভক্তিসঙ্গীত জগতে রামপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিলেও কোচবিহারের নৃপতিদের ভক্তিরসানুভূতি কম ছিল না। কোচবিহারের মহারাজাদের মধ্যে প্রাণনারায়ণ, হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণ যে ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ভক্তিসঙ্গীত রচনার নিদর্শন সত্যিই বিরল। সুনীতি দেবীর ভক্তিনম্র চিত্তের সঙ্গীতগুলি তাই উপেক্ষণীয় নয়।

একথা স্বীকার্য যে ভাষা ও ছন্দের উল্লেখ্য চমৎকারিত্ব না থাকিলেও স্নিগ্ধ সারল্য ও আন্তরিক আবেগে এই গানগুলি সমৃদ্ধ। শুধু বিষাদ নয়, নানা ভাবনার, হৃদয়াবেগের নব উপকরণ এখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। রাজমহিষী হইয়াও দুঃসহ দুঃখ বেদনায় ভরা কবিতার মধ্যে যে করুণ আবেদন তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত ও উন্নত মানসিকতার পরিচয় পাই।

ইংরাজী রচনাগুলির মধ্যে "The Autobiography of an Indian Princess" তাঁহার নিজের জীবন কথার দলিল। এই বইতে তাঁহার ব্যক্তিগত কথা, রাজপরিবার ও পিতৃ-পরিবারের কথা, ভাবী স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থা কেমন হইয়াছিল সেই বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি সুললিত

ইংরাজীতে একখানি অভিনব ডাইরী রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'Nine Ideal Indian Woman' গ্রন্থে সুনীতি দেবী ভারতীয় মহিলাদের নয়টি চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। চরিত্রগুলি হইল সতী, সুনীতি, শকুন্তলা, সাবিত্রী, শৈব্যা. সীতা, প্রমীলা, দময়ন্তী ও উত্তরা। করুণ-রস ও বীররসের চরিত্রগুলিই তিনি এখানে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ভারতীয় বীর চরিত্র ও গাথা বিশ্ব-দরবারে তুলিয়া ধরিবার মানসিকতায় পুষ্ট হইয়া তিনি আরও কয়েকখানি চরিতকথা ইংরাজী ও বাংলায় প্রকাশ করেন। প্রতিটি গ্রন্থের ছবিও সু-অঙ্কিত। ধর্মকথা, চরিতকথা, বীরত্বকথা তিনি যেমন রচনা করিয়াছেন তেমনি হাস্যরস বা রূপকথার দরবারেও তিনি প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার 'Indian Fairy Tales'* একটি অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁহার রচিত ছোটদের মনোরঞ্জনকারী আর একখানি বই হইল—"The Bengal Dacoits and Tigers".

অসামান্য প্রতিভাময়ী সুনীতি দেবী ১৯৩২ সনের ১০ই নভেম্বর বাঁচিতে দেহত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার চরিত্র-মহিমায় ভারতীয় নারী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি কোচবিহার রাজ পরিবারের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য-সাধনার নবজাগরণের 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের' উদ্গাতা হিসাবে অমর হইয়া আছেন।

সুনীতি দেবীর চিঠি

অতীত কালের সাক্ষী হিসাবে মহারাণী সুনীতি দেবীর চিঠিগুলি মূল্যবান সন্দেহ নাই। এইখানে কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত সুনীতি দেবীর কয়েকখানি পত্র তুলিয়া ধরা হইল : পত্রগুলির গভীরে প্রবেশ করার পূর্বেই কেদার বাবুর কিছু পরিচয় তুলিয়া ধরিলাম। কোচবিহারে ব্রাহ্ম আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার কথা স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া যাইবে।

কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদি নিবাস হাওড়া জেলার ভাটরা গ্রামে।. জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। কেদার বাবু এবং সুসাহিত্যিক জানকীবল্লভ বিশ্বাস বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রথম জীবনে চাকুরীর খোঁজে কোচবিহারে আসেন এবং নিউটাউন এলাকায় ভাড়া বাড়ীতে একত্রে কিছুদিন বসবাস করেন। তাহার পর দুইজনেরই কোচবিহার রাজসরকারের অধীনে চাকরী হয়। কোচবিহারে আসার পর কেদার বাবু

* সম্প্রতি এই বইটি 'ভারতের রূপকথা' নামে বর্তমান লেখক কর্তৃক অনূদিত হইয়া অণিমা প্রকাশনী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহারাণী সুনীতি দেবীর সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। ছেলেবেলা হইতেই সেবামূলক কাজে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। গুণের পূজারী সুনীতি দেবীও তাঁহাকে এই বিশেষ গুণের জন্য ভালবাসিতে আরম্ভ করেন এবং কিছুদিন পরেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণের স্বীকৃতি স্বরূপ কিছু দিনের মধ্যেই তিনি মহারাণী সুনীতি দেবীর কাছে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাহার পর হইতে আজীবন ব্রহ্ম কৃপালাভে আত্ম নিবেদন করেন। সুনীতি দেবী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বিলাতে থাকার সময়ে মহারাণীর কখন কি দরকার তাহা কেদার বাবুকে লিখিতেন। সংকলিত চিঠিগুলি পড়িলেই আমরা তাহার বহু উদাহরণ দেখিতে পাই। কেদার বাবু কলিকাতায় গেলে "লিলি কটেজেই" থাকিতেন। ব্রাহ্ম ধর্ম রাজ ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর দরবারে ব্রাহ্ম সমাজের জন্য বিশেষ আসন ছিল। কেদার বাবু দরবারের সময় নির্ধারিত বিশেষ পোষাক পরিচ্ছদে উপস্থিত থাকিতেন। কেশবচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের পত্নীর মৃত্যুর পর অশ্রুমতী সরকারকে ব্রাহ্ম মতে তিনি বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর তাহার নামেই "করুণা কুটির" তৈয়ারী করেন। সেই বাড়ী ছাড়িয়া বর্তমানে যেখানে বাড়ী তৈয়ারী করেন তাহা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর নামানুসারে "অশ্রু কুটীর" রাখেন।

নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ও সম্পাদক দুইটি ভিন্ন পদ। আচার্য ছিলেন বেতন ভুক্ত। কোচবিহার ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকদের মধ্যে গজেন্দ্রনারায়ণ, ভিক্টর নিতেন্দ্রনারায়ণ, মনোরথধন দে, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সম্পাদক পদে আছেন কেদার বাবুর পুত্র বিনীত কুমার মুখোপাধ্যায়।

১৯৩০ সনে কেদার বাবু ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিনীতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেদার বাবু ব্রাহ্ম সমাজের গুরু দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বহু সেবামূলক কাজের সঙ্গেও ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন। পারিবারিক কাজের চাইতে সেবামূলক কাজেই তাঁহার উৎসাহ ছিল বেশী। অনাথ বিধবা মহিলাদের জন্য 'মাতৃমঠ', তাহার পর অনাথদিগের হাতের কাজ ইত্যাদি করিয়া স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য অনাথ আশ্রম স্থাপন তাঁহার কাজ। নিরুপমা দেবী ও তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া 'সেবিকা ভাণ্ডার' গড়িয়া তোলেন। তিনি

ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। প্রতিষ্ঠানটি এখনও বর্ত্তমান। ইন্দিরা দেবী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও সুনীতি দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন তিনি। বেসরকারী আরও একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বও তিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। ১৯৫১ সনের ৪ঠা অক্টোবর তিনি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এই হিসাবে ১৮৭৯ সনের কোন এক সময়ে তাঁহার জন্ম হয়। অশ্রুমতীর গর্ভে পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। এমনিভাবে ১৯৩৯ সনের ৬ই মে বোলপুর শান্তিনিকেতনের আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এইখানে আসিয়া সমাজ মন্দিরে ভাষণ দেন। ঐতিহাসিক কালিদাস নাগও এই মন্দিরে ভাষণ দেন। বর্ত্তমান সম্পাদক বিনীতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৫৫ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী সুনীতি দেবীর ভগ্নী ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবীর নিকট কলিকাতায় ময়ূরভঞ্জ ভবনে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীও ১৯৫৬ সনের ২৪শে অক্টোবর সুচারু দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মহারাণী সুনীতি দেবী সম্পর্কে পূর্বে কিছু আলোচনা থাকায় এই অধ্যায়ে আর পুনরাবৃত্তি করিলাম না। সংগৃহীত এই চিঠিগুলি তাঁহার শেষ জীবনের বলিয়াই মনে হয়। চিঠির মধ্যে মাস এবং তারিখ থাকিলেও কোন সন তিনি লেখেন নাই। এমত অবস্থায় সন নির্ণয় করা কষ্টকর। তবে চিঠির কিছু খামের সীলমোহর দেখিয়া সন নির্ণয়ের চেষ্টা করিলাম। সংগৃহীত চিঠিগুলি আমার দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে ১নং চিঠি ১৯২৮ সন, ২নং চিঠি ১৯৩০ সন, ৩নং চিঠি ১৯৩০ সন, ৪নং চিঠি ১৯৩০ সন, ৫নং চিঠি ১৯৩০ সন এবং ৬নং চিঠি ১৯৩১ সনে লেখা বলিয়া মনে হয়। এই চিঠিগুলির মধ্যে রাজপরিবারের কথা বিশেষ না থাকিলেও ব্রাহ্ম সমাজের বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি নিয়মিত খোঁজ-খবর লইতেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজমাতা হিসাবে তিনি বেশীদিন কোচবিহার রাজপ্রাসাদে থাকিতে পারেন নাই। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে না জড়াইয়া তিনি বাইরে বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন. তাঁহার জন্য রাজদরবার হইতে অর্থও মঞ্জুর করা হয়। রাজ্যের বাইরে থাকিলেও এখানকার প্রজাদের সুখ-সুবিধার কথা তিনি চিন্তা করিতেন। একজন রাজমহিষীর পক্ষে এইরূপ উদারতা বিরল দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে হয়। চিঠিগুলির মধ্যে সুনীতি দেবীর ব্যক্তিগত রুচির অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

তাঁহার পছন্দমত খাদ্যগুলির নাম শুনিলে অবাক হইতে হয়। কেদার বাবুর সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকার জন্যই তিনি অকপটে মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক চিঠিতেই দোয়ারণী অর্থাৎ সেবিকাদের তিনি খোঁজ খবর লইয়াছেন। ব্যক্তি পরিচয় সবগুলি দেওয়া সম্ভব হইল না। যতটুকু সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা তুলিয়া ধরিলাম।

আইচ—নবীন আইচ, কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য, যোগীন—গভঃ প্রেসের কর্মী, বোচ, সোনাই, রাধিকা, সরোজিনী—দোয়ারণী (সেবিকা), বাদল—সেবক, জগৎবল্লভ বিশ্বাস—রাজকর্মচারী, দীনেশ—দীনেশানন্দ চক্রবর্তী—ডাক্তার, মনোরথধন দে—ব্রাহ্ম, ভিক্টোরিয়া (বর্তমান এ. বি. এন. শীল) কলেজের অধ্যক্ষ. কমল—গজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র, রাধিকা ব্যানার্জী—বেতনভুক গায়ক। বিষ্ণু চক্রবর্তী—ব্রাহ্ম মন্দিরের বেতনভুক গায়ক।

একদিন কথা প্রসঙ্গে সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার বলেন যে, তাঁহার দিদিমা কুমুদেন্দু চৌধুরীর সহিত মহারাণী সুনীতি দেবীর সুসম্পর্ক ছিল। সুনীতি দেবী জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া বিদেশ হইতে কেদার বাবুর মাধ্যমে কুমুদেন্দু দেবীর নিকট একখানি একতারা পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন—আমার জীবন এবং তাহার সুর এই প্রতীকে পাওয়া যাইবে।

পত্র নং—১

18 Neo Cavendich Street
Nobember 28th.

কেদার,

সপরিবারে আশীর্ব্বাদ লও।

তোমার পত্র সহ হিসাবাদি পাইলাম। সোমবার সন্ধ্যার সময় সেই পবিত্র তীর্থে তোমাদের সকলের সঙ্গে এ আত্মা মিলিত থাকে। ইহ ও পরলোকের ব্যবধান ভেদ করিয়া সে তীর্থ বিরাজিত। আইচ মহাশয়কে আমার প্রণাম দিও। তাঁহার মেয়েটি কোথায়? রাধিকাকে আশীর্ব্বাদ, তাহার চিঠির উত্তর আজও দিতে পারিলাম না সেজন্য দুঃখিত। বিষ্ণুর গান শুনিতে ইচ্ছা করে।

দোয়ারণীদের আশীর্ব্বাদ, তাহারা ভাল আছে শুনিয়া আহ্লাদ হইল। জল ও আলো কি সহরে হইয়াছে?

যোগীন বাবু কেমন আছেন? ফিরিয়া আসিয়াছেন কি? জগত বাবু আশাকরি একটু ভাল আছেন।

তরবেন্দ্রের ছেলে কি করে? তাহার কি সন্তানাদি হইয়াছে? বোচকে বলিও খাগরাবাড়ীর রাজগণদের সংবাদাদি যেন একটু দেয়।

সুনীতি কলেজে যে দুর্গাদাস বাবুর নাত্‌নী teacher হইয়া আসিয়াছে, এখনও ত আছে, না চলিয়া গিয়াছে? এবার শীতটা আশাকরি খুব সাস্থ্যকর হইবে। প্রজারা বড়ই ভুগিয়াছে। সাগরদীঘির জলটা কেমন?

ভগবান তোমাদের মঙ্গলে রাখুন। নববিধানের জয় ঘোষণা কর।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
সুনীতি দেবী

পত্র নং—২

.........Hotel
January 22nd.

আশীর্ব্বাদ পাঠাইতেছি। তোমরা উভয়ে গ্রহণ কর। আশাকরি সপরিবারে ভাল আছ এবং তুমি সবল ও সুস্থ হইয়াছ।

আমার সাস্থ্য ভাঙ্গিয়াছে। ডাক্তরের ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছি। কতদিন থাকিতে হইবে জানি না।

নববিধানের জুবলি উৎসবে সকলের সঙ্গে যে মিলিতে পারিলাম না ইহাই বড় কষ্টের। অনেক আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই যাওয়ার সুবিধা করিতে পারিলাম না। যে রকম শরীরের অবস্থা জানি না ভবিষ্যৎ কি ভাবে দাঁড়াইয়াছেন?

শুনিলাম সাধারণ সমাজের লোক ৮ই জানুয়ারির জন্য নিমন্ত্রিত। যদি আচার্যদেবের বিশ্বাসী শিষ্য হয় ভালই।

তুমি সোমবারে আশ্রমে যোগদান কর না, নিয়মিত রূপে ইহা কি সম্ভব? সকল কথা পরিষ্কার করিয়া লিখিলে সুখী হইব।

টিনের ঘরের কথা সাহিত্য সভার সেক্রেটারিকে লিখিলাম। তাঁহারা বাড়ীটি লইলেন ভালই হইল। ৩০০ টাকায় বিক্রয় হইবে। এখন তুমি হিসাব পত্র কমলকে পাঠাইও। আমি কবে ফিরিব জানি না। কমল যদি অনুগ্রহ করিয়া দেখেন ভাল হয়।

আইচ মহাশয় যদি শৈলেন বাবুর বাড়ী কিনিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিজের হয়। "Sunity Terrace"-এর বাড়ীগুল(?) কি হইল ?

সোনাই প্রভৃতি দোয়ারণীদের বলিও তাহাদের কথা সর্ব্বদা মনে হয়। একটু ভাল হইলে দেশে ফিরিতে ইচ্ছা।

তুমি চাউল এই চিঠি পাইবামাত্র পাঠাইও। আর দোয়ারণীগণ যদি তেঁতুল রাখিয়া থাকে (বিচি ফেলিয়া) তাহাও পাঠাইও। টিনের ঘরের দাম ৩০০ টাকা তোমার কাছেই দিতে বলিয়াছি।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
সুনীতি দেবী

পত্র নং—৩

Hotel Rembrandt
London
S. W.
7.
March 18th.

অনেক আশীর্ব্বাদ সস্ত্রীক লও। আশাকরি সপরিবারে ভাল আছ।

চাউল যাহা পাঠাইতেছ সময়মত পাইতেছি। এই চিঠি পাইয়া মুসুর দাল এবং তেজপাতা ও লঙ্কা যদি পাঠাইয়া দাও সুখী হইব।

বিমল এবং অন্য সকলে আশাকরি বিধান পল্লীর ভাড়া উচিত এবং নিয়মমত দিতেছেন।

এবার উৎসবে কেহ কি যাইবেন ? মহেশ বাবু গেলে ভাল হয়। আর একটি গানের লোক যদি পাইতে পার উপকৃত হইব।

আশ্রমে কি নূতন ফুল দিয়াছ ?

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
সুনীতি দেবী

পত্র নং—৪

12/A Stoane Avenue
June 25th.

আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি, দুই জনে গ্রহণ কর। আশাকরি সপরিবারে ভাল আছ। তোমার পত্রাদি সময় মত পাইতেছি।

এখানে তেঁতুল ও সুপারি পাঠাইবার আর দরকার নাই। মধ্যে ২ চাউল পাঠাইও। কিছু কাঁঠাল বিচি পাঠাইলে আহ্লাদ হইবে।

আমার নভেম্বর মাসে দেশে পঁহুছিবার কথা। ক্রমে ২ একটু বল পাইতেছি। ইচ্ছা কুচবিহারে গিয়া কিছু দিন বাস করি।

আশ্রম তীর্থে ফুলগুলি বেশ ফুটিয়াছে ত? নূতন ফুল কি কিছু দিয়াছ? বিধান পল্লীর রাস্তাটি মেরামত করিয়াছ কি? অত্যন্ত neglected অবস্থায় ছিল।

'সাহিত্য-সভা' এ রকম ব্যবহার করিবে জানিলে আমি সম্মত হইয়া তাহাদের চিঠির উত্তর দিতাম না।

দোয়ারাণীদের আশীর্ব্বাদ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
সুনীতি দেবী

পত্র নং—৫

Melcombe house.
188, Ewell Road
Surbiton.
October 6th.

দুই জনে অনেক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আশাকরি তোমার স্ত্রী এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল হইয়াছেন।

তোমার পত্র পাইলাম। সোনাইও লিখিয়াছে। কেন যে আবার কয়লার গুঁড়(া) এত দিন পরে কুচবিহার হইতে পাঠাইয়াছে। ইহার কত আগে সরোজিনী অন্য জিনিসের সঙ্গে পাঠাইয়াছে। সোনাইকে বলিও তারই বাক্স যাহার জন্য এতবার লিখিয়াছি তাহা পাইয়াছি। কোথায় যে ছিল কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখানেও লোকজনের জন্য কষ্ট পাইতে হয়। যা হোক্ সোনাইকে ইহা জানাইও। সোনাই যদি কেবল বলিত বাদল "ঢেউ তোলা" বাক্সে বন্ধ করিয়াছে। গোল হইত না। তুমি বোচকে বলিও যদি সে আমলকি কি জলপাইর আচার করিয়া পাঠাইয়া দেয়। সোনাই কি কাঁঠাল বিচি শুকাইয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে পাঠাইও, এবং গাছের সুপারি যেন তাহারা কুচবিহারীদের মত কাটিয়া পাঠায়। আর তেজপাতা অনেক চাই। ধুইয়া

মুছিয়া শুকাইয়া একটা পাতলা ব্যাগে সিলাই করিয়া পাঠাইও। তুমি চাউল আর এত বড় ভারী বাক্সে পাঠাইও না।

আশাকরি যোগীন বাবু শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবেন। জগত বাবু কেমন আছেন? কুমার তরবেন্দ্রনারায়ণ যে পরলোকে গিয়াছেন শুনি নাই। কি হইয়াছিল? অশ্বিনীকে একখানা চিঠি পাঠাইতেছি তাহাকে দিও।

রাধিকা একখানি সুন্দর চিঠি লিখিয়াছে। পড়িতে বড় ভাল লাগিল। সকলে বাঁচিয়া থাকুন। কুচবিহারে যাঁহারা নববিধানের সেবা করিতেছেন ভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদ তাঁহারা লাভ করিবেন, ইহা সত্য। দীনেশ বেশ ভাল ডাক্তর তোমার স্ত্রীকে এত যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিলেন আনন্দ হইল।

আইচ মহাশয়কে আমার প্রণাম দিও। আমার শরীর যেমন আশা করিয়াছিলাম সেরূপ সবল হয় নাই, তবে এ বয়সে জীবনের এ অবস্থায় সকলই দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
সুনীতি দেবী

পত্র নং—৬

56, Pont Street
S. W. 1.
Aug : 20 এ

Tel. Stoane 6329

অনেক আশীর্ব্বাদ পাঠাইতেছি সস্ত্রীক লও। আশাকরি সপরিবারে ভাল আছ। তোমার চিঠিগুলি সময়মত পাই জানিবে।

কুচবিহারের অবস্থা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইতেছে। আর্থিক কষ্ট, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব সকলই একসঙ্গে আসিয়াছে। এত লোকের চাকরি গেল! প্রাণটা কাঁদিয়া উঠে। কাছে থাকিলে সহানুভূতি ও একটু দুঃখও জানাইতে পারিতাম। প্রজারা কাঁদিতেছে আমি এ বিদেশে ইহা ভাবিতেও ভাল লাগে না। কেবল প্রার্থনা করি, মা লক্ষ্মীর করুণায় রাজ্যের দুর্দ্দিন যেন শীঘ্র দূর হয় এবং অচিরে লক্ষ্মীশ্রী প্রকাশিত হয়।

টিনের বাঙ্গলা যদি বিক্রয় হয় মনরথকে বলিও দেখিয়া শুনিয়া, কাগজপত্র-গুলি ঠিক করিয়া সই দিয়া যেন টাকা লয়েন। তিনি যদি সম্মত না হয়েন,

তাহা হইলে কলিকাতায় কমলকে দিয়া সই করিয়া লইও। টাকা পাইলে পুরাতন দেনা (মন্দিরের) শোধ দিও। আশাকরি বাৎসরিক Budget মন্দিরের, আর (Council) কম করিবে না। বোচ ও সোনাইয়ের অসুখ করিয়াছিল শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আশাকরি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে। অন্য দুয়ারণীরা দুইটি কাঁঠাল বিচি কি অল্প একটু তেঁতুল পাঠাইতে পারিত। এখন আর দরকার হইবে না।

আইচ মহাশয়কে প্রণাম জানাইও। মন্দিরের গান প্রভৃতি কেমন হইতেছে। রাধিকাকে আশীর্ব্বাদ দিও।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
সুনীতি দেবী

নিরুপমা দেবীর চিঠি

এই অধ্যায়ে মহারাণী সুনীতি দেবীর পুত্র ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের পত্নী নিরুপমা দেবীর কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একখানি চিঠি তুলিয়া ধরিতেছি। নিরুপমা দেবীর জন্ম ১৮৯৫ সনে, পিতা প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মতিলাল গুপ্ত। উত্তর প্রদেশের হোসেঙ্গাবাদে জন্ম। প্রথম স্বামী ভিক্টরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তিনি পরে শিশিরকুমার সেনকে বিবাহ করেন। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তিনি 'পরিচারিকা' নব-পর্যায় প্রকাশ করেন এবং ধূপ, গোধূলি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। কলিকাতায় ব্রাহ্ম মতে ভিক্টরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯৮৪ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর ৮৯ বৎসর বয়সে নদীয়ার সাহেবগঞ্জে নিজ সেবাশ্রমে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বর্তমান চিঠিখানি ব্যক্তিগত, কিন্তু তাহার মধ্যে রাজ্যের কাজ কর্মের বিষয়ে তাঁহার মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ এবং অন্য অনেকের খোঁজ খবর লইতেছেন দেখা যাইতেছে।

ওঁ

Woodlands.
8, Alipore Road.
Calcutta.
8th July, 17.

মাননীয় কেদার বাবু,

আমি আপনার পত্রখানি ও টেকনিকেলের বিল পাইয়াছি। যেখানে নাম সহি করিতে ভুল হইয়াছিল সেখানটায় সহি করিয়া শৈলেন ঘোষের কাছে উনি পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি cash করিয়া আপনাকে টাকা দিবেন।

ওঁকে যে কথা বলিতে বলিয়াছিলেন বলিয়াছি। নগেন বাবু নিজেই ওঁকে খুব বড় চিঠি লিখিয়াছেন। মনোরথ বাবুরা কি গিয়াছেন? কৈলাশ বাবুর মেয়ে এখন কোথায়? তাহা জানাইবেন। টেকনিকেলের কাজ আবার কবে আরম্ভ হইবে? মনোরথ বাবুর স্ত্রী আমায় লিখিয়াছিলেন তিনি সুহাসিনীর সহিতই কাজ করিবেন, তবে যেন তাহাই ব্যবস্থা হয়। দু'জনে ফিরিলে যেন আবার স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়, তারপর আপনার স্ত্রী যখন সুস্থ ও সবল হইবেন তখন তিনিও করিবেন।

আশাকরি আপনারা সব ভাল আছেন। ছোট বাচ্ছা ও খোকা কেমন? আপনার স্ত্রীকে আমার ভালবাসা দিবেন।

ইতি
বিনীতা
শ্রীনিরুপমা দেবী

[কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক শ্রীবিনীতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী লীলা মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে চিঠিগুলি সংগৃহীত।]

রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ

(১৯১১-১৯১৩)

পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়, তাঁহার নাম রাখেন কেশবচন্দ্র সেন। রাজকুমার প্রথমে গৃহশিক্ষকের নিকট পড়াশোনা করেন, তাহার পর ১৮৯৩ সনে তিনি আজমীর মেয়ো কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। সেখান হইতে ইংলণ্ডে

গমন করিয়া প্রথমে ইটন বিদ্যালয়ে ও পরে অক্সফোর্ড ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে প্রবেশ করিয়া পড়াশোনা করেন, এই সময়েই তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইয়োমেনারী নামক সৈন্যদলে কমিশন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যভার গ্রহণের পর তিনি যে ঘোষণাপত্রটি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার রাজ্যশাসন বিষয়ে সুচিন্তিত ভাবনার পরিচয় আমরা পাই। উক্ত ঘোষণাপত্রের কিয়দংশ এইখানে তুলিয়া ধরা হইল—

"যে বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীদ্বারা রাজ্যের এবংবিধ সন্তোষপ্রদ উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা তদবস্থ রহিবে; কিন্তু মদীয় প্রজাবর্গের কল্যাণার্থ যদি কোন সময়োচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সে প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত করা যাইবে। মহনীয়-কীর্ত্তি মদীয় জনকের শাসন সময়ে একটি ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহাতে সর্ব্বপ্রকার অবস্থাপন্ন প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ভুক্ত জনমণ্ডলী হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইত। রাজ্যের প্রকৃতিবৃন্দের তদুপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই এই প্রতিনিধি-নির্বাচন প্রণালীর মঙ্গলজনক অধিকার কতক প্রসারিত করিয়া দেওয়া যাইবে। ইহাই আমার অভিপ্রায়।

"পরম ভক্তিভাজন মদীয় পিতৃদেব রাজ্যের প্রকৃতিবৃন্দের শিক্ষাবিধিকে নিতান্ত নিজের জিনিষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং ইহার উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাজ্যের সেই শিক্ষাবিধি বিশেষতঃ প্রাথমিক, নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষাবিধি আমারও তাদৃশ ঘনিষ্ঠ প্রীতি ও মনোযোগ লাভ করিতে থাকিবে। স্বর্গীয় পিতৃদেব এই প্রাথমিক, নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষা যাহাতে এই রাজ্যে আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, তাহা অতীব আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন; কিন্তু এই বিস্তৃতি-সাধন রাজ্যের ধনাগমের উপর নির্ভর করিতেছে।"

মহারাজ এইরূপ ভাবে স্বর্গত পিতৃদেবের প্রবর্তিত শাসন-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বিশেষ যোগ্যতা সহকারে রাজ্য শাসন আরম্ভ করেন।

রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে যে ঘোষণাপত্রটি প্রচার করা হইয়াছিল তাহা নিম্নরূপ—

কর্ণেল হিজ্‌ হাইনেস্ মহারাজ সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের স্বর্গারোহণে হিজ্‌ হাইনেস্ শ্রীশ্রীমহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজ্যভার গ্রহণ প্রখ্যাপক কোচবিহার রাজসভার ঘোষণাপত্র।—

"১৯১১ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর, সোমবার গৌরবোজ্জ্বল মহিমমণ্ডিত পুণ্যস্মৃতি মহারাজ কর্ণেল হিজ্‌ হাইনেস্ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের স্বর্গারোহণে

কোচবিহার রাজ্যের সিংহাসন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীমান্ মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ মহোদয়ে বর্ত্তিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে বৈধ ও একমাত্র রাজ্যাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণ জ্ঞাপনার্থ কোচবিহার রাজসভা এতদ্বারা প্রচার ও ঘোষণা করিতেছে যে, শ্রীশ্রীমান্ মহারাজকুমার কোচবিহার রাজ্যের রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং হিজ্ হাইনেস্ মহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কোচবিহার রাজ্যপদের একমাত্র ও বৈধ মহারাজ। এক্ষণে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে প্রজাপালন করিতে থাকুন।"

রাজসভার প্রতিনিধি-সভাপতির নিকট ইংলণ্ডস্থ "বেক্স্‌হিল-অন-সি" নামক নগর হইতে শ্রীশ্রীমহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সৌষ্ঠবান্বিত যে তড়িত-বাহিত আদেশ আসিয়াছে তাহা নিম্নে অনুবাদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল :—

"সপ্তাহ কাল আফিসাদি বন্ধ করিবেন। নিদারুণ শোকবার্ত্তা প্রচার করিয়া অতিরিক্ত গেজেট বাহির করিবেন। সৈন্য ও পুলিশ বিভাগ শোক চিহ্ন স্বরূপ "ক্রেপ" ধারণ করিবে। পুনরাদেশ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন বিভাগে যে যে বন্দোবস্ত বর্ত্তমান আছে তাহা প্রচলিত থাকিবে।"

রাজসভা, কোচবিহার	A. W. Dentith
২রা অক্টোবর, ১৯১১	রাজসভার প্রতিনিধি-সভাপতি

দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত দীর্ঘ দিন যোগ্যতার সহিত দেওয়ান পদে কাজ করিয়া ১৯১১ সনের ১লা নভেম্বর অবসর গ্রহণ করেন এবং তৎকালীন রেভিনিউ অফিসার প্রিয়নাথ ঘোষ দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। কালিকাদাস দত্ত ১৮৯৬ সনে নাবালক রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে দেওয়ান পদে যোগদান করিয়া দীর্ঘ ৪২ বছর অসাধারণ দক্ষতার সহিত কাজ করেন। তাঁহার চেষ্টায় রাজ্যের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকা হইতে ২৬ লক্ষ টাকায় ওঠে। ১৯১৫ সনে তিনি দেহত্যাগ করেন।

১৯০৫ সনে যুবরাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ মোহনবাগান ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন। রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি সেই সময়ে নববিধান ব্রাহ্ম মন্দিরের জন্য রাজ তহবিল হইতে ৫০০ টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহারাণী গায়ত্রী দেবী লিখিত বই হইতে জানা যায় যে রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ একজন ইংরাজ অভিনেত্রীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপরিবারের অমত থাকায় সে বিবাহ আর হয় নাই।

দুঃখের বিষয় তিনি অল্পকাল রাজত্ব করিয়াই অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং অবিবাহিত অবস্থায় ১৯১৩ সনের ১লা সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন।

জিতেন্দ্রনারায়ণ
(১৯১৩-১৯২২)

অবিবাহিত অবস্থায় রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে নৃপেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণ ১৯১৩ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯ ঘটিকায় কোচবিহারের সিংহাসনে বসেন। কোচবিহার রাজপ্রাসাদের সামনে এই অনুষ্ঠান হয়। ভ্রাতার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেই লণ্ডনে বরোদারাজ সয়াজীরাও গাইকোয়াড়ের সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা ইন্দিরা দেবীর সহিত ১৯১৩ সনের ২৫শে আগষ্ট তাঁহার বিবাহ হয় এবং এই আনন্দ সংবাদে পরের দিন কোচবিহারের সমস্ত অফিস, কাছারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। কোচবিহার গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশ করা হয়। বরোদার গাইকোয়াড়ের একমাত্র কন্যা ছিলেন রাজকুমারী ইন্দিরা দেবী। ভারতীয় রাজকুমারীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে স্কুলে গিয়া লেখাপড়া করেন এবং পরে বরোদা কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হন। গোয়ালিয়রের মহারাজার সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর বিবাহের কথা প্রায় পাকা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইন্দিরার অমত থাকায় বিবাহ হয় নাই। গোয়ালিয়রের মহারাজার প্রথম মহিষীর গর্ভে কোন সন্তান না থাকায় তিনি দ্বিতীয়বার ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। কোচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর বিবাহ বিষয়েও নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু পরে এই বিবাহ সকলে মানিয়া লয়।

জিতেন্দ্রনারায়ণের পুত্র-কন্যা

পুত্র—১। জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ—জন্ম ১৫ ডিসেম্বর, ১৯১৫
২। ইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণ—জন্ম ৬ জুলাই, ১৯১৮
কন্যা—১। ইলা দেবী—জন্ম ১ অক্টোবর, ১৯১৪
২। গায়ত্রী দেবী—জন্ম ২৩ মে, ১৯১৯
৩। মেনকা দেবী—জন্ম ৫ জুলাই ১৯২০

ইলা দেবী, গায়ত্রী দেবী, মেনকা দেবীর প্রাথমিক লেখাপড়ার সূচনা হয়

শান্তিনিকেতনে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পূর্ব-সুসম্পর্ক পরবর্তী কালেও অব্যাহত থাকে। ইলা দেবী ভাল ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন। পাইলট হিসাবেও তাঁহার নাম ছিল। তিনি হাস্য-কৌতুক প্রিয় ছিলেন এবং রাজবংশী ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। ১৯৩৬ সনের ১২ই জুন রাজকুমারী ইলা দেবীর সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজা রমেন্দ্রকিশোর দেব বর্মার মহা ধুমধামে বিবাহ হয়। ত্রিশ বৎসর বয়সে ইলা দেবীর হঠাৎ মৃত্যু হয় আগরতলায়। এই মৃত্যু কোচবিহারবাসী এবং রাজপরিবারের কাছে ছিল বজ্রাঘাতের মত। তিনি তিন সন্তানের জননী ছিলেন। আগরতলায় তিনি নারী এবং শিশু কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজের সহিত যুক্ত ছিলেন।

মেনকা দেবী ছিলেন শান্ত স্বভাবের। কনিষ্ঠা মহারাজকুমারী শ্রীমতী মেনকা দেবীর বিবাহ হয় ১৯৪২ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী দেওয়ান রাজ্যের (জুনিয়ার) শ্রীশ্রীমন্ যুবরাজ ক্যাপ্টেন যশবন্তরাও ভাউসাহেব পাওয়ার মহোদয়ের সহিত।

শোনা যায় গায়ত্রী দেবী মানত করিয়া ভাইয়ের নামে মন্দিরে পূজা করিতেন।

ইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণ—১৯৩৭ সনে দেরাদুন হইতে সেনা বিভাগের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বিষয়েও পড়াশোনা করেন। সেনা বিভাগের পরীক্ষায় তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। ভারতীয় সেনা বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। মাদ্রাজের গোদাবরী এলাকার পৃথাপুরমের রাজ-কন্যা কমলা দেবীর সহিত ১৯৪১ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে তাঁহার বিবাহ হয়। রাজকার্যে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫১ সনে দার্জিলিং-এ ঘরে আগুন লাগার ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু সংবাদে জিতেন্দ্রনারায়ণ শোকাভিভূত হইয়া যে তার বার্তা পাঠাইয়াছিলেন তাহা এখানে তুলিয়া ধরিতেছি—

"নিদারুণ শোকবার্ত্তা প্রচার করিয়া অতিরিক্ত গেজেট বাহির করিবেন। পুনরাদেশ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে যে বন্দোবস্ত বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রচলিত থাকিবে। কর্ম্মচারিগণ একমাস কাল পর্য্যন্ত পূর্ণ শোক চিহ্ন ধারণ করিবে। সপ্তাহ কাল আফিসাদি বন্ধ করিবেন।"

শ্রীশ্রীমান্ মহারাজ ভূপ বাহাদুর নিম্নের এই সানুকম্প অতিরিক্ত সংবাদ তাঁহার প্রজাপুঞ্জের অবগতির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন :

"আমার পরম প্রিয় অগ্রজের মৃত্যুতে আমি যে কেবল ভ্রাতৃ স্নেহ হইতে

বঞ্চিত হইয়াছি তাহা নহে, একজন প্রিয় বন্ধুর স্নেহ এবং অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। আমার মহিমমণ্ডিত সুখ স্মৃতি যুক্ত পিতার মৃত্যুর পর, এত শীঘ্রই হঠাৎ আমার এই অপূরণীয় ক্ষতিতে, আমার কর্ম্মচারিগণ ও প্রজাপুঞ্জের সহানুভূতিই আমার সান্ত্বনা। আমার উপর যে মহান গুরুভার আসিয়া পড়িয়াছে তাহা আমি সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতেছি। রাজ্যের সেবায় আমার জীবন উৎসর্গ করিবার অভিলাষে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর সমীপে আমার এই প্রার্থনা যে, সুশাসন রক্ষা করিতে এবং দয়ার সহিত আইন ও বিচার কার্য্য সুনির্ব্বাহ ও সুসম্পন্ন করিতে তিনি আমাকে শক্তি প্রদান করুন। 'ক্রোমার' হইতে প্রেরিত তড়িত-বার্তা আমি দৃঢ়তর করিলাম।"

১৮৮৬ সনের ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় জিতেন্দ্রনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন আর ১৯২২ সনের ২০শে ডিসেম্বর লণ্ডনে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। কোচবিহারে হিন্দু কায়স্থ মতে ১৯২৩ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী জিতেন্দ্রনারায়ণের পারলৌকিক ক্রিয়াদি করেন মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ। জিতেন্দ্রনারায়ণ ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসিতেন। যে কোন সময়ে কোচবিহারের রাস্তায় একাকী বাহির হইয়া রাস্তার ছেলেমেয়েদের রাজবাড়ীতে আনিয়া গান-বাজনা হাসি-তামাসা করিতেন এবং পরে মিষ্টি খাওয়াইয়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দিতেন। এই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে গায়কদের আনিয়া গানের আসর বসাইতেন। যাত্রাগানও তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। জিতেন্দ্রনারায়ণ দেখিতে সুপুরুষ এবং উচ্চতায় ছয় ফুটের উপরে ছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার ছেলেমেয়েরাও পিতার মত লম্বা হন।

এক জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাজা যদি ৩৬ বছরের বেশী বাঁচিতে পারেন তবে তিনি একটী স্মরণীয় অধ্যায় তৈয়ারী করিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ৩৬তম জন্মদিনেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ, রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ এবং জিতেন্দ্রনারায়ণ পর পর এই তিন রাজা বিদেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পৃথিবীতে যে কয়েকজন মহাপুরুষের জন্ম ও মৃত্যু দিন একই, সেই স্মরণীয় তালিকায় মহারাজা জিতেন্দ্র-নারায়ণের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সদাহাস্যময় মুখ প্রজার আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তিনি সকলকে গভীরভাবে ভালবাসিতেন। মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাত করার ব্যবস্থা ছিল অবারিত। তাঁহার আদর্শ ছিল—"চারো দরওয়াজা হামেশা খুলা রহে"। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি যে ভাষণ দেন তাহার কিছু অংশ এইখানে তুলিয়া ধরিতেছি—

"I fully realise", said His Highness, "the magnitude of the responsibility which will for the future rest upon my shoulders and the difficulties which will beset my path in the proper discharge of my duties and in the administration of my State for the benefit of my people. But to assist me I have the great example of my illustrious father whose footsteps I pray that I may be given the strength to follow, so that I may consecrate my life to the Service of my State."

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের দীর্ঘ ২৮ বৎসরের রাজত্ব কালে রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় তিনি কোন কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া যান নাই। কিন্তু সময়ের গতির সঙ্গে অনেক কিছুরই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার কর্মকুশলতার দ্বারা নিজের শাসন দক্ষতা প্রমাণ করেন এবং বহুবিধ প্রজা-মঙ্গলজনক কাজে হাত দেন। ছেলেবেলায় ইটনে দীর্ঘ দিন থাকিয়া লেখাপড়া করার দরুণ মাতৃভাষা শিখিতে না পারিলেও সেইখানকার পরিবেশ তাঁহাকে বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়াও নানাস্থানে ভ্রমণ তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিপূর্ণতা আনার পক্ষে সহায়ক হয়। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি পরিস্থিতি মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সেই সময়ে বিশ্বে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহার প্রভাব কোচবিহারের মানুষকেও প্রভাবিত করিলে তিনি সুপরিকল্পনায় কোচবিহারের প্রিয় প্রজাদের রক্ষায় সচেষ্ট হন। তাঁহার কার্য-কালের মধ্যে জনশিক্ষা বিস্তার এবং শহরের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনাকে তিনি কার্যকরী করেন। এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অট্টালিকা তৈয়ারী করা হয়। হাসপাতালে নার্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে উন্নত ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বিশুদ্ধ জলের অভাব পূরণে তিনি পুষ্করিণীগুলির পুনঃ সংস্কার করেন। শহরে বৈদ্যুতিক আলো এবং টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করেন। পরিকল্পনা করিয়া শহরে সোজা রাস্তা তৈয়ারী করেন। ইহা ছাড়াও সাগরদীঘির উত্তর পাড়ে ১৯২০ সনের ৩রা মার্চ মহারাজা নৃপেন্দ্র-নারায়ণের মার্বেল পাথরের মূর্তি স্থাপন করেন। তিনি রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের নামে কোচবিহারে একটি বোর্ডিং এবং দার্জিলিং-এ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হল স্থাপন করিয়া ভাই-এর প্রতি উপযুক্ত কর্তব্য এবং পিতার প্রতি শ্রদ্ধার স্মারক নির্মাণ করেন। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি বৃটিশ সম্রাটের সাহায্যে

রণনীতিতে ব্যাপক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছোট ভাই হিতেন্দ্রনারায়ণকে পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে রাজ্য স্তরে সুযোগ্য স্থানীয় কর্মী নির্বাচনে কোচবিহার স্টেট সার্ভিস কমিটি গঠিত হয়। তৎকালীন শিক্ষার বাস্তব চিত্র জানার জন্য তিনি একটি কমিটিও নিয়োগ করেন। কোচবিহারের ইতিহাস-চর্চা, প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণ, কোচবিহার সাহিত্য সভার সৃষ্টি এবং স্টেট লাইব্রেরীর উন্নতি সাধন করেন। রাজ্যের শিল্প এবং কৃষি বিষয়ক উন্নতি সাধনে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তাহার সময়েই এই শহরে ব্যাঙ্কিং করপোরেশন গঠিত হয়। জমির স্বত্ব বিষয়ে তাঁহার পিতা ৩০ বছর ধার্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পরিবর্তন করিয়া ৯৯ বছর করেন। ইহা ছাড়াও রাজ্যের কাউনসিল সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯১৬-১৭ সনের বার্ষিক রিপোর্টের এক তথ্যে দেখা যায় যে, এই সময়ে রাজ্যের দেওয়ানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া বিচার বিভাগীয় কাজের তদারকির ক্ষমতাও তাঁহাকে দেওয়া হয়। তাঁহার অতি অল্প সময়ের শাসন কালে প্রজার মঙ্গলের জন্য বহুবিধ উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার অন্তরের বহু ভাবনা ও পরিকল্পনা রূপায়িত হইতে পারে নাই। তিনি কাজ ভালবাসিতেন। কোন কাজকে ফেলিয়া রাখা তিনি পছন্দ করিতেন না এবং সময়-জ্ঞান ও কার্য-সূচি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় কঠোরতা এবং উদারতা দুইটি গুণই তাঁহার মধ্যে ছিল। এই সময়ে ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ কোচবিহার রাজ্যেও আঘাত করিতে থাকে। ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্র বিক্ষোভও হয়। বেশ কিছু আন্দোলক এইখানে আসিয়া আন্দোলন করিতে থাকেন। তখন মহারাজা কঠোর হস্তে সেই আন্দোলন সমূলে ধ্বংস করেন। সেই সময়ে যে সমস্ত লোককে জেলখানায় আটক করা হইয়াছিল, তাহারা তাহাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। কর্তব্য পালনে কঠোরতা এবং উদারতার ফলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নতুন যুগের সূচনা হয়।

কোচবিহার রাজ্যে অসহযোগ আন্দোলনের দুই-একটি ঘটনা দেখিয়া ১৯২২ সনের ৩১শে জানুয়ারী স্টেট কাউনসিলের এক সভায় আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের চরিত্র বিষয়ে কোচবিহার রাজদরবারের মনোভাব পরিষ্কার ভাবে তুলিয়া ধরার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোচবিহার রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের এই

আন্দোলন হইতে দূরে রাখার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যদিও সেই সময়ে এই রাজ্যের আন্দোলনে বিশেষ কোন ঘটনা না ঘটিলেও বৃটিশ শাসিত পার্শ্ববর্তী জেলা রংপুর এবং গোয়ালপাড়াতে ইহার ব্যাপক প্রভাব পড়িয়াছিল। এই আন্দোলন বিষয়ে পর্যালোচনা করিতে মহারাজা জিতেন্দ্র-নারায়ণ অনিচ্ছুক ছিলেন কারণ এই রাজ্যে স্বরাজ বিষয়ে ভাবনা চিন্তার কোন অবকাশ নাই। তথাপি যদি কিছু ঘটে এই আশঙ্কায় ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। যেমন—

১। মাদক দ্রব্য সেবন বন্ধ করার আন্দোলন সম্পর্কে দরবারের অভিমত হইল, এই বিষয়ে তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিবেন।

মদ্য পান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে জনমত গঠন অথবা ধর্ণা সম্পূর্ণভাবে বাধামুক্ত থাকিবে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মাদক বর্জ্জন মানা যাইবে না। এই সব বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসকগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২। খাদির কাপড় ব্যবহার করার বিষয়ে কোন বাধানিষেধ নাই, কিন্তু রাজ্যের কর্ম্মচারীগণ 'গান্ধীটুপি' ব্যবহার করিতে পারিবেন না, কারণ এই রাজ্যের মধ্যে মহারাজা ব্যতীত অন্য কাহারও প্রাধান্য মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে।

যদি কোন স্বদেশী আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক ব্যাজ ধারণ করে অথবা কোন চিহ্ন ব্যবহার করে তবে তাহাকে উহা খুলিয়া ফেলিতে বলা হইবে। যদি সে নির্দ্দেশ মত কাজ না করে তবে রাজ্যের আইন অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩। যদি কোন বহিরাগত এই রাজ্য পর্যটনে আসিয়া অসহযোগ আন্দোলন বিষয়ে কোন উস্কানিমূলক কাজ করিতেছে দেখা যায় তবে তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করা হইবে।

এইরূপ ঘটনা বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম স্থানীয় অধিকারিকে অবগত করান হইবে। তিনি তাহার পর সেই বিষয়টি ফৌজদারী আহিলকারের নিকট পেশ করিবেন, তাহার পর তিনি মহারাজার নির্দ্দেশক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

মহারাজার অনুপস্থিতিতে ফৌজদারী আহিলকার ঘটনাটি স্টেট কাউনসিলের সহ-সভাপতিকে জানাইবেন, কারণ তিনি স্টেট কাউনসিলের কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত।

৪। 'হরতাল' হইলে রাজ্যের রাজস্বের ক্ষতি হইবে। সেইজন্য ইহাকে

কোন ভাবেই মানিয়া লওয়া চলিবে না। যদি কোন দোকান মালিক সরকারী নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া দোকান বন্ধ রাখেন তবে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৫। রাজ্যের মধ্যে যে কোন রাজনৈতিক সভার বিষয়ে খোঁজ খবর রাখা এবং ফৌজদারী আহিলকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। তাহার পর তিনি এই সিদ্ধান্তের তৃতীয় ধারা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ভিক্টোরিয়া কলেজের (বর্তমান এ, বি, এন, শীল কলেজ) ছাত্রদের অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ এবং সেই বিষয়ে মহারাজার মনোভাব সহ তাঁহার শিক্ষা ভাবনা বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ এইখানে তুলিয়াধরা হইল—

Speech delivered by His Highness Maharaja Sir Jitendra Narayan Bhup Bahadur, K. C. S. I. to the students of Victoria College, Cooch Behar, on the 24th of March 1921.

It has been reported to me that there was some trouble among the students of my College here over the movement generally known as Non-Co-operation. Before I say anything on the subject, I want to impress upon you the difference between the Victoria College, Cooch Behar, and Colleges in the British districts in Bengal. The Victoria College was established primarily and entirely for my subjects and those who come and join this College from British India are only allowed to do so if there are vacancies in the classes after admitting my subjects. Besides, those who come from British India get benefits and facilities which I need not mention here, but which they do not get in their native districts.

I shall first address those students whose only connection with my State's the College. I have heard that most of the troubles which arose here, was at the instigation of these students. To them, I would say, if you do not like the system of education which I have adopted for my College,

there is nothing to prevent you from going elsewhere to seek the system you want.

But, you boys, who are my subjects and whose welfare si a cherished object of mine, I was deeply aggrieved to hear that some of you permitted yourselves to be carried away for the moment and join in this movement. You forgot for the time being that you had always come up to me with your grievances and found me ever ready to listen to your representations when they were just and resonable. I have ever wished and always wish, you boys, to look upon me not only as your Ruler but also as a sympathetic friend and one who has your best interests at heart. You are of an age when emotion plays a large part in formulating your action and I was very pleased to learn that it was not long before you realised your mistake and withdrew from the movement. It appears that the wave of enchantment raised with the words "national education" carried you off your legs but how few of you really know what national education means. Do you realise that in these days of cosmopolitanism a nation who tries to keep entirely within itself and refuses to absorb the ideas that are very moment of its life flooding over the barriers, is bound to be isolated and metaphorically starved out of existence? Do you realise that in the rapid march of events in the last few years, the whole world is tending to become one country and nationalism developing into the nationalism of the world? These are very important and necessary questions for consideration and the system of education best suited for you under the rapidly changing conditions as a matter of serious thought but let this not lead you to give up a system which is existing for a system which you cannot define.

I should, however, like to have your ideas as to what you mean by national education,—I mean, not only the subjects which you think should be taught but also the method or system of education. I therefore order that a committee shall be formed consisting of Maharajkumar Victor Nityendra Narayan, Chairman and Nawabzada Abdul Karim Khan, Srijuts Sailendra Ghosh, Dineshananda Chakravorty, Upendra Narayan Sinha, Prafulla Chandra Mustafi and Munshi Shaikatulla Ahmed to report generally on the present-day educational problems and in particular about what you, my subjects, have to say in this matter.

১৯২২ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ জলপাইগুড়ির অন্তর্গত দেবীগঞ্জের জমিদারী পরিদর্শনে যান। দেবীগঞ্জ হইল কোচবিহার অধিপতিদের পূর্বপুরুষের অধিকৃত জমিদারী। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত। এই স্থানে অনুষ্ঠিত দরবারে ভাষণ দানকালে মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ অসহযোগ আন্দোলন বিষয়ে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, "এই তথা-কথিত আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষক পরিবারকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। সকলের রাজনৈতিক মত প্রকাশের অধিকার থাকিতে পারে, তবে আমার কর্ম্মচারীগণ সেইসব করিতে গেলে আইনসঙ্গত হইবে না।" জমি লইয়া বিরোধ বিষয়েও তিনি মত প্রকাশ করেন।

দেবীগঞ্জ দরবার সভায় ভাষণ দান কালে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা সুবিধা এবং ডোমার দেবীগঞ্জের রাস্তার উন্নতি বিষয়ে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে গতি না আনায় জলপাইগুড়ি এবং রংপুর জেলা বোর্ডকে তিনি দায়ী করেন।

শেষে তিনি বলেন যে, "আমি শুধু একজন জমিদার নই। আমি একজন মহারাজা। আমরা একই দেশে বাস করি। আমি বিদেশী নই। আমি আপনাদের আপনজন বলিয়া মনে করি। আপনারাও আমাকে সেই দৃষ্টিকোণে দেখিবেন বলিয়া মনে করি।"

মহারাজা কাজ খুব ভালবাসিতেন। বহির্বিভাগীয় খেলাধূলা তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। শিকারের প্রতিও তাঁহার আকর্ষণ ছিল। তাঁহার সম্মান-জনক উপাধির মধ্যে কে, সি, এস, আই, প্রধান।

জিতেন্দ্রনারায়ণের সাহিত্য চর্চা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা এখন পর্যন্ত তাহার Hello Darjeeling নামে একটি একাঙ্ক নাটক এবং 28th of February ও 4th of May নামে দুইখানি কবিতার বই পাইয়াছি। তাঁহার লেখার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল :—

WITH A LAMP

This little gift I know you
will keep for aye and ever,
(Although 'tis late) to show you
'Tis better late than never.
And as you are my guiding star,
To show where dangers loom ,
So may this small electiic star
Illuminate your room.

—28th of February

MEMORIES

As years roll on and wander by,
We look around in vain
For faces we have seen before.
We look, and look again.
We search for friends of yesterday.
The search is all in vain
Those friends have disappeared, alas !
Where friends will go again.
But, Fate, thy dispensation is
E 'er mercifully set.
In the glamour of the present
The past we all forget.

—4th of May, page-22

NECESSITY

Like water in a desert
To a wanderer, quite parched.
Like a collar that is limp, because
It never has been starched.
Like jungle to a tiger,
Like soil unto a tree,
Like money to a miser,
That 's what you are to me.

—4th of May, page-48

ধর্ম বিষয়েও মহারাজার অনুরাগ ছিল। ১৯১৬ সনের নভেম্বর মাসে মহারাজা সপরিবারে বারাণসীতে যান এবং সেইখানে কোচবিহার রাজ্যের নিজস্ব দ্বিতল বাড়ী হাওয়াখানাতে অবস্থান করেন। এইখানে তাঁহার পূর্ব-পুরুষের নির্মিত কালী মন্দিরে তিনি নিত্য যাতায়াত করিতেন। একদিন মহারাজা রাত্রি নয় ঘটিকার সময় কালী মন্দিরের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় প্রায় ৯০ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল—"হে শ্রদ্ধেয় আগন্তুক, তুমি রাজা বা মহারাজা কিনা কিছুই জানি না। কিন্তু আমি এই দারুণ শীতে খুব কষ্ট পাইতেছি। আমাকে রক্ষার ব্যবস্থা কর" মহারাজা তাঁহার বলিষ্ঠ উক্তি শুনিয়া তখনই একটি দামী কম্বল তাঁহাকে দান করেন।

জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ
(১৯২২-১৯৭০)

পিতার অকাল মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ মাত্র আট বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজা নাবালক থাকায় রিজেন্সি কাউন্সিল দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা হয়। মহারাজ-মাতা ইন্দিরা দেবী এই সভার সভানেত্রী ছিলেন। এই সিংহাসন আরোহণের সংবাদ স্টেট কাউন্সিল কর্তৃক ২৪শে ডিসেম্বর এক ঘোষণা-পত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হয় এবং ভারত সরকারের অবগতির জন্য উহা প্রেরণ করা হয়। ঘোষণা-পত্রটির বাংলা রূপান্তর নিম্নরূপ—

মহারাজ সার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের স্বর্গারোহণে হিজ্. হাইনেস্ মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি প্রখ্যাপক কোচবিহার রাজসভার ঘোষণা-পত্র।

যেহেতু মহিমমণ্ডিত পুণ্য স্মৃতি মহারাজ সার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কে, সি, এস, আই, মহোদয়ের স্বর্গারোহণে কোচবিহার রাজ্যের সিংহাসন তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীমান্ জগদ্দাপেন্দ্রনারায়ণ মহোদয়ে বর্ত্তিয়াছে, অতএব এতদ্বারা সর্ব্ব-সাধারণের বিদিতার্থে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, শ্রীশ্রীমান্ মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ তদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেব মহারাজ ভূপ বাহাদুরের পিতৃবংশ-সম্ভূত প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মহা-মহিমান্বিত হিজ্. মেজেষ্টি ভারত সম্রাট মহোদয়ের স্বীকার প্রাপ্তির নিমিত্ত যথা কর্ত্তব্য করা হইয়াছে।

আপাততঃ রাজ্যের শাসন ষ্টেট কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত হইবে। হিজ্. হাইনেস্ মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের নাবালগি কালে কি প্রণালীর শাসন সংস্থাপিত হইবে তাহা অবধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত, মহারাজের যাবতীয় ক্ষমতা ষ্টেট্ কাউন্সিল পরিচালন করিবেন। দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় মঞ্জুরী বর্ত্তমান ব্যবস্থা স্থির থাকিবে।

ষ্টেট কাউন্সিল,	এইচ.জে.টোয়াইনাম,	ভাইস্. প্রেসিডেণ্ট	ষ্টেট কাউন্সিল
কুচবিহার	বি. ঘোষ	মেম্বার	ঐ
২৪শে ডিসেম্বর	এস. ঘোষ	ঐ	ঐ
১৯২২	সতীশচন্দ্র মুস্তোফী	ঐ	ঐ
	জগদ্বল্লভ বিশ্বাস	ঐ	ঐ

১৯২৩ সনের ২১শে মে রিজেন্সি কাউন্সিল গঠিত হয়। ইহার পূর্ব পর্যন্ত ষ্টেট কাউন্সিল সব কিছু তদারক করিত। জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সনের ১০ই মাচ। এই দিনে বিশেষ দরবারের ব্যবস্থা হয়। এই অনুষ্ঠানে মহারাজাকে নজরানা হিসাবে দুইটি রৌপ্য মুদ্রা উপহার দেওয়া হয়। যাহার উপর মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের নাম অঙ্কিত। ইংরাজ সরকারের পক্ষ হইতে রাজসাহী বিভাগের কমিশনার ডাবলিউ. এ. মার (W. A. Marr) উপস্থিত হইয়া ভারত সম্রাটের সম্মতিপত্র পেশ করেন। এই সময়ে ষ্টেট কাউন্সিল পুনঃ গঠিত হয়। দরবারে মহারাজার

সিংহাসনে উপবেশনের পর ৩১ বার তোপ ধ্বনি করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পর মহারাজাকে পান এবং আতর দেওয়া এবং তাহার পর সম্মানীয় দরবারীদের মধ্যে বিতড়নের ব্যবস্থা করা হয়। রাজবাড়ীর বিশেষ অনুষ্ঠান বিষয়ে রাজজ্যোতিষ শুভ লগ্ন বিচার করিয়া স্থির করিয়া দিতেন, তাহার পর উহা দ্বারপণ্ডিত (রাজপণ্ডিত) ও রাজপুরোহিতের মাধ্যমে রাজদরবারে পাঠানো হইত এবং সেই নির্ধারিত সময়ে শুভ অনুষ্ঠান হইত। এইবারের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানও তাঁহাদের অভিমত অনুসারে স্থির হয়।

এই রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, আতসবাজি পোড়ানো, শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান বিষয়ে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইয়াছিল, তাহা এইখানে তুলিয়া ধরিলাম। ৭ই মার্চ-এর বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান ১০ই মার্চ সকাল ৩-৪৫ মিনিটে হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, কিন্তু ৯ই মার্চ এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হয় যে অনুষ্ঠানটি হইবে সকাল ৪-৪৫ মিনিটে, এইখানে ৭ই মার্চ-এর বিজ্ঞপ্তিটি তুলিয়া ধরা হইল—

Reg. No. C.—1085.

SYMBOL

যতো ধর্মস্ততো জয়:

The Cooch Behar Gazette

EXTRAORDINARY.

WEDNESDAY, MARCH 7, 1923.

THE STATE COUNCIL, COOCH BEHAR.

GENERAL AND EXECUTIVE DEPARTMENT.

RAJYA\ ISEK.

NOTIFICATION.

The 7th March 1923.

1. In modification of all previous orders, the Rajyavisek ceremony of His Highness the Maharaja Jagaddipendra

Narayan Bhup Bahadur will be performed on Saturday, the 10th March 1923 at the Palace.

2. The Pujas in connection with the ceremony will commence at 2-30 A. M. The Rajyavisek ceremony will commence at 3-45 A. M., on the arrival of His Highness at the ceremonial Shamiana.

3. The Debutter Department will arrange the details of the religious ceremonies to be observed in accordance with the Shastras and the Raj family custom.

4. A Darbar will be held in the Shamiana after His Highness has taken his seat on the Sinhasan at 11 A. M., when all Darbaries will be entitled to attend and present Nazar. The Nazar will consist of two Silver coins of the new accession coinage which will be available from the Revenue Officer on payment of the price fixed for their sale to the public.

5. His Highness will arrive at the Shamiana at 11 A. M., to take his seat on the Sinhasan, when the Band will play the Cooch Behar Anthem, the Military will present arms and a salute of guns will be fired, after which the Darbaries will present their Nazar.

6. The Ceremonial Department will make the necessary arrangements for the Darbar and provide the Insignia etc., required for the Rajyavisek ceremony.

7. A limited number of the public will be admitted to witness the Darbar on presentation of passes obtainable from the Household office. The general public will be admitted to witness the religious ceremonies which will be performed under a Shamiana to be pitched in the Palace grounds.

H. J. TWYNAM,
Vice-President, State Council,
Cooch Behar.

রিজেন্সি কাউন্সিলের দ্বারা পরিচালিত শাসনকালে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হয় তাহার মধ্যে ১৯২৪-২৫ সনে কোচবিহার শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের কলের ব্যবস্থা। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময় হইতে এই পরিকল্পনা থাকিলেও শেষ পর্যন্ত উহা এই সময়ে বাস্তব রূপ গ্রহণ করে এবং নরেন্দ্রনারায়ণ পার্কের পার্শ্বে পাওয়ার হাউস বসান হয়। এই সময়ে শহরে বৈদ্যুতিক আলোর সম্প্রসারণও হয়। ১৯২৬ সনের মার্চ মাসে কোচবিহারে কৃষি শিল্প এবং পশুর এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। ১৯২৮-২৯ সনের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় যে এই সময়ে জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহারের মধ্যে বকেয়া সীমান্ত বিরোধ মিটাইয়া লইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই আর্থিক বছরেই কোচবিহারের ভৌগোলিক সীমানা নিরূপণে অর্থ বরাদ্দ করা, জিতেন্দ্রনারায়ণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, বিশেষ করিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে সময় উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৬ সনের ৬ই এপ্রিল মহারাজার একুশ বৎসর বয়স হইলে তদানীন্তন গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন কর্তৃক এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষমতা পান। রাজকার্যে মহারাজাকে সাহায্য করিবার জন্য সুযোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়। মহারাজা এই মন্ত্রী-পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৯৩৫ সনে কোচবিহারে যে রিজেন্সি কাউন্সিল (রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রণা সভা) এবং লেজিস্‌ল্যাটিভ কাউন্সিলের (ব্যবস্থাপক সভা) মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা হইত তাহার সদস্যদের নাম—

রাজপ্রতিনিধি সভা

হার হাইনেস মহারাণী সাহেবা (ইন্দিরা দেবী)—রিজেন্ট ও প্রেসিডেন্ট
লেঃ কর্ণেল জে, এ, ব্রেট; সি, আই, ই—ভাইস-প্রেসিডেন্ট
শ্রীযুত উমানাথ দত্ত, বি, এল, রেভিনিউ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)—সদস্য
শ্রীযুত দিনেশানন্দ চক্রবর্তী, সিভিল সার্জন—সদস্য

ব্যবস্থাপক সভা

হার হাইনেস মহারাণী সাহেবা—রিজেন্ট (রাজপ্রতিনিধি) ও প্রেসিডেন্ট
লেঃ কর্ণেল জে, এ, ব্রেট. সি, আই, ই—ভাইস-প্রেসিডেন্ট
শ্রীযুত উমানাথ দত্ত, বি, এল, রেভিনিউ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)—সদস্য
শ্রীযুত দিনেশানন্দ চক্রবর্তী, সিভিল সার্জন—সদস্য

শ্রীযুত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার, বি, এল,—অতিরিক্ত সদস্য
„ দুলীচাঁদ শেঠিয়া ওশয়াল „
„ সুশীলকুমার চক্রবর্তী, এম, এ, „
কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ „
শ্রীযুত হেমেন্দ্রকিশোর সেনগুপ্ত, বি, এল,—সচিব

১৯৪৩ সনের স্টেট কাউন্সিল এবং লেজিস্‌ল্যাটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণের তালিকা—

স্টেট কাউন্সিল

লেফ্‌টেন্যান্ট হিজ্‌ হাইনেস্ মহারাজা ভূপ বাহাদুর
(জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ)—প্রেসিডেন্ট
দেওয়ান বাহাদুর আর, সুব্বা নাইডু, চীফ-মিনিস্টার—ভাইস-প্রেসিডেন্ট
করালীচরণ গাঙ্গুলী (রায় বাহাদুর) বি, এ, বি, সি, এস—
(অবসরপ্রাপ্ত) রেভিনিউ মিনিস্টার—সদস্য
শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার, বি, এল, শিক্ষা ও উন্নয়ন মন্ত্রী— ”
মেজর রাজকুমার রাজেন্দ্র সিং, বার-এট-ল, হাউস হোল্ড মিনিস্টার— ”

লেজিস্‌ল্যাটিভ কাউন্সিল

জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর—	প্রেসিডেন্ট
আর, সুব্বা নাইডু—	ভাইস-প্রেসিডেন্ট
করালীচরণ গাঙ্গুলী—	সদস্য
রাজেন্দ্র সিং—	„
সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার—	„
সুবোধচন্দ্র দত্ত, চীফ্‌ জজ, হাইকোর্ট	অতিরিক্ত সদস্যবৃন্দ
শরৎচন্দ্র ঘোষাল এম,এ,বি,এল, সিভিল ও সেসন জজ—	„
মৌলভী আনসারউদ্দিন আমেদ, বি, এ, অডিট ও ফিনান্স অফিসার—	„
রায়চৌধুরী সুশীলকুমার চক্রবর্তী, এম,এ—	„
কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ—	„
গোবিন্দমোহন দত্ত, বি,এল—	„

রায় সাহেব সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার, বি, এল—	অতিরিক্ত সদস্যবৃন্দ
খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ—	,,
প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তাফী—	,,
কুমার টিকেন্দ্রনারায়ণ—	,,
গজেন্দ্রনারায়ণ বসুনীয়া—	,,
যোগেন্দ্রনাথ রায়—	,,
মৌলভী মোসারফ হোসেন প্রধান—	,,
তারাপ্রসন্ন লাহিড়ী, বি, এস, সি—	সচিব

১৯৪৭ সনে কোচবিহার রাজ্য ভারতের সহিত যুক্ত হইবার সময়ে যে শেষ মন্ত্রীসভা ছিল, সেই মন্ত্রীসভার সদস্যদের স্মৃতি-নির্ভর নামের তালিকা তুলিয়া ধরিলাম।—

হিম্মৎ সিং—চীফ্ মিনিস্টার, সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার—শিক্ষামন্ত্রী, আনসারউদ্দিন আহমেদ—অর্থমন্ত্রী, আমানতউল্লা আহমেদ—রাজস্বমন্ত্রী ও সুশীল চক্রবর্তী।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ক্ষমতায় বসার পর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করিয়াছিলেন তাহা ১৯৩৯ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত চালু ছিল। তাহার পর জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ প্রজাদের প্রত্যক্ষ ভাবে শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার এক নীতি ঘোষণা করেন। তাঁহার দ্বি-স্তরীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্টেট লেজিস্ল্যাটিভের বেসরকারী সদস্যগণ সদস্য নির্বাচন করিতে পারিবেন। নির্বাচিত ব্যক্তিগণ একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন। এই নব-নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের ভার দেওয়া হইবে, যেমন—শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, নিবন্ধন, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এবং প্রেস ও স্টেশনারী। এই সব পরিবর্তন দেখিয়া মনে হয় মহারাজা ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী। (দুইবার নির্বাচন হয়)। ১৯৩২-৩৩ সনে পাক্ষিক কোচবিহার গেজেট প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহারের রাজন্যবর্গ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন ব্যাঙ্কে রাখিয়া গিয়াছেন। আজ সেই আনুমানিক অর্থ ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার দ্বারা 'কোচবিহার উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হইয়াছে।

কোচবিহার হইতে দিনহাটা যাওয়ার পথে ৯ কি.মি. দূরে রাস্তার ধারে যে ভাঙ্গা দালানটি দেখা যায় উহা ১৯৪৮ সনে কৃষি এবং পশুপালন বিষয়ে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ। ভিত্তি স্থাপন করেন জয়পুরের মহারাজা। এই প্রচেষ্টা দেখিয়া আমরা মহারাজার দূরদর্শিতা বিষয়ে অনুমান করিতে পারি।

ব্যক্তিগত জীবনে মহারাজা ক্রীড়ানুরাগী এবং শিকার-প্রিয় ছিলেন। ১৯৫৬ সনে এক ইংরাজ মহিলা জীনা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। ১৯৪৮ সনের ২০শে আগস্ট এক চুক্তির ফলে কোচবিহার স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ১৯৫০ সনের ১লা জানুয়ারী কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় রূপান্তরিত হয়। স্বাধীন ভারতের বহু রাজপরিবার রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেও কোচবিহারের মহারাজা তাহার ব্যতিক্রম। তিনি সেই লোভ হইতে একেবারে নির্লিপ্ত থাকেন। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় মহারাজা প্রজাদের মধ্যে দেশের অখণ্ডতা বিষয়ে ভাষণ দিয়া এক অধ্যায় সৃষ্টি করেন।

ছেলেবেলা হইতেই লেখাপড়ার দিকে মহারাজার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ভাল ছাত্র হিসাবেও তাঁহার সুনাম ছিল। প্রথমে বিভিন্ন গৃহ-শিক্ষকের কাছে তাঁহার বিদ্যাচর্চা আরম্ভ হয়। মহারাজা ১৯৩৪ সনের নভেম্বর মাসে কেম্ব্রীজ হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বিকাশ হইতে থাকে, পরবর্তী কালে তাঁহার যোগ্যতার প্রমাণ দিবার বহু সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন।

১৯৩৯ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণকে সাম্মানিক সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদে নিয়োগ করেন। পরে লেফ্‌টেন্যাণ্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সম্মানিত হন।

১৯৪১ সনের ১৫ই জানুয়ারী মহারাজা ভূপ বাহাদুরের উপনয়ন অনুষ্ঠান হয়। পরে অন্যান্য রাজকুমারদের উপনয়ন হয়।

রিজেন্সি কাউন্সিলের সদস্য কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ১৯৩০ সনের ৮ই নভেম্বর দেহত্যাগ করেন। ১৯৩২ সনের ১০ই নভেম্বর রাচীতে সুনীতি দেবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ শান্তির জন্য রিজেন্সি কাউন্সিলের নির্দেশ-ক্রমে ৯,০০০ টাকা দেওয়া হয়। হিন্দু মতে কোচবিহারে ২১শে নভেম্বর শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহার শেষ ইচ্ছানুসারে তাঁহার চিতা ভস্ম আনিয়া কলিকাতার লিলি কটেজে পিতা-মাতার সমাধির কাছে রাখা হয় এবং সেইখানে ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয় ২৭শে নভেম্বর।

মহারাজার একাধিক বার ইংলণ্ডসহ বিদেশের বহু দেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়। এই ভ্রমণের ফলে দেশ-বিদেশের শাসন পরিচালনা বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং নিজের পরিবেশ অনুসারে তাহা রূপ দিবার চেষ্টা করেন। তিনি শাসক হিসাবে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। প্রজার সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল পিতা পুত্রের মত। তিনি প্রজাদের আপনজন হিসাবে ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন।

বৃটিশ সম্রাটের তিনি বিশেষ বন্ধু হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাহাদের ক্ষমতা ও স্থায়ীত্ব বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সংশয় ছিল না। হিটলারের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নিজের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ইংরাজ সরকারের সাহায্যে পাঠাইয়া দেন। ইহা ছাড়াও রাজ্য হইতে এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্যও করেন।

১৯১৪-১৮ সনের বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে কোচবিহার রাজা যে ভাবে সাহায্য করিয়াছিল তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রেরিত সাহায্য অতীত গৌরবকেও ম্লান করিয়া দিয়াছিল। বৃটিশ সরকার কোচবিহার মহারাজের এই আনুগতাকে সব সময়ে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছে।

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন একজন আদর্শ শাসক এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে একবার আসার সুযোগ যে পাইয়াছে, সে-ই মোহিত হইয়া গিয়াছে। প্রজাদের সুখ-সুবিধার জন্যও তিনি সদা ব্যস্ত থাকিতেন। পারিবারিক সম্পর্ক, তাঁহার ভ্রাতৃ-প্রেমের ও আন্তরিকতার কথা এখনও বিভিন্ন জনের মুখে শোনা যায়।

১৯৭০ সনের ১১ই এপ্রিল জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মরদেহ কোচবিহারে আনিয়া রাণীর বাগানের কাছে দাহ করা হয়। শবযাত্রায় প্রচুর লোক উপস্থিত ছিল। মহারাজার কোন সন্তানাদি না থাকায় ভ্রাতুষ্পুত্র **বিরাজেন্দ্রনারায়ণ** মুখাগ্নি করেন। বিশেষ মর্যাদা সহকারে সৎকারের পর হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করেন বিরাজেন্দ্রনারায়ণ। জীনা দেবী ও গায়ত্রী দেবী সহ অনেকেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কোচবিহারের গৌরব প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী **আব্বাসউদ্দীনের** দৃষ্টিতে কোচবিহারের তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারা, জনমতের গতি-প্রকৃতি এবং মহারাজার দূরদর্শিতা বিষয়ে অভিমতটি এইখানে তুলিয়া ধরা হইল—

"কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুচবিহারে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি। স্বদেশী

আন্দোলনের ঢেউ কুচবিহারে এসেছিল অন্য ভাবে। কুচবিহারবাসী হিন্দু-মুসলমান বহিরাগত বর্ণ-হিন্দুদের দ্বারাই একরকম শাসিত। উকিল, হাকিম, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার, প্রফেসার, মাষ্টার সব লাইনেই এদের কৃতিত্ব। চাকরী-বাকরী খালি হলে ওদের ছেলেমেয়েদের দাবীই অগ্রগণ্য। স্কুল-কলেজে কুচবিহারী ছেলেদের প্রথম স্থান অধিকার করার ব্যাপারেও মাষ্টার-প্রফেসারদের পক্ষপাতিত্ব দেখা যেত। কেবলমাত্র কুচবিহার জেন্‌কিন্‌স্ স্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ফয়েজউদ্দীন প্রতি বৎসর সব পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করত। দু-চারটি কুচবিহারী হিন্দু ছেলে, যেমন সতীশ সিংহরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করত, আর তুফানগঞ্জে আমি প্রতি বৎসরই প্রথম স্থান অধিকার করতাম। কুচবিহারী ছেলেদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দেবার জন্য বর্তমান মহারাজার (জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ) খুল্লতাত প্রিন্স ভিক্টর এন. নারায়ণ কুচবিহার সদর এবং চারটি মহকুমার স্কুলে সব ক্লাশে পুরস্কার বিতরণের সময় নেটিভ প্রাইজের বন্দোবস্ত করলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে যারা শীর্ষস্থান অধিকার করবে তাদের নেটিভ স্কলারশিপও দিলেন। এ ছাড়াও গরীব ছাত্রদের জন্য ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপেরও বন্দোবস্ত করলেন।

যখন আমরা থার্ড ক্লাশে (বর্তমান অষ্টম মান) পড়ি তখন ফয়েজউদ্দীন একদিন তুফানগঞ্জে এল। স্কুলে যে কয়জন কুচবিহারী হিন্দু-মুসলমান ছেলে ছিলাম সবাইকে খবর দিয়ে রায়ডাক নদীর ওপারে কুলক্ষেতে গিয়ে মিলিত হলাম। ফয়েজ বলল—দেখ, আমরা কুচবিহারে কুচবিহারী ছাত্রদের নিয়ে 'কুচবিহার হিত-সাধনী সভা' করেছি। উদ্দেশ্য আমরা আমাদের দাবীদাওয়ার উপর জোর দেব, সর্বত্র সেবা-সদনের শাখা খুলব এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাতে কুচবিহারী ছাত্রদের দাবী উপেক্ষিত না হয় তার ব্যবস্থা করব এবং আমাদের সুদূর প্রসারী লক্ষ্য হবে কুচবিহার কুচবিহারবাসীদের জন্য, অর্থাৎ বহিরাগত বা ভাটিয়াদের প্রভুত্ব আমরা এ রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করব। এটা হচ্ছে শাখা সভা, প্রধান সভা কুচবিহারে।...কাজ হবে আমাদের খুবই গোপনে। বৎসরে একবার সদরে সভা হবে, যথা সময়ে তার খবর পাবে।

কুচবিহারী ছেলেদের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে গেল। কুচবিহার জেন্‌কিন্‌স্ স্কুলের হেড মাষ্টার মণীন্দ্রচন্দ্র রায় বাঘা লোক। সামান্যতম অপরাধ করলেই ছাত্রদের পিঠে তিনি বেত মারতেন। ফয়েজউদ্দীন তার জন্য একদিন প্রতিবাদ করেছিল বলে হেড মাষ্টার রাগে অন্ধ হয়ে তার পিঠে বেত মারবার জন্য উদ্যত হলেন। সারা স্কুলে ছাত্র সমাজে সে অতি ভাল ছেলে বলে পরিচিত।

ছাত্ররা সবাই প্রতিবাদ করল, ফলে কুচবিহার স্কুলের জীবনে প্রথম হল ধর্মঘটের আয়োজন। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল জেন্‌কিন্‌স্‌ স্কুলের বারান্দায়। হেড মাষ্টার প্রমাদ গুণলেন। রাজার রাজ্যে চাকুরী। রাজার কানে গেলে চাকুরী রাখা দায়। মানে মানে সকল দাবী তিনি মেনে নিলেন। ছাত্রদের আর বেত মারা হবে না, রাসের মেলায় যাত্রা-গানের আসরে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট আসন থাকবে—আরো যেন কি কি তা আজ মনে নেই।

বহিরাগত লোকজন বা ভাটিয়াদের একচ্ছত্র প্রাধান্য দেখে কুচবিহার হিত-সাধনী সভার পত্তন হল। বর্তমান মহারাজা (জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ) সত্যি সত্যিই কুচবিহারের আদি অধিবাসীদের মঙ্গল কামনা করেন। বড় বড় চাকুরীতে দেশের উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করলেন। বহিরাগতরা ক্রমশঃ মনে মনে প্রমাদ গুণতে আরম্ভ করলেন। কুচবিহার হিত-সাধনী সভায় পরোক্ষে মহারাজার উৎসাহ ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

বিরাট আকারে কুচবিহার লাইনের মাঠে (বর্তমান রাস মেলার মাঠ) দুই লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে এক সভা হল। কুচবিহারের ইতিহাসে এত বড় জনসভা এই-ই প্রথম। কলকাতা থেকে আমি এসেছিলাম। সভায় আমার ছোট ভাই আবদুল করিমের লেখা "ও ভাই মোর কুচবিহারী রে" গানটা গাওয়ার পর সভায় অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হল। সেই গান সারা কুচবিহারে ছড়িয়ে পড়ল।

মহারাজা তখন কিছু পরিমাণ স্বায়ত্ব শাসন দিলেন। রাজ্যে কয়েকজন মন্ত্রী হলেন—অবশ্যি জনসাধারণের নির্বাচিত মন্ত্রী তাঁরা ছিলেন না, সবাই রাজার মনোনয়নে। তবু যে কয়জন মন্ত্রী গ্রহণ করা হল তাদের অধিকাংশই মনোনীত হল কুচবিহারের আদি অধিবাসী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে থেকে।

রাজ্যের রাস্তাঘাট উন্নত, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা এসব দিকে দৃষ্টি দেওয়া হতে লাগল—মহারাজার ব্যক্তিগত গুণের উপর মুগ্ধ হয়ে দেশবাসী পরম শ্রদ্ধার চোখেই তাঁকে দেখতে লাগল। তিনি সুদূর গ্রামাভ্যন্তরে সাধারণ পোষাকে গরীব চাষীর ঘরে যেতে লাগলেন। বহু সভা সমিতিতে যোগ দিতে লাগলেন—দেশে সত্যিকারের একটা সাড়া পড়ে গেল। বাংলায় দুর্ভিক্ষের পদ ধ্বনি শোনা গেল। কুচবিহারের মহারাজা ফরমান জারী করলেন, তাঁর দেশ থেকে যেন এক ছটাক চাউল বাইরে কোথাও না যায়। রংপুর ও জলপাইগুড়ি কুচবিহারের তিন দিক ঘিরে আছে। কড়া প্রহরী বসল সীমান্তে। সারা বাংলায় যখন চাউলের মণ একশ' ও তদূর্ধে কুচবিহারে তখন চাউলের মণ মাত্র বারো

টাকা। দলে দলে বাংলা দেশ থেকে অনাহারী অভুক্ত লোক প্রবেশ করতে আরম্ভ করল কুচবিহারে। মহারাজা তাদের জন্য ক্যান্টিন খুলে দিলেন এক জায়গায়—সীমাবদ্ধ করে রাখলেন তাদের একই জায়গায় এক ক্যাম্পে। কুচবিহারের লোক জানতেও পারল না সারা বাংলার উপর দিয়ে যুদ্ধের দিনে কত বড় মড়কের ঝড় বয়ে গেছে।

রাজার উপর আমারও গভীর শ্রদ্ধা হল। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এঁর পূর্ব-পুরুষদের মত আজ লণ্ডন, কাল বম্বে, পরশু দার্জিলিং বেড়িয়ে অনর্থক অর্থ অপচয় করতেন না। কুচবিহারেই বছরের অন্ততঃ আট মাস কাটাতেন।"

('আমার শিল্পী জীবনের কথা'—আব্বাসউদ্দীন আহমদ, পৃঃ ১১৬)

কোচবিহার রাজ্যের নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীত ছিল বলিয়া কোন তথ্য আমার জানা নাই। তবে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে বেশ কয়েকটি গান রচিত হয়। বিভিন্ন সভা সমিতি সহ, মহারাজা যে অনুষ্ঠানে যাইতেন সেইখানে এইসব গান গাওয়া হইত। সেই গানের মালা হইতে এইখানে একটি তুলিয়া ধরা হইল :—

=গান=

সুজল সুফল শস্য শ্যামল বাংলাদেশের কণ্ঠহার,
ধন্য মোদের জন্মভূমি স্বর্ণভূমি কুচবিহার।
দিকহারা ঐ সবুজ মাঠে হাওয়ায় লুটায় সোনার ধান,
শাল পিয়ালের গহন বনে পিক্ পাপিয়া গায়রে গান।
শুভ্র শীতল জোছনা উজল স্নিগ্ধ কোমল রূপটি মার॥
তোর্ষা ধর্লা গঙ্গাধর রায়ডাক আর কালজানি,
পঞ্চ নদীর পুণ্য ধারায় সিক্ত শ্যামল বুকখানি,
শস্যে জলে পুষ্পে ফলে হাস্যময়ী মা আমার॥
গড়ের বনে রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশীর মধুর তান,
উদাস করা ভাওয়াইয়া সুরে মৈষাল করে দোতরা গান,
মাঠে বসি তপ্ত চাষী পান করে সেই সুধাধার॥
রাজার নামে প্রজার প্রাণে ভক্তি প্রীতির বয় তুফান,
প্রজার লাগি অনুরাগী রাজার হিয়ায় স্নেহের টান,
কোথায় এমন দরদভরা রাজার হাতে রাজ্যভার॥

[দিনহাটা রাজকুমার গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৺বিরজাকান্ত সিংহ

মহাশয় লিখিত এই গানটি বর্তমানে তাঁহার জামাতা ও কন্যা শ্রীহেমন্তকুমার রায় বর্মা ও শ্রীমতী অরুণা বর্মার নিকট হইতে সংগৃহীত।]

গায়ত্রী দেবীর বিবাহ

১৯৪০ সনের ৯ই মে হইল কোচবিহারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এইদিন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় ভগ্নী গায়ত্রী দেবীর হিন্দু মতে বিবাহ হয়। এই বিবাহে সম্প্রদান করেন জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং। জয়পুরের মহারাজার সঙ্গে কোচবিহার রাজপ্রাসাদে মহা ধূমধামে এই বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। বিবাহে বহু মূল্যবান যৌতুকের মধ্যে দুইটি হাতী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে সুদূর রাজপুতনার সঙ্গে কোচবিহারের প্রথম বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মুঘল সুবেদার মহারাজা মানসিংহজীর সঙ্গে মহারাজা নরনারায়ণের কন্যার বিবাহ হয়। বর্তমানে এই বিবাহের মাধ্যমে দুই পরিবারের মধ্যে পূর্ব সম্পর্ককে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। এই বিবাহকে ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি বলা যায়।

কোচবিহার-জয়পুর এই বিবাহের ফলে নূতন এক অধ্যায়ের শুভ সূচনা হইল। এই বিবাহের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র আরও সুদৃঢ় হইল। বৃটিশ রাজসহ দেশের বিভিন্ন রাজা-মহারাজা এই বিবাহকে অভিনন্দন জানায়। হিজ্ হাইনেস্ সওয়াই মানসিংজীর সহিত গায়ত্রী দেবীর বিবাহ হয়।

ভূপালের মহারাজা, ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, দারভাঙ্গার মহারাজা, ত্রিপুরা ও পাটনার মহারাজকুমার ও স্যার মুর সহ বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি এই বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন।

এই বিবাহ উপলক্ষে কোচবিহারের বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী অফিস সহ স্কুল, কলেজ, কোর্ট প্রভৃতি সাতদিন বন্ধ থাকে। শহর উৎসবের সাজে সাজিয়া ওঠে। নাগরিকবৃন্দও নানা উৎসব অনুষ্ঠান উপভোগ করে। কোচবিহার শহরকে সুন্দর ভাবে সাজান হয়। বিভিন্ন স্থানে তোরণ তৈয়ারী করা হয়।

৯ তারিখ সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা সহকারে বরকে রাজবাড়ীতে আনা হয়। বিবাহ-পূর্ব দিনে মেয়েরা বাড়ীর অনুষ্ঠানাদিও যথারীতি করে। রাজপ্রাসাদের প্রধান গেটের সামনে কোচবিহারের মহারাজা বর ও বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করেন। তাহার পর বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তাঁহাদের

লইয়া যাওয়া হয়। শাস্ত্র মতে, লগ্ন সময়ে হিন্দু মতে সম্প্রদান কার্য সমাপন হয়। পরের দিন অর্থাৎ ১০ তারিখে যথাসময়ে বাসী-বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইদিন সন্ধ্যায় কোচবিহার রাজের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রিতদের পরিণয় ভোজে আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। ১১ তারিখে বহু অতিথিসহ নববধূকে লইয়া বিশেষ ব্যবস্থায় জয়পুর-রাজ দেশের পথে রওনা হন।

বিরাজেন্দ্রনারায়ণ

(১৯৭০ বর্তমান)

জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের কোন সন্তানাদি না থাকায় ছোট ভাই কুমার ইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণের পুত্র বিরাজেন্দ্রনারায়ণ মুকুটহীন রাজ্যের রাজা হন। জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচবিহারে তাঁহার মরদেহ আনিয়া রাজ-দরবারের সামনে শেষ শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য রাখা হয়। এই সময়ে আলোচনা করিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোচবিহারের রাজগুরু বিরাজেন্দ্রনারায়ণের অভিষেক অনুষ্ঠান করেন, তাহার পর মৃত রাজার সংকারের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে গায়ত্রী দেবী ও তাঁহার স্বামী মহারাজা মানসিংজী কোচবিহারে আসিয়াছিলেন। পরে মানসিংজী দিল্লীতে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া এই নিযুক্তির সম্মতি আদায় করেন।

ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ আর সেই অতীত ঐতিহ্য নাই। একে একে সেই গৌরব-উজ্জ্বল কথা ইতিহাসের পাতায় স্থান পাইতেছে। বর্তমানে কোচবিহারের সঙ্গে বিরাজেন্দ্রনারায়ণের যোগাযোগও অতি সামান্য।

কোচবিহার—রাজ্য হইতে জেলা

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। লর্ড মাউন্টব্যাটনের সুপারিশ অনুযায়ী বৃটিশ পার্লামেণ্টে যে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হয় তাহার ৮নং ধারা অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলি, ভারত অথবা পাকিস্তান কোন্ রাষ্ট্রে যোগদান করিবে তাহা নিজেরাই স্থির করিবেন। এই বিষয়ে রাজার মত-ই চূড়ান্ত, প্রজাগণের কিছু বলিবার অধিকার রহিল না।

এই বিষয় লইয়া কোচবিহারে বিভিন্ন দল পরস্পর বিরোধী চেষ্টা চালাইয়া যাইতে লাগিল। একদল চাহিল কোচবিহার ভারতের সহিত যুক্ত হোক, দ্বিতীয় দল বলিল পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হোক। অবশেষে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির পর আবার পশ্চিমবঙ্গ অথবা আসামের সঙ্গে যুক্ত হইবে তাহা লইয়াও আন্দোলন চলিতে থাকে। এই সব মত বিরোধের জন্য কোচবিহারের বুকে নূতন এক সমস্যার উদ্ভব হইল। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত দেশীয় রাজাদের নবগঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। সেই আবেদনে সাড়া দিয়া কোচবিহার রাজ্যের মহারাজা স্যার জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একান্ত অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া কোচবিহার রাজ্যটিকে ১৯৪৯ সনে ২৮শে আগস্ট তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখার কথা ঘোষণা করেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেশীয় রাজ্যটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্পণ করেন ১৯৪৯ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর। চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় ভারতের গভর্ণর জেনারেলের পক্ষে ভারত সরকারের মিনিস্ট্রী অব স্টেটের উপদেষ্টা ভি. পি. মেনন ও কোচবিহার মহারাজার মধ্যে। এই চুক্তিতে ৯টি ধারা সংযোজিত হয়। চুক্তি বিষয়ে মহারাজা কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন, ভারত সরকার প্রদত্ত তাহার উত্তরটি নিম্নরূপ—

D. O. NO. F. 15(19)-P/49

MINISTRY OF STATES
NEW DELHI
The 30th August, 1949.

MY DEAR MAHARAJA SAHIB,

In connection with the Agreement concluded between

the Governor-General of India and Your Highness for the integration of Cooch Behar State Your Highness raised certain points for clarification ; the Government of India have considered them and accept the following arrangements :—

(1) It is the intention of the Government of India to administer for the present the territories of the Cooch Behar State as a Centrally-administered area under a Chief Commissioner.

(2) All contracts and agreements entered into by Your Highness before the date on which the administration is made over to the Government of India will be honoured except in so far as any of these contracts or agreements is either repugnant to the provisions of any law made applicable to the State or inconsistent with the general policy of the Government.

(3) The allowances at present drawn by Her Highness the Rajmata will be continued for her life time and will be paid out of the revenues of the State. Your Highness' brother and other members of the Ruling Family will also be paid allowance from the revenues of the State as per list attached

(4) The responsibility for the Cooch Behar State Forces will be taken over by the Government of India from 12th September, 1949. If these forces are disbanded or any of the men discharged they will receive the pension or gratuity or compensation to which they may be entitled under the rules of the State.

(5) Adequate guards will be provided for the protection of *Your Highness' person and palace.*

(6) No land or building being Your Highness' private property shall be requisition do ; acquired without your consent and without payment of full compensation.

(7) Electricity from the State Power House for the main residence of Your Highness and family within the State will be provided at the fixed rate in existence immediately before the transfer of administration to Government of India. Water supply will be provided free of charge to the main Palace of Your Highness and family within the State.

(8) The management of the temples and Debutter properties in the State may be entrusted to a Trust which shall consist of Your Highness as President, 3 nominees of Your Highness and 2 nominees of Government. This Trust will be in charge of all temples in the State and will also administer the properties of the temples both inside and outside the State. In the evnt of the abolition of the zamindaris which are Debutter property Government will ensure that the Trust has adequate resources to fulfil its object.

(9) Your Highness may create a Trust for the marriage of the son and daughter of Isharani of Cooch Behar with a corpus of Rs. 1 lakh. The Trustees will be besides Your Highness, Their Highnesses of Jaipur and Dewas Junior.

(10) The Civil List Reserve Fund of Rs. 10,60,900 shall be Your Highness' private property and shall be held by Your Highness in Trust for meeting expenditure in connection with Your Highness' marriage or special repairs to the Palace and any unforeseen expenditure.

(11) The administration of the Maharajkumar Trust Fund with a corpus of Rs. 4,86,900 shall be formally vested in a Trust of which Your Highness and Their Highnesses of Jaipur and Dewas Junior shall be trustees.

(12) Your Highness will be entitled to hold customary

Durbars and troops present at the capital will take part in the Dasserah and other celebrations.

(13) Your Highness will retain your present rank in the Indian Army.

(14) Government will endeavour to associate the name 'Narayan' with the Cooch Behar State Forces even after their absorption in the Indian Army.

2. The Ministry of States has issued a Memorandum on the privileges and dignities which has been finalised in consultation with the Rajpramukhs of Unions and other States. Your Highness will see that the Memorandum deals adequately with the various suggestions made by the Rulers from time to time regarding their rights and privileges.

With kind regards.

Yours sincerely,
V. P. MENON.

Lieutenant-Colonel His Highness
Maharaja Sir Jagaddipendra Narayan
Bhup Bahadur, K. C. I. E,
Maharaja of Cooch Behar,
Cooch Behar, (Bengal).

তাহার পর ১৯৪৯ সনের ২৮শে আগস্ট এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির বিষয়ে ১৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে রাজার ভাতা বিষয়ে যেমন শর্ত রহিয়াছে, অনুরূপভাবে রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক অনুসারে বিভিন্ন হারে যে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহারও বিস্তারিত বিবরণ এই চুক্তিপত্রের সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও স্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকাও আছে, তবে এইখানে কেবলমাত্র মূল চুক্তিপত্রটি তুলিয়া ধরা হইল—

AGREEMENT MADE THIS Twentyeighth day of August 1949 between the Governor General of India and His Highness the Maharaja of Cooch Behar.

WHEREAS in the best interests of the State of Cooch Behar as well as of the Dominion of India it is desirable to provide for the administration of the said State by or under the authority of the Dominion Government :

IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS :—

ARTICLE I.

His Highness the Maharaja of Cooch Behar hereby cedes to the Dominion Government full and exclusive authority, jurisdiction and powers for and in relation to the governance of the State and agrees to transfer the administration of the State to the Dominion Government on the 12th day of September 1949 (hereinafter referred to as 'the said day').

As from the said day the Dominion Government will be competent to exercise the said powers, authority and jurisdiction in such manner and through such agency as it may think fit.

ARTICLE II.

High Highness the Maharaja shall continue to enjoy the same personal rights, privileges, dignities and titles which he would have enjoyed had this agreement not been made.

ARTICLE III.

His Highness the Maharaja shall with effect from the said day be entitled to receive for his life-time from the revenues of the State annually for his Privy Purse the sum of Rupees eight lacs fifty thousand free of all taxes. After him the Privy Purse will be fixed at Rupees seven lacs only. This

amount is intended to cover all the expenses of the Ruler and his family, including expenses on account of his personal staff, maintenance of his residences, marriages and other ceremonies etc. and will neither be increased nor reduced for any reason whatsoever.

The Government of India undertakes that the said sum of Rupees eight lacs fifty thousand shall be paid to His Highness the Maharaja in four equal instalments in advance at the beginning of each quarter from the State treasury or at such treasury as may be specified by the Government of India.

ARTICLE IV.

His Highness the Maharaja shall be entitled to the full ownership, use and enjoyment of all private properties (as distinct from State properties) belonging to him on the date of this agreement.

His Highness the Maharaja will furnish to the Dominion Government before the 15th September, 1949 an inventory of all the immovable property, securities and cash balances held by him as such private property.

If any dispute arises as to whether any item of property is the private property of His Highness the Maharaja or State property, it shall be referred to a judicial officer qualified to be appointed as a High Court Judge, and the decision of that officer shall be final and binding on both parties.

ARTICLE V.

All the members of His Highness' family shall be entitled to all the personal privileges, dignities and titles enjoyed by them whether within or outside the territories of the State, immediately before the 15th day of August, 1947.

ARTICLE VI.

The Dominion Government guarantees the succession, according to law and custom, to the gaddi of the State and to His Highness the Maharaja's personal rights, privileges, dignities and titles.

ARTICLE VII.

No enquiry shall be made by or under the authority of the Government of India, and no proceedings shall lie in any Court in Cooch Behar, against His Highness the Maharaja, whether in a personal capacity or otherwise, in respect of anything done or omitted to be done by him or under his authority during the period of his administration of that State.

ARTICLE VIII.

(1) The Government of India hereby guarantees either the continuance in service of permanent members of the Public Services of Cooch Behar on conditions which will not be less advantageous than those on which they were serving before the date on which the administration of Cooch Behar is made over to the Government of India or the payment of reasonable compensation.

(2) The Government of India further guarantees the continuance of pensions and leave salaries sanctioned by His Highness the Maharaja to servents of the State who have retired or proceeded on leave preparatory to retirement, before the date on which the administration of Cooch Behar is made over to the Government of India.

ARTICLE IX.

Except with the previous sanction of the Government of India no proceedings, civil and criminal, shall be instituted

against any person in respect of any act done or purporting to be done in the execution of his duties as a servent of the State before the day on which the administration is made over to the Government of India.

In confirmation whereof Mr. Vapal Pangunni Menon, Adviser to the Government of India in the Ministry of States has appended his signature on behalf and with the authority of the Governor General of India and Lieutenant Colonel His Highness Maharaja Jagaddipendra Narayan Bhup Bahadur, Maharaja of Cooch Behar has appended his signature on behalf of himself, his heirs and successors.

JAGADDIPENDRA NARAYAN,
Maharaja of Cooch Behar.
V. P. MENON,
Adviser to the Government of India.
Ministry of States.

ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সন এক তারবার্তায় কোচবিহার রাজ্যের তদানীন্তন চীফ্ কমিশনার ভি. আই. নানজাপ্পাকে এই অন্তর্ভুক্তির কথা জানাইয়াছেন। কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ সব সময় কোচবিহারের প্রজা-মণ্ডলীর সুখ ও সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতেন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোচবিহারের জনগণ যাহাতে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মর্যাদা সহকারে বাস করিতে পারে সে বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। সর্দার প্যাটেল বোম্বাই হইতে টেলিগ্রামের মাধ্যমে যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাইয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ—

Camp—Birala House
Malabar Hill
Bombay, 11th Sept. 1949

From Minister, Home

To Sri Nanjappa,
Chief Commissioner of Cooch Behar.

On the handing over of Cooch Behar to Central administration I send to its people my best wishes and assurance on behalf of the Govt. of India that though far, their interest welfare will claim our close and intimate attention, I am fully aware of the many problems, political and economical which effect the State and I am confident that with their co-operation we would success in solving them in the best interest of the State and the country for their happiness and prosperity, unity and mutual adjustment between the constituent elements, of the population are essential pre-requisites without this such resources and personnel as we may be able to spare for them would avail little.

I hope therefore, that the people of Cooch Behar will work with single mindedness and devotion to duty as a united team for their own betterment and to achieve their due place in the political and administrative set-up of India.

To accept transfer of territory from a ruler is no small responsibility which we feel on this occasion. To give up sovereignty over territory is no mean sacrifice. I am grateful to him for the spirit of accommodation and understanding which he has displayed and the prompt manner which he accepted our advice.

May he and his people be happy prosperous under the new dispensation which is being inagurated to day.

Sd/ Sardar Vallabhvai Patel
Home Minister of India.

(Taken from Patel's Correspondences 1945-55, Compiled by Durga Das. Vol. No. 7. Page No. 553.)

এই চিঠিখানি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে—

১। কেন্দ্রীয় সরকার কোচবিহারের প্রজামণ্ডলীর নানারকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন। ২। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার সর্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। ৩। ভারত সরকার কোচবিহারবাসীর সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করেন, যাহাতে ভারত সরকার এই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করিতে সক্ষম হইতে পারেন। ৪। এই মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্য ভারত সরকার কোচবিহার-বাসীকে এক মন এক প্রাণ হইয়া দলবদ্ধ ভাবে আগাইয়া আসিতে অনুরোধ করেন। ৫। ভারত সরকার কোচবিহারবাসীকে আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে সরকার কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পূর্বে কোচবিহারের মানুষের মতামত অবশ্যই লইবেন; তাহা না হইলে ভারত সরকার কোন কিছুই কোচবিহার-বাসীর জন্য সফলভাবে করিতে পারিবেন না। ৬। কোচবিহারের জনগণকে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হইবে। ৭। কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ভারত সরকারের অনুরোধে কোচবিহার রাজ্যটিকে শান্তিপূর্ণভাবে ভারত সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভারত সরকারের" পক্ষ হইতে মহারাজার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

ভারত সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন দফায় আলোচনা অনুসারে প্রথমে কোচবিহার কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃতি পায়। পরে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী (পরে মুখ্যমন্ত্রী) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কোচবিহার রাজ্যটিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সময়ে কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে মিটিং মিছিল আরম্ভ হয় এবং এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া প্রজাহিতসাধনী নামে স্থানীয় একটি দল ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করে। তৎকালীন পত্র-পত্রিকাগুলিতেও সংযুক্তির বিষয়ে জোরালো মত প্রকাশ করা হয়। এই সময়কার সংযুক্তির আন্দোলনের পক্ষে জননেতা উমেশচন্দ্র মণ্ডল বিশেষ স্মরণযোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং তদানীন্তন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করিতে তৎপর হন এবং পত্রালাপ করেন। সেই পত্রগুলির কিছু এইখানে অবগতির জন্য তুলিয়া ধরা হইল—

Volume No. 8 and Page No. 574

To

The Honourable Sardar Vallabhbhai Patel,
Deputy Prime Minister of India.

My dear Vallabhbhai,

I have spoken to you already about Cooch Behar and I have shown you certain papers regarding the subjects......I would like you to take up these cases and their accession to the West Bengal Government.

I am very much anxious about Cooch Behar because of certain developments which have taken place there affecting the security not merely of West Bengal but also of the Indian Union. I can not say more at this stage but when I see you next time I will tell you.

Yours sincerely,
B. C. Roy.

Volume No. 7 Page No. 547

Calcutta
11th May, 1949

To

Honourable Sardar Vallavbhai Patel,
Dy. Prime Minister of India, New Delhi.

My dear Vallavbhai Patel,

You remember I spoke to you on several occasion about allowing Cooch Behar to be merged to West Bengal. I am perfectly sure you are inclined in the same direction. It may be that it will take a little time before the Perliminaries can be settled before the merger is decided. You know that Sri Sarat Chandra Bose has filed his nomination for the assembly from South Calcutta, the last date of nomination

being 24th May. Polling is taking place in 12th June. I certainly expect help, advice and co-operation from you and Ponditjee. In this connection may I suggest to you that the announcement from the Centre that Cooch Behar could be merged to West Bengal would be a great help to us in the election campaign. When you have finally decided about this merging, kindly let us know, so that we can keep the field ready and make our propaganda that this merging has not been affected by Sri Sarat Chandra Bose but by West Bengal Govt. The Provincial Congress Committee has decided to put a candidate a strong one against Sri Sarat Ch. Bose but of course polling booth is always a tricky customer.

I hope you are keeping well. An early reply will be welcome.

Yours sincerely,
Dr. B. C. Roy

এই সমস্ত চিঠিপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজুও কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন করেন এবং তাহার পর সর্দার প্যাটেল যে উত্তর দেন তাহা নিম্নরূপ—

Sardar Patel's Correspondence Vol. 8, Page No. 517

Dehradun 26 June 1949.

My dear Katju,

Thank you for your letter of 23 June 1949. I am glad to know your views on question of Cooch Behar. From all evidence, independence as well as otherwise, it seems that merger with West Bengal is locally unpopular. It js difficult problem and we will have to think hard about it. Least we should provoke unpleasant local situation.

Sardar Vallavbhai Patel.

আসামের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলইও কোচবিহারে আসিয়া এইখানকার জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আসামের সঙ্গে সংযুক্তির বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল কোচবিহার আসামের সঙ্গেই যুক্ত হোক। সেই সময়ে আসামের প্রখ্যাত জননেতা ও সাহিত্যিক নীলমণি ফুকন এই বিষয় লইয়া আলোচনার জন্য কোচবিহারে আসেন। আসামের সঙ্গে সংযুক্তিকে ত্বরান্বিত করিতে সহায়তা করার জন্য জেলা স্তরে মুখ্য আরক্ষা আধিকারিক হিসাবে গোবিন্দ ফুকন সহ বেশ কয়েকজন অসমিয়া কর্মচারীকে এইখানে পাঠানো হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। কোচবিহারের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আসামের গভর্নর হায়দার আলি সর্দার প্যাটেলকে যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ—

Guest House, Sillong.
29 June 1948

My dear Sardarjee,

The only further comment which I wish to make is on the subject of the anti Bengali feeling in the State.

I was informed that out of the State's population of between six and seven lakhs the Bengalee number a mere 30,000. Yet Bengali propaganda would make it appear as if Bengalees constitutes the greater portion of the population. The bulk of the population consists of Rajbanshi including Muslim between whom and the Rajbanshis there is far amity and free social inter course. The danger of the situation lies in the fact the Bengali Congress leaders are leading themselves to propaganda that Cooch Behar should be merged with West Bengal. This is resulting in the Congress as a whole tending to become unpopular in Cooch Behar. Bengal Provincial Congress would be violently resisted. In the present State of feeling the Congress would find few Cooch Behari adherents. The best solution in the present circums-

tances would be to let Cooch Behar come under wing of the Central Congress but if that is not possible the second best would be to let it be affiliated to the Assam Provincial Congress……

During my visit I was cordially received by all classes of people which was not a personal tribute to me but relief at seeing in me visible evidence that Cooch Behar was not tied to the apron strings of West Bengal. By their aggressional attitude the Congress leaders of West Bengal and the Calcutta press are increasing the animosity roused against West Bengal in this part of India……

A. K. Hydar
29.6.48.

হায়দার আলীও এই বিষয়ে কথাবার্তা চালাইতে কোচবিহারে আসিয়াছিলেন।

হিতসাধনীর পক্ষে কাজ করিবার জন্য আসামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হিতসাধনী নেতারা রাখিয়াছিলেন বলিয়াও অনেকে মনে করেন। কোচবিহারের ভাগ্য লইয়া নানা প্রশ্ন তখন চারিদিকে উত্তাল ঢেউ তুলিয়াছে। সেই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে চিঠিখানি লেখেন তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই চিঠির মাধ্যমে সেই সময়কার কোচবিহারের ভাগ্য লইয়া রাজনৈতিক মত-বিরোধের একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। কংগ্রেস দলের কি মনোভাব এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় হিতসাধনী দলের বিপরীত মনোভাব পরিষ্কার। চিঠির মধ্যেই দেখা যাইতেছে সেই সময় হইতেই 'উত্তর খণ্ড প্রদেশ' বিষয়ে চিন্তা ভাবনার বীজ বপন করা হইয়াছে। এই আন্দোলন বিষয়ে সরকারী মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা সর্দার প্যাটেলের চিঠিখানি পড়িলেই বোঝা যাইবে—

New Delhi
28th December, 1949

My dear Jawaharlal,

Thank you for your letter of 27th December regarding

Cooch Behar and Vindhya Pradesh. I have examined the position in detail in the cabinet and hope it was not necessary for me now to go into details again. As Menon has also told you the question of Cooch Behar was mentioned to you some time ago. It's possible it has slipped from your mind. In view of that I did not think it necessary to refer to you again though it was my intention to mention it in the cabinet before a public anouncement is made. As regard consulting the people of Cooch Behar, I have already said that local Congress has approved the merger. There is a local Hitasadhani Sabha, which is partly muslim with its sympathies definitely with neighbouring area of East Pakisthan and partly consisting of some members of hill tribes who are looking to Sikkim, Nepal and Bhutan for the formation of an "Utter khand Pradesh." I feel certain that we should do nothing to encourage this kind of organisation in its mischievous tendencies.

Assam's intention towards Cooch Behar directed only because on account of its geographical isolation from the main area of West Bengal, I had to entrust the supervision over its administration to the Governor of Assam. Otherwise they have never bothered about it.

Yours faithfully,
Vallabhbhai Patel.

চারিদিকে তখন অস্থিরতা। কোচবিহারের ভবিষ্যৎ কি হইবে, সেই বিষয় লইয়া আলোচনা তুঙ্গে উঠিয়াছে। এই সময়কার বহুল প্রচারিত একটি গান এইখানে তুলিয়া ধরিলাম—

ও ভাই মোর কুচবিহারী রে
চতুর্দ্দিকে দেখং স্বরজ বাতি।
তোমার এলা কেনে আন্ধার রাতি।

ও ভাই মোর কুচবিহারী রে।
নিজের টোপলা নিজে নেও
হাসি মুখ তোমার পরাক দেও
পর দেশী কি হয় আপন রে
ও ভাই মোর কুচবিহারী রে।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের প্রাণ-পুরুষ আব্বাসউদ্দীন আহমদ লিখিত আত্মজীবনী হইতে একটি অংশে তুলিয়া ধরিলাম। ইহা হইতে অন্তর্ভুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সেই সময়কার রাজনৈতিক তৎপরতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। উল্লেখ্য এই যে, মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের ব্যক্তিত্ব ও সহৃদয় সুদক্ষ রাজ্য পরিচালনা প্রসঙ্গে পূর্বেই আব্বাসউদ্দীন আহমদের কিছু মন্তব্য যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"দেশ ভাগ হবার বেশ কয়েক মাস আগে থাকতেই কুচবিহারের মহারাজা বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ সোহরাওয়ার্দীর কাছে একবার নয়, আমি জানি, তিন-তিনবার গিয়ে তাঁর অভিমত চেয়েছিলেন ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিবেন কিনা সে সম্বন্ধে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার রাজ্যের তিনদিকেই পাকিস্তান, আপনার কি মত ?' তিনবারই মন্ত্রীপ্রবর মহারাজাকে বলেছিলেন, 'আমি খুব ব্যস্ত, কায়েদে আজমের সাথে পরামর্শ করে আপনাকে বলব।' তখন আজাদী অর্জন করার মুখে পূর্ব পাকিস্তানের ওজারতির নেতৃত্ব নিয়ে শুরু হয়েছে নাজিমউদ্দীন-সোহরাওয়ার্দীর দ্বন্দ্ব। কলকাতা-দিল্লী দিল্লী-কলকাতা করতে করতেই মন্ত্রী ও হবু-মন্ত্রীদের সময় চলে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী কে হবে এটাই তখন বাংলার মুসলিম রাজনীতিকদের সমস্যা, কুচবিহার বা ত্রিপুরা কোন্ চুলোয় গেল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

মহারাজা আর কতদিন অপেক্ষা করবেন ? ভারতে যোগদান করলেন তিনি অতি অনিচ্ছা সত্বেও বা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর মৌনতা দেখে। কুচবিহার ভারত ভুক্তির সাথে সাথেই মহারাজার হাত থেকে দু' হাজার বছরের শাসন দণ্ড খসে পড়ল। কুচবিহার হিত-সাধনী সভার কর্মকর্তাদের চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল। মহারাজা স্তম্ভিত হলেন, কিছুই তাঁর বলবার উপায় নেই।"—(আমার শিল্পী জীবনের কথা, পৃঃ ১১৭-১২০)

১৯৪৯ সনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কলিকাতায় এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করিলেন—"...The question of merger of

Cooch Behar would be decided according to the wishes of the people (Patel's Correspondences, Vol. No. 8, Page No. 413)

কোচবিহারের জনগণই সংযুক্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিয়া পণ্ডিত নেহেরু মত প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ সর্দার প্যাটেলকে অভিনন্দন জানাইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে করিয়া এইখানে তুলিয়া ধরিলাম।

The Palace
Cooch Behar
12th August, 1947

My dear Sardar Patel,

On this great and historic day of Indian Independence, which you have contributed in no small measure to bring about, I send to you on my behalf and on behalf of the people of Cooch Behar, most cordial greetings.

The apprehension of most Indian States were, as you know, the natural outcome of the feeling that by sheer weight of population the provinces may submerge and swamp them. The policy of fair play and sympathetic understanding which you have initiated towards the States is, if I may say so, a very happy augury for the future of our country. The ready response that policy has evoked from a very large body of Rulers is proof of its signal success.

The country sorely needs peace and we all wish it to prosper and you can count upon my whole hearted co-operation and my very best wishes in the prosecution of any policy that you may think it necessary to adopt for the restoration of peace and for the eradication of poverty.

Yours sincerely,
Jagaddipendra Narayan
Maharaja of Cooch Behar

(Reference :—Sardar Patel's Correspondences, Vol. 5, Letter No. 469, Page-436)

মহারাজার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লেখেন—

New Delhi
17th August, 1947

My dear Maharaja Sahib,

Many thanks for your very kind letter of greetings and wishes on Independence day. I am more than satisfied with the good response which may appeal to the Rulers of States to join the Dominion has met. I myself had no doubt that approached in the right way the princes would mostly respond to the Country's cause.

I should like to take this opportunity of thanking Your Highness for so readily aggreeing to accede to the Indian Dominion. Along with Assam and West Bengal.

Your State occupies a difficult position, but I have no doubt that in concert and unity we shall be able to meet all eventualities.

Yours Sincerely,
Vallabhbhai Patel

Lieutenant His Highness
Maharaja Jagaddipendra Narayan,
Maharaja of Cooch Behar,
Cooch Behar.

তাহার পর তোর্ষা নদী দিয়া অনেক জল গড়াইয়া যায়। ইতিহাসের পাতায় আজ অনেক কিছুই স্থান পাইয়াছে। সব বিতর্কের অবসান হয় ১৯৫০ সনের ১লা জানুয়ারী। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইল। কোচবিহার রাস মেলার মাঠে শীতের সকালে বিরাট জনসভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা রূপে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে স্মরণীয় ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ভাষণটি লিখিত ছিল। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব সুকুমার সেন এবং কোচবিহারের চীফ্ কমিশনার ভি. আই. নানজাপ্পা উপস্থিত ছিলেন। ভাষণটি নিম্নরূপ।

পশ্চিম বঙ্গ

সরকার

পশ্চিমবঙ্গে

কোচবিহার রাজ্যের

অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষ্যে

পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী

মান্যবর ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের

অভিভাষণ

১লা জানুয়ারী, ১৯৫০

কোচবিহারের নাগরিকবৃন্দ,

আজ বৎসরের প্রথম দিন। কয়েক দিন পরেই ভারত নিজেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিতে চলিয়াছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণ এই ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আপনাদের আগমন-উপলক্ষ্যে আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছেন।

প্রায় ১৯ বৎসর পূর্ব্বে বাট্‌লার কমিশন ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার বিষয় বিচার করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদিচ ভৌগোলিক দিক দিয়া ভারতবর্ষ এক ও অবিচ্ছিন্ন, তথাপি রাজনৈতিক হিসাবে ভারত দুইটী ভাগে বিভক্ত বলা যাইতে পারে। একটী অংশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, যাহা পার্লামেণ্টের বিধি অনুযায়ী ও ভারত আইনসভার নির্দ্দেশ অনুসারে শাসিত হয়; অপর অংশ যাহাকে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স্ বা দেশীয় রাজ্য বলা হয়, যাহারা ভারত-সম্রাটের একচ্ছত্র আয়ত্তাধীন থাকিয়াও রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত শাসনাধীনে ছিল। বাট্‌লার কমিশন আরও বলেন যে, ভারতশাসনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত—কি

উপায়ে ভারতের এই তুইটি অংশের রাষ্ট্রিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই যে, এত অল্পকালের মধ্যেই এই সংযোগস্থাপন সম্ভব হইবে এবং এই তুই অংশের মধ্যে এত শীঘ্র এক মহা সমন্বয় ঘটিবে। ইহার কারণ এই যে, অধিকাংশ রাজ্য সংলগ্ন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলির সহিত ভৌগোলিক হিসাবে ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। জাতি, শ্রেণী ও ভাষার দিক দিয়াও এই দেশীয় রাজাগুলির ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এ কথা সত্য যে, যখন ভারত স্বাধীন হইল তখন এই তুই অংশের শাসনপ্রণালী বিভিন্ন ছিল। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী ছিল এবং সেই প্রণালীতেই শাসিত হইবার জন্য প্রস্তুত ছিল; অপর পক্ষে রাজন্যবর্গ নিজ নিজ রাজ্য রাজতন্ত্রপ্রথায় শাসন করিতেন, যদিচ তাঁহারা অনেক ব্যাপারেই ব্রিটিশ-সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন।

১৯৪৭ সালে যখন এ দেশ হইতে ব্রিটিশ-শাসন অপসারণ-প্রস্তাবের আলোচনা চলিতেছিল, তখন এই প্রশ্ন উঠিল যে, ইংরেজ চলিয়া গেলে দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনবিধি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। তখন সকলেই উপলব্ধি করিলেন যে, ভারত কেবল সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দিক হইতেই এক নয়, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়েও এক ও অভিন্ন। প্রশ্ন উঠিল, এই একতা বজায় রাখিয়া কি প্রকারে সমগ্র-ভারতবাসী সম্মিলিত চেষ্টায় ভারতকে তাহার পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইতে পারে।

১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পাইলাম। যে প্রচেষ্টা ও প্রেরণার ফলে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম, তাহা যে স্বতঃই পারিপার্শ্বিক দেশীয় রাজ্য-সমূহের অধিবাসিগণকে উদ্বুদ্ধ করিবে ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? তাঁহারাও এই প্রেরণার স্পন্দন অনুভব করিলেন। এই পরিবর্ত্তনের ভাবধারা উপলব্ধি করিয়া, এই নূতন পরিস্থিতির সহিত রাজন্যবর্গ নিজেদের মানাইয়া লইলেন। ফলে, স্বাধীনতালাভের কয়েক মাসের মধ্যেই, অনেক ক্ষুদ্ররাজ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া নূতন রাজ্যগোষ্ঠী (Unions of States) গঠন করিলেন। এই সম্মিলিত রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইল। ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তখন অতি সহজেই সমগ্র ভারতবর্ষকে একত্রীভূত করা সম্ভবপর হইল। অতঃপর সমুদয় ভারতবাসী, দেশীয় রাজ্যের প্রজাই হউন অথবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকই হউন, সমবেত ভাবে ভারতের উন্নতিসাধনে সহযোগিতা করার সম্পূর্ণ সুযোগ পাইলেন।

ভারতবিভাগের পর অনেকেই ভাবিলেন যে, ইহার ফলে ভারতের ভবিষ্যৎ সংকটপূর্ণ এবং পরিণামে ইহাতে ভারতের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সত্তায় চরম আঘাত লাগিবে। প্রশ্ন উঠিল, খণ্ডিত ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে একতা কি ভাবে বজায় থাকে। ভারতবিভাগের পর দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনপ্রকরণ কি রূপ লইবে তাহাই তখন পর্যালোচনার বিষয় হইল। ভারত সরকার তখন এমন একটী কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে চাহিলেন, যাহার দ্বারা সমগ্র দেশ সর্ব্ব-ভারতীয় ব্যাপারে মিলিত ভাবে দায়িত্ব লইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে, ১৯৪৭ সালে, ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশীয় রাজন্যবর্গের উদ্দেশে একটী ঘোষণা প্রচার করিলেন। দেশরক্ষা (Defence), পররাষ্ট্র (Foreign Affairs) এবং যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার (Communications) ব্যাপারে সমগ্র দেশ একত্রে গ্রথিত। এই তিনটী বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য তাঁহাদের অনুরোধ করা হয়। এই প্রস্তাবে প্রায় সকল রাজাই সানন্দে সম্মত হইলেন। ইহার ফলে, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবেই একটী বিরাট যুগবিপ্লব ঘটিল—বহু শত বৎসর পরে সমগ্র ভারত একটী অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

এই একতালাভের সঙ্গে-সঙ্গেই এই রাজ্যগুলির মধ্যে আরও দুইটী পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। প্রথমতঃ, বহু ক্ষুদ্রাকার দেশীয় রাজ্য সমষ্টিগত হইয়া কয়েকটী বৃহত্তর রাজ্যগোষ্ঠী গঠিত হইল। দ্বিতীয়তঃ, সেখানে গণতন্ত্র ও দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইল।

কিন্তু গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র বহুব্যয়সাধ্য। সেজন্য কতকগুলি রাজ্যে এই প্রকার শাসনপ্রণালীর প্রচলন করা সম্ভব হইল না। সুতরাং, ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের রাজ্যসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, এই রাজ্যগুলি উড়িষ্যা ও মধ্যভারত প্রদেশের সহিত যুক্ত হইবে। ভারত-ইতিহাসে এই প্রথম ঊনচল্লিশটী স্বাধীন দেশীয় রাজ্য একযোগে সংলগ্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দ-চিত্তে মিলিত ও তাহাদের অন্তর্গত হইল। ইহার কিছুদিন পরেই গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের কয়েকটি রাজ্য বোম্বাই-এর সহিত ও অপর কয়েকটি পূর্ব্বপাঞ্জাবের সহিত সংযুক্ত হইল। আবার কয়েকটী রাজ্য প্রত্যক্ষ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কোচবিহার এমনিই একটী রাজ্য। গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোচবিহার ভারত গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হয়। স্থির হইল যে, এই কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যগুলি

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলির সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবে অথবা ভবিষ্যতে সংলগ্ন কোনও প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এই ব্যবস্থার ফলে আজ ছয়শত খণ্ডরাজ্যের পরিবর্ত্তে মাত্র কুড়িটী রাজ্যগোষ্ঠী (Unions of States) স্থাপিত হইয়াছে। এই রাজ্যগোষ্ঠীগুলি কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত শাসনব্যাপারে ঘনিষ্ঠ ও অবিচলিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রস্তুত। আজ তাই দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গকে ভারতে এক মহান্ ও অখণ্ড রাষ্ট্রস্থাপনার সহ-স্থপতিরূপে অভিবাদন করি।

কোচবিহার ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে একটী রাজ্য। ইহার আয়তন ১,৩১৮ বর্গ মাইল। ইহার পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্বে আসাম প্রদেশ ও দক্ষিণে পাকিস্তান। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই রাজ্য স্থাপিত হয় ও এক সময়ে মহানন্দা হইতে মধ্য-আসাম পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভুটান কোচবিহারে দৌরাত্ম্য করিতে থাকে। ১৭৭২ সালে কোচবিহারের রাজা ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করিয়া অঙ্গীকার করেন যে, যদি তাঁহাদের আনুকূল্যে দেশ শত্রুমুক্ত হয়, তাহা হইলে তিনি ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিবেন ও তাঁহার রাজ্য বাঙ্গলার সহিত সংযুক্ত হইবে। কিন্তু অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের মূলে কোন বাধ্যবাধকতা নাই, কোন বলপ্রয়োগ নাই। স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে কোচবিহারের মহারাজাবাহাদুর কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন। আজ এই শুভদিনে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইল।

এই রাজ্যের আদিম অধিবাসী ব্যতীত বহু বাঙ্গালী, বিহারী ও মাড়োয়ারী এই স্থানে বহু পুরুষ হইতে বসবাস করিতেছেন। এখানকার চলিত ও সরকারী ভাষা বাঙ্গলা; তাই সেই ভাষাতেই আজ আমি আপনাদের নিকট আমার অভিভাষণ নিবেদন করলাম। সামাজিক ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া কোচবিহারের অধিবাসিগণের সহিত বাঙ্গলার জলপাইগুড়ি জেলার অধিবাসীদিগের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

এই উপলক্ষ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্মতি অনুসারে আপনাদের নিকট কয়েকটী ঘোষণা করিতেছি :—

১। কোচবিহার ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের একটী জেলা হিসাবে পরিগণিত ও শাসিত হইবে। ইহার আয়তন বাঙ্গলার একটী জেলার মতনই।

ইহার সদর দপ্তর কোচবিহারেই থাকিবে, কেননা এই সহরের সহিত বহু পুরাতন স্মৃতি জড়িত আছে।

২। এই জেলার শাসনকর্ত্তার সহিত আলোচনান্তে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কোচবিহারের দুইজন প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন।

৩। কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজকর্ম্মচারীদিগকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাসম্ভব গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে যে সকল অধিকার বা সুবিধা ভোগ করিতেছিলেন, ভবিষ্যতে তাহা বজায় থাকিবে। যদি কোন কারণে কাহাকেও চাকুরীতে বহাল রাখা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

৪। অদ্য হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচলিত ব্যবস্থানুযায়ী, কোচবিহারের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance) ও অন্যান্য মধ্যকালীন ভাতা (Interim and Ad-interim relief) দেওয়া হইবে ; যত শীঘ্র সম্ভব, ইহাদের বেতন-হার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচলিত বেতন-হারের সমান করার ব্যবস্থা হইবে।

৫। কোচবিহারের রাজকোষে মজুদ অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোচবিহার-বাসীদেরই কল্যাণার্থে ব্যবহার করিবেন।

আজ আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে আপনাদের অভিনন্দন জানাই। আমি আপনাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, কোচবিহারের উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবেন।

পরিশেষে আমি আজ একটী ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে চাই। চিকিৎসক হিসাবে এবং ব্যক্তিগত ভাবেও বটে, কোচবিহারের রাজপরিবারের সহিত আমার দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠতা। স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সকলের সহিত আমার আত্মীয়তা আজ স্বীকার করিতে গৌরব বোধ করিতেছি। আপনাদের শাসনকর্ত্তাদের সহিতও আমার বিশেষ পরিচয় ছিল ও আছে। তাই আজ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার সুবিধা ও সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

কোচবিহারবাসিগণ, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আমি আপনাদিগকে

আমার সসম্মান অভিনন্দন জানাইতেছি। আসুন, আমরা সকলে সমবেতকণ্ঠে বলি—

১লা জানুয়ারী, "জয় হিন্দ!"
১৯৫০

কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার প্রজাবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া যে শুভেচ্ছা ও বিদায় বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ—

On this solemn occasion which marks the end of long and happy association, my mother and I send you our very best wishes, my beloved people.

Wherever we may be, we shall never forget you, your loyalty, and your devotion, we hope you will always maintain the peace, goodwill and harmony which has been our common heritage.

We shall always watch with keen interest your moral and material welfare and always pray for your happiness and prosperity.

May God Almighty bless you all
Jagaddipendra Narayan

১৯৫৩ সনে ভারত সরকার রাজ্য পুনঃ গঠন কমিশন গঠন করেন। সেই সুযোগে এইখানে যাঁহারা কোচবিহারকে পাকিস্থান বা আসামের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে ছিলেন, তাঁহারা আবার মাথা চাড়া দিয়া ওঠেন। আসামের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া, যাহাতে কোচবিহারকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সে বিষয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা ব্যর্থ হয় এবং কমিশন কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে থাকার বিষয়েই অভিমত প্রকাশ করেন। অপর পক্ষে কংগ্রেস দল সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তি তো বটেই আসামের বঙ্গভাষাভাষী এলাকা পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন গোয়াল-পাড়াকে পশ্চিমবঙ্গভুক্তির জন্য কমিশনের কাছে আর্জি পেশ করেন। কমিশন কিন্তু সেই দাবী মানিয়া লন নাই। কমিশনের সদস্য কে. এম. পানিক্কর অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য সেই সময়ে কোচবিহারে আসেন।

এমনি ভাবেই কয়েক শত বৎসরের ইতিহাস শেষ হইল। আজ কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রান্তিক জেলা হিসাবেই পরিচিত।

ধর্মীয় আলোকে কোচবিহারের রাজপরিবার

এই অধ্যায়ে কোচবিহারের রাজধর্ম বিষয়ে আলোকপাত করিতে চাই। ধারাবাহিক তথ্যানুসন্ধান করিলে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বহু নদীর জল আসিয়া এই মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কেউই পরিবেশকে কলুষিত করে নাই। এখনও অনেকে নিজের সত্বাকে বজায় রাখিয়া সকলের সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিতেছে।

১৫১০ সন হইতে যদি কোচবিহারের ইতিহাসের শুভারম্ভ মনে করিয়া মহারাজ চন্দনকে প্রথম রাজা বলিয়া স্বীকার করি তবে দেখিতে পাইব যে এই সময় হইতেই রাজপরিবারে ছিল শৈব ধর্মের প্রভাব। চন্দন কোচ রাজ-বংশের আদি রাজা এবং বিশ্বসিংহ বর্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ।

চন্দনের মৃত্যুর পর বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫২৩ সনে। মহারাজ বিশ্বসিংহ শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন এবং কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্র মতে শৈব ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি কনৌজ, কাশী এবং অন্যান্য স্থান হইতে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এখানে আনিয়া ছিলেন এবং ভূমি অর্থ ইত্যাদি দিয়া রাজ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে শৈব ধর্মের একক আধিপত্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর নরনারায়ণ ১৫৫৪ সনে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথম দিকে শৈব ধর্মে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে আসামের বৈষ্ণব মহাপুরুষ শঙ্করদেব কোচবিহার রাজ্যের আশ্রয়প্রার্থী হন এবং তাঁহার প্রভাবেই রাজা বৈষ্ণব ভাবে ভাবিত হইতে থাকেন। কাহারও মতে নরনারায়ণ কণ্ঠভূষণ উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণের কাছ হইতে শৈব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে রাজগুরু ছিলেন। অন্য মতে স্বামী ভূমানন্দের পুস্তকে দেখা যায়, মাধবদেবের নিকট হইতেই মহারাজা বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্করদেব যে তাঁহাকে দীক্ষা দেন নাই সে বিষয়ে অনেক তথ্য বা কাহিনী আছে। কালাপাহাড়ের অত্যাচারের পর নরনারায়ণ কামাখ্যা দেবীর মন্দির ভাই শুক্লধ্বজের সহায়তায় পুনঃ নির্মাণ করেন এবং অন্যান্য কয়েকটি মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার করেন। এই সময় হইতেই শ্রীশ্রীমদনমোহনের পূজা হয় এবং একই সঙ্গে দুর্গা পূজাও চলিতে থাকে।

নরনারায়ণের মৃত্যুর পর লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ সনে পৈতৃক সিংহাসন লাভ করেন। আসামের বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তক শঙ্করদেবের অপর শিষ্য দামোদরদেবের নিকট হইতে তিনি বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনিও এই রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এই সময়ে কয়েকটি মূল্যবান ধর্মগ্রন্থ এইখানে অনূদিত হয় আর এই সময়েই বৈষ্ণব ধর্ম রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারক স্টিফেন ক্যাসিলা এবং তাঁহার সহকর্মী জন্ ক্যাব্রাল কামতা রাজ্যে আসিয়াছিলেন এবং মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রেই খৃষ্ট ধর্মের সঙ্গেও কিছুটা যোগসূত্র স্থাপিত হয় এই রাজ্যের।

লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বীরনারায়ণ অল্পকালের জন্য রাজা হন। শ্রীশ্রীদেব দামোদর চরিত্র গ্রন্থে দেখা যায়—

"লক্ষ্মীনারায়ণ পুত্র পত্নী যত যত
লৈলেক শরণ দামোদর চরণত।"

এই উদ্ধৃতি হইতে জানা যায় রাজকুমার অবস্থাতেই বীরনারায়ণ বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি ভেলাডাঙ্গায় একটি চতুর্ভুজ বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৬২৬ সনে মহারাজ প্রাণনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোচবিহার 'ধর্মরাজ্য' নামে পরিচিত ছিল। সকলেই ধর্মকর্ম করিত এবং ধর্ম আলোচনা করিত। মহারাজা নিজে জল্পেশ্বর, বাণেশ্বর, ষণ্ডেশ্বরে ইষ্টক নির্মিত শিব মন্দির নির্মাণ করেন এবং গোসানীমারীর মন্দির ও প্রাচীর সংস্কার করিয়া ঐ সকল স্থানে দেব সেবার জন্য প্রচুর সম্পত্তি প্রদান করেন।

মধুপুরের বনমালী গোঁসাই মহারাজ প্রাণনারায়ণের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্ম পাশাপাশি চলিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে ধর্ম লইয়া কোন সংঘাত দেখা যায় নাই।

প্রাণনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুনারায়ণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া ওঠেন এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন।

কুমার মোদনারায়ণ ১৬৬৫ সনে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়েই জল্পেশ্বরের মন্দির নির্মাণ কার্য সমাধা হয়। তিনি শুদ্ধ, শান্ত, সজ্জন ছিলেন এবং একবার গঙ্গা স্নানেও গিয়াছিলেন। তবে তাঁহার এবং পরবর্তী মহারাজা বাসুদেবনারায়ণের গুরুদেবের নাম পাওয়া যায় নাই। সে যাহাই

হোক না কেন, একথা সত্য যে সেই সময়েও রাজদরবারে বৈষ্ণব প্রভাব ছিল। এই সময়ে শিখগুরু তেগবাহাদুর কোচবিহারে আসিয়াছিলেন।

১৬৮২ সনে মহীন্দ্রনারায়ণ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি বয়সে তরুণ হইলেও অতি বলিষ্ঠকায় এবং ধর্মাচরণে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন। হরিনাম জপ এবং হরি গুণ-গান লইয়া বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সময়ে রতিকান্ত মিশ্র ছিলেন রাজগুরু।

মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর জ্ঞাতি ভ্রাতা রূপনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিদ্ধান্ত শিরোমণি ভট্টাচার্য ছিলেন রাজগুরু। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে রাজা তাঁহাকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি অনুরাগী, দয়ালু, প্রজ্ঞাবান, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি মদনমোহনের মূর্তি তৈয়ারী করিয়া জাকজমক সহকারে তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১৭১৪ সনে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করার পর গুরু গ্রহণে ভিন্ন মত দেখা যায়। তিনি প্রাচীন কামরূপী বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের গুরুবংশ ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত শাদিখাঁ গ্রামের সদানন্দ গোস্বামী নামক জনৈক রাঢীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে রাজগুরু পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সদানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামানন্দ গোস্বামী রাজগুরু হন।

চার বৎসর বয়সে ১৭৬৩ সনে দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ছয় বৎসর বয়সে রতি শর্মা নামক এক ব্রাহ্মণের হাতে নিহত হন। এই অল্প বয়সে তিনি আদৌ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয় আছে।

ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ প্রথম বার ১৭৬৫ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রামানন্দের পিতৃব্য-পুত্র সর্বানন্দ গোস্বামী রাজাকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দানের পর রাজবাড়ীতেই অবস্থান করিতে থাকেন। রাজকার্যে রাজার অমনোযোগিতার সুযোগ লইয়া রাজগুরু এই সময়ে খুব প্রভাবশালী হইয়া ওঠেন।

মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল মাত্র দুই বৎসর। এই সময়ে রাজগুরুর নিকট হইতে তিনি দীক্ষা লইয়াও থাকিতে পারেন। ধরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালও দুই বৎসর। তাঁহার সিংহাসন-প্রাপ্তি বিষয়ে রাজগুরু সর্বানন্দ বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিষ্যকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজকার্যে সর্বতোভাবে সর্বানন্দ গোস্বামীর অংশ গ্রহণকে সকলে সুনজরে দেখে নাই।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ১৭৮৩ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় হইতে কোচবিহারের রাজধর্মের নূতন অধ্যায়ের শুভ সূচনা হয়। দীর্ঘ

দুই শত বৎসরের বৈষ্ণব প্রভাবের অবসান হয় এবং রাজা শাক্ত সাধনায় মনোনিবেশ করেন। নিজে শ্যামা বিষয়ক অনেকগুলি সংগীত রচনা করেন। তিনি নিয়মিত কালীর ধ্যান করিতেন। রাজধানীতে 'আনন্দময়ী কালী' এবং কাশীধামে 'করুণাময়ী কালী' স্থাপন করেন। নিত্য হোম ও কালী উপাসনার পর এই তান্ত্রিক রাজা স্বরচিত কালী বিষয়ক সংগীত সুললিত কণ্ঠে মাকে শোনাইতেন। সাগরদীঘি খনন এবং তাহার পাশে শিবমন্দির স্থাপন তাঁহার অমর কীর্তি। তবে তৎকালীন রাজগুরুর নাম পাওয়া যায় নাই। এই সময়েই রাজ-উৎসাহে প্রচুর ধর্মগ্রন্থ অনূদিত হয়। রাজা নিজেও বেশ কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই সময়কালকে সাহিত্য সাধনার সুবর্ণ যুগ বলা যায়। হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালেই রাসযাত্রার প্রচলন হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৯ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও শাক্ত উপাসক ছিলেন। তিনিও অনেকগুলি ভক্তি-সংগীত রচনা করেন। পিতাপুত্র দুইজনেরই রচিত ভক্তি-সংগীত বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পিতাপুত্রের এই গানগুলি কোচবিহার সাহিত্য সভার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণও মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার কাজে বিশেষ উৎসাহ দেখান।

মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ মাত্র ২২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কোন দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই। তাঁহার পর তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে দশ মাসের শিশু নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৬৩ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহারে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যাকে বিবাহ করার উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়াই ধর্মের নূতন ধারা এইখানে প্রভাব বিস্তার করে। রাজা-রাণী উভয়েই ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি এইখানে ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপন করেন। পুত্রদেরও নিজে উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্ম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সেই জন্য আমরা পরবর্তীকালের মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ এবং মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণকে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী বলে চিহ্নিত করিতে পারি। শশধর তর্ক চূড়ামণি নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে হিন্দু ধর্ম প্রচারে এখানে আসিয়াছিলেন। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্ম হইবার পর একদিন মদনমোহন বাড়ীতে গিয়া মা কালীর সামনে পাঁঠা বলি দেখিয়া বলি বিষয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন। এই সংবাদে ক্ষুব্ধ দ্বারপণ্ডিত এবং পূজারীগণ রাজাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার মনের ভাব

প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিতগণ তখন বলেন, "তবে সমস্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া 'পায়খানা' করিয়া দেওয়া হোক্।" এই কথায় রাজা বিচলিত হন এবং নির্দেশ দেন যে সব কিছু পূর্বের মতই চলিবে। জিতেন্দ্রনারায়ণ প্রথমে ব্রাহ্ম থাকিলেও ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে বিবাহের পর হিন্দু ধর্মে আকৃষ্ট হন। শ্রাদ্ধ কৃত্যাদি হিন্দু মতে করা হয়। তিনি নিয়মিত মদনমোহন বাড়ীতে যাইতেন। তিনি কাশীতেও গিয়াছেন।

কোচবিহারের রাজধর্মের আলোচনার শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই, মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের বহরমপুর নিবাসী সুনীল গোস্বামীর নিকট দীক্ষা ও উপনয়ন হয়। হিন্দু শাক্ত মতে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন পূজায় মহারাজার নামে সংকল্প করা হইত। ধর্মপ্রাণ মহারাজার শিষ্টাচার ছিল সুবিদিত। তিনি সশ্রদ্ধভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে সাক্ষাত করিতেন। নিজে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিতেন। খাগড়াবাড়ী শিবযজ্ঞ এই মহারাজের সময় হইতেই চালু হয়। তখন দ্বারপণ্ডিত ছিলেন রমাশঙ্কর ভট্টাচার্য।

তাঁহার মৃত্যুর পর বিরাজেন্দ্রনারায়ণ ১৯৭০ সনে রাজা বলিয়া ঘোষিত হয়। আজ আর সেই দিন নাই। সব জৌলুষ ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বর্তমানে রাজার বয়স এখনও কম। তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের অথবা ধর্মানুরাগের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এই আলোচনায় আমরা নানা ধর্মে অনুরক্ত কোচবিহার রাজপরিবারের ধর্ম বিষয়ে একটি পরিচয় তুলিয়া ধরিলাম। একথাও ঠিক যে রাজপরিবারের প্রভাবেই জনজীবনেও বিভিন্ন সময়ে একাধিক ধর্ম এখানে ঠাঁই লইয়াছে।

কোচবিহারে শঙ্করদেব

কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি হইল মিশ্র সংস্কৃতি। সেইজন্য দেখা যায়, বিভিন্ন ধর্মানুরাগী রাজ-আনুকূল্যে বা পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত। এখানে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ধর্মের ছাপ বেশী পড়িয়াছে। আবার মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মযাজকেরাও এখানে বিভিন্ন সময়ে আসিয়াছেন। জনজীবনে তাহাদের প্রভাবও কম নয়।

বিশ্বসিংহ (১৫২২-১৫৫৪?) কোচবিহারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ বারাণসীতে দীর্ঘদিন অধ্যয়নের জন্য থাকায় তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অনুকূল ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যও অর্জন করেন। তিনি মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণদের এই রাজ্যে আনিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সাধক ও মহাপুরুষ শঙ্করদেবের কোচবিহার আগমন কোচবিহারের ধর্মক্ষেত্রে এক স্মরণীয় ঘটনা। শ্রীশ্রীশঙ্করদেব আসামের নগাঁও জেলার কায়স্থ ভূঁইয়া কুলে ১৪৪৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির উপাসকদের লীলাভূমি কামাখ্যা পীঠের রাজ্য। শঙ্করদেবের পিতৃ-পুরুষেরাও ছিলেন শাক্ত। কুসুম্বর ভূঁইয়ার বৃদ্ধ বয়সে শিব সাধনার ফলে লব্ধ পুত্র শঙ্করদেব ওরফে গঙ্গাধর। প্রথম পত্নী বিয়োগের পর সংসারের প্রতি বৈরাগ্য হওয়ায় একমাত্র অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া বত্রিশ বৎসর বয়সে তীর্থ পর্যটনে বাহির হইয়া বার বৎসরকাল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন ও মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করেন। ভ্রমণান্তে দেশে ফিরিয়া আসার পর আত্মীয়-স্বজনদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেও তিনি সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া অনবরত কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকিতেন। গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করিতেন এবং স্বরচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গীত কীর্তন গাহিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে ভক্তি ধর্ম প্রচার করিতেন। শঙ্করদেবের দ্বিতীয় পক্ষে তিনপুত্র এবং এক কন্যা জন্মিয়াছিল। কিন্তু তিনি শিবের ন্যায় গৃহী হইয়াও পরম যোগীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া নিষ্কাম ভাবে শ্রীকৃষ্ণে আত্ম সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তিনি যেখানেই

গিয়াছেন সেখানেই ভক্তি ধর্ম প্রচার করিয়া দেশবাসীকে শুদ্ধ ধর্ম আশ্রয় করিবার উপদেশ এবং শিক্ষা দিয়াছেন।

শাক্ত ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব ধর্মের দ্রুত প্রচার দেখিয়া তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করে। শঙ্করের পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধির কাছে তাহারা কেহই আগাইয়া আসিতে সাহস করিল না। অহম রাজাদের ব্যক্তিগতভাবে শঙ্করদেবের প্রতি কোন বিরূপতা ছিল না, ধর্মজগতে বৈষ্ণবদের কোন বাধা তাঁহারা দিতে চান নাই। সেইজন্য ব্রাহ্মণগণ শাক্ত-রাজা নরনারায়ণের দ্বারা কাজ হাসিল করিতে চাহিল। বিরুদ্ধবাদী প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণেরা মহারাজা নরনারায়ণের নিকট শঙ্করদেবকে ধর্মদ্রোহী ও বর্ণাশ্রম ধ্বংসকারী বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করে। যার ফলে মহারাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্করদেব ও তাঁহার শিষ্য মাধবদেবকে বন্দী করিয়া আনিয়া হত্যা করিবার আদেশ দেন। ভাগ্যক্রমে রাজভ্রাতা চিলারায় (শুক্লধ্বজ) বৈষ্ণব ধর্মের অনুকূলে ছিলেন এবং শঙ্করদেবের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বিভিন্ন বিপদের হাত হইতে রক্ষা করেন। শঙ্করদেব চিলারায়কে কৃষ্ণলীলা চিত্র সম্বলিত একখানি দীর্ঘ বস্ত্র প্রদান করেন। পরে উহা রাজসভাতেও প্রদর্শিত হয়। চিলারায় তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে ব্রাহ্মণদের হাত হইতে যদি তিনি বিপদমুক্ত হইতে পারেন, তবে তাঁহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা চিলারায় করিয়া দিতে পারেন। তখন শঙ্করদেব বলেন, 'ব্রাহ্মণদের ভয় তাঁহার নেই, আছে রাজার ভয়।' সংবাদ খুব তাড়াতাড়ি রাজার কাছে পৌছাইল যে চিলারায় শঙ্করদেবকে নিজের কাছে রাখিয়াছেন। নরনারায়ণ চিলারায়কে নির্দেশ দেন যেন তিনি সেই ধর্ম-সংস্কারককে তাঁহার কাছে হাজির করেন। রাজা নরনারায়ণ শুধুমাত্র শক্তিশালী রাজাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি। যখন শঙ্করদেবকে রাজসভায় আনা হয় তখন তিনি তাঁহার শান্ত এবং সৌম্য মূর্তি দেখিয়া ভীষণভাবে অভিভূত হইলেন এবং রাজ-সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন। বিশেষ কক্ষে তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হয়। শঙ্করদেব রাজার কীর্তিব্যঞ্জক স্বরচিত শ্লোক পাঠ করেন এবং সুন্দর সুললিত ছন্দে তাহা আবৃত্তি করেন। ইহাতে রাজা খুব সন্তুষ্ট হন। পরদিন রাজা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শঙ্করদেবের এক বিতর্কের আয়োজন করেন। কিন্তু বিতর্কে যোগদানের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না। রাজা শঙ্করদেবের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করেন এবং শঙ্করদেবকে তাঁহার নির্বাচিত কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে যতগুলি সম্ভব কবিতা রচনা করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। শঙ্করদেব সাতটি

বিভিন্ন শ্লোক তৈয়ারী করেন রাজার নির্বাচিত শব্দের দ্বারা এবং তাহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করেন। কিছুদিন পরে একজন পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত রাজসভায় আসেন। রাজা তাঁহাকে শঙ্করদেবের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন, কিন্তু অবস্থা কঠিন বুঝিয়া সেই পণ্ডিত পলায়ন করেন। এই সংবাদে রাজা খুব আনন্দিত হইলেন।

রাজা নরনারায়ণ এখন শঙ্করদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখাইতে আরম্ভ করেন এবং বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শঙ্করদেব তাঁহাকে দীক্ষাদানে সম্মত হইলেন না। কেননা তাঁহার সংকল্প ছিল যে তিনি কোন রাজা, ব্রাহ্মণ এবং মহিলাকে দীক্ষা দিবেন না। যাহা হোক রাজানুকূল্যে কোচবিহারে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সমস্ত বাধা দূর হইয়া গেল এবং বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদের প্রচার শুরু হইল।

ব্রাহ্মণগণ নরনারায়ণের রাজসভায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হয় এবং বিভিন্নভাবে শঙ্করদেবের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। তবে তাহাদের সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। রাজসভায় একদিন রাজা পণ্ডিতদের ভাগবতের সারসংক্ষেপ তৈয়ারী করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই কাজে আট হইতে দশ দিন সময় লাগিবে। তখন শঙ্করদেবকে বলা হয়; তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ঐ পুস্তকের নাম 'গুণমালা'। পরদিন ঐ পুস্তক যথা সময়ে পাঠ করিবার পর পারিষদ সহ রাজা খুব সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। অনেক জ্ঞানী গুণী তাঁহার মুখ-নিঃসৃত বাণী শোনার জন্য সমবেত হইতে থাকে। অনেক মুসলমানও তাঁহার কাছে আসিতে আরম্ভ করে ভক্তিবাদের ব্যাখ্যা শোনার জন্য। এইভাবে ভক্তিবাদ একটি নূতন ধর্মের রূপ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে শঙ্করদেব কাগজ-কুটা গ্রামে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, তার ফলে ঐ গ্রাম পবিত্র স্থানে রূপান্তরিত হয়।

বিরোধী ব্রাহ্মণেরা রাজার কাছে একবার বলিল যে, 'শঙ্করদেব দেবতাকে উৎসর্গ না করিয়াই বিভিন্ন প্রাণীর মাংস খাইতেছেন।' একদিন রাজ-আদেশে মাংসের পাত্রসহ তাঁহাকে রাজসভায় আনা হয়, কিন্তু পাত্রের আচ্ছাদন খোলার পর দেখা যায় যে পাত্রের মধ্যে চিনি, মধু, কলা, দুধ ইত্যাদি আছে। এই দৃশ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে ইনি মানুষ নন, দেবতা। পরে রাজা তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন।

দুর্গাপ্রসাদ লিখিয়াছেন যে—শঙ্করদেব রাজাকে একদিন বলিলেন, 'তোমার রাজ্যে ভগবান বিষ্ণুর কোন মন্দির নাই। যেখানে বিষ্ণুর মন্দির নাই, সেখানে আমি কুশাগ্রভাগ পরিমাণ জলও গ্রহণ করিতে পারি না। যদি তুমি বিষ্ণুর মূর্তি স্থাপন করিতে পার তবে আমি এইখানে অন্নজল গ্রহণ করিতে পারি।' এই কথা বলিয়া তিনি কাগজকুটাতে চলিয়া আসেন। তখন রাজা স্বর্ণকার এবং অন্যান্য কর্মীদের নিয়োগ করিয়া বিভিন্ন ধাতুর বিষ্ণু মূর্তি প্রস্তুত করান, যাঁহার নাম বংশীধর বা মদনমোহন।

রাজা পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে মাঘ মাসের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ণিমা তিথিতে মূর্তি প্রতিষ্ঠা কার্য সুসম্পন্ন হইবে। শঙ্করদেব এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা তাঁহাকে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে বলিলে তিনি ধীরতা এবং মাধুর্যের সঙ্গে বলিলেন যে, 'তোমার পুরোহিত দ্বারাই অনুষ্ঠান হোক। আমার সঙ্গে যে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারাই দেখাশোনা করিবেন।' রাজা নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ উভয়েই মূলত শাক্ত ছিলেন এবং দেবীর আরাধনা করিতেন, কিন্তু দুইজনেই শঙ্করদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং বিষ্ণুর মূর্তি স্থাপন করেন। দেবী কাত্যায়ণী খুব আনন্দিত হইয়া বীরভদ্রকে কৈলাস হইতে প্রেরণ করেন, তিনি সন্ন্যাসীর বেশে রাজার কাছে যে পবিত্র শিলাটি অর্পণ করেন তাহা আজও লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি রূপে পূজা করা হইয়া থাকে।

শঙ্করদেবের সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণের মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়; এমনকি স্বয়ং রাজা এবং রাজপরিবারের লোকজনেরা তাঁহার ভক্ত হইয়া ওঠেন। নরনারায়ণ নিজে মহাপ্রভু শঙ্করদেবের নিকট হইতে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু শঙ্করদেবের পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে আর তাহা সম্ভব হয় নাই। কাহারো মতে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ১৫৬৮ খ্রীঃ শঙ্করদেব মানবলীলা সংবরণ করেন।

মধুপুর ধাম

প্রবাদ মতে কোন এক সময় তীর্থ যাত্রাকালে শঙ্করদেব মহাপুরুষ, মাধবদেবাদি ভক্তগণ সহ পথে কোচবিহার রাজ্যে নির্জন স্থানে এক পাকুড় গাছের নীচে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ঐ গাছে একটি পূর্ণাঙ্গ মধুমক্ষিকার চাক ছিল এবং উহা হইতে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া মধু ক্ষরিত হইতেছিল।

এইদিকে সমবেত ভক্তবৃন্দের নিকট শঙ্করদেব মধুমাখা ভাগবত-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ইহা দর্শনে মাধবদেব নাকি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "কি মধুময় স্থান। একদিকে বৃক্ষ হইতে বাস্তব মধুক্ষরণ, অপর দিকে গুরুর মুখ হইতে ভাগবত মধুক্ষরণ, আবার স্থানটি ভক্তবৃন্দের পদরজে মধুলিপ্ত, সত্যই ইহা মধুপুর।" এই কাহিনীর সত্যতা নির্ণয়ের প্রয়াস না করিয়াও বলিতে পারি যে আজ বহু স্মৃতি বিজড়িত এই সত্রটি শঙ্করপন্থী বৈষ্ণব সমাজের কাছে একটি পবিত্র তীর্থস্থান। কোচবিহার অধিপতি প্রথমে এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৯৬৪ খ্রীঃ মূল মন্দিরটির আমূল সংস্কার করা হয়। আট কোণা, পূর্ব মুখী এই মন্দিরটির গায়ে নানা মূর্তি উৎকীর্ণ করা আছে। মন্দিরের ভিতরের সিংহাসনটি অসমীয়া রীতিতে সজ্জিত। অসমীয়া সত্রাধিকারী মন্দিরের পূজক হিসাবে রহিয়াছেন। এইখানে শঙ্করদেবের ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্রও আছে। তাহা ছাড়াও তাহার লিখিত ভাগবত ইত্যাদি পুঁথি আছে, যাহা বিশেষ দিনে দর্শনার্থীদের কাছে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ছাড়া নিয়মিত পূজাও হইয়া থাকে। গর্ভগৃহে সব সময় প্রদীপ জ্বালানো থাকে। মূল মন্দির ছাড়াও এইখানে আরও কয়েকটি মন্দির আছে, তাহার মধ্যে কীর্তন ঘরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইখানে রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, শ্রীপঞ্চমী ইত্যাদিতে বিশেষ উৎসব এবং অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। রাসমেলার সময়ে আসাম হইতে বহু তীর্থযাত্রী এই পুণ্য ধাম দর্শনে আসিয়া থাকেন।

———

বৈষ্ণব দর্পণে কোচবিহার

শঙ্করদেব কোচবিহারে অবস্থানকালে রাজপ্রাসাদে গিয়া ধর্ম আলোচনা করিতেন। তখন হইতেই উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ হইতে সাধারণ চণ্ডাল পর্যন্ত তাঁহার ভক্ত হইয়া ওঠে। যুবরাজ শুক্লধ্বজ এবং তাঁহার কন্যা ভুবনেশ্বরী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাজা নরনারায়ণের ভক্তি ছিল, তিনি এই সনাতন মন্ত্র তাঁহার কাছ হইতে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করদেবের ইচ্ছা না থাকায় তাহা আর হয় নাই।

কোন কোন সমালোচক বলেন যে, শঙ্করদেবের প্রবর্তিত মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের প্রচ্ছন্ন রূপ ; কিন্তু ইহা সত্য নয়। কারণ দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্মীদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা রাজসভা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মতের পার্থক্যও লক্ষণীয়, যেমন শঙ্করদেব যেখানে মহাধর্মের কথা বলিয়াছেন, সেইখানে বৌদ্ধরা সদ্ধর্মের কথা বলিয়া থাকেন। অনেকে আবার বলেন যে শঙ্করদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে তন্ত্রাচার ঢুকিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহারও সত্যতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শঙ্করদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব অবতার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যেমন বাংলার অবতার, আসামে অনুরূপ শঙ্করদেব। কিছু সংখ্যক আধুনিক লেখক বলেন শঙ্করদেব চৈতন্য মতে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কেউ কেউ আবার বলেন যে, চৈতন্যদেব তাহাকে ধর্ম-শিক্ষা দিবার জন্য কামরূপে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভক্তদের লেখা হইতে এই বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রায় সকল জীবনীকারই বলিয়াছেন যে শঙ্করদেব বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তককে দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে কয়েকটি মত—

১। শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

২। তাঁহাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয় নাই।

৩। শঙ্করদেব তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যক্ষভাবে কিছু গ্রহণ করেন নাই।

চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তির পূজক আর শঙ্করদেব একক কৃষ্ণ মূর্তির উপাসক। শঙ্করদেব গৃহী আর চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী। চৈতন্যদেবের মতে দেহের ভিতর ও বাহির দুইটির উপাসনা, আর শঙ্করদেবের মতে রক্ত-মাংসের দেহের মধ্যে যে আত্মা তাহার উপাসনা। শঙ্করদেব বলিয়াছেন, এই নশ্বর দেহের পূজা

করিয়া কোন লাভ নাই। ইহা তো পচনশীল, সেইজন্য একজনের সেবা করাতেই মুক্তি। রাধাকৃষ্ণ একদেহে বিরাজমান। এক রূপেই সব।

শঙ্করদেবের মূলমন্ত্র—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম।—চার শব্দ, আট অক্ষর।

চৈতন্যদেবের মূলমন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—ষোল শব্দ, বত্রিশ অক্ষর।

শঙ্করদেব তিলক ধারণ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। তবে ব্রহ্মচর্য পালন এবং শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতে বলিয়াছেন। মস্তক মুণ্ডন সম্পর্কেও কিছু বলেন নাই। কিন্তু চৈতন্যপন্থীদের মধ্যে মস্তক মুণ্ডনের প্রভাব দেখা যায়। শঙ্করদেব শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ এই তিন প্রকারের পথকেই বেশী গুরুত্ব দিয়াছিলেন। পূজা রাজসিক ব্যাপার, সেইজন্য সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবু রাজাকে সহজ পথ হিসাবে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। মধুপুরের কীর্তন মন্দিরে তাই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শঙ্করদেব চতুর্ভুজ, আশ্রয়ী-ধর্ম ও বাসুদেব বিগ্রহের পূজক। এইখানে বিগ্রহের নামে রাজা নরনারায়ণ জমি দান করেন, তাঁহার সেবায়েত হন শঙ্করদেব। বর্তমানে ৭৫ বিঘা জমি আছে। আর ১৭·৭৫ পয়সা দেবোত্তর বিভাগ হইতে মাসিক পূজার জন্য দেওয়া হয়।

মধুপুর ধামের একটি বৈশিষ্ট্য হইল, মূল মন্দিরে শঙ্করদেব পূর্বাস্য হইয়া যোগাসনে সিদ্ধিলাভ করেন, কিন্তু সমবেত ভক্তগণ পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া প্রণাম করেন। সেইখানে এখনও সব কিছু পশ্চিম দিকেই হইয়া থাকে। পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া প্রণাম করিতে হয়, পাঠ, কীর্তন ইত্যাদি এইভাবেই হয়। কিন্তু অন্যত্র এরূপ ব্যবস্থা দেখা যায় না। মূল মন্দিরে সবসময়েই প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। পুরোহিতের মতে মাধবদেব এই প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার মতে এই প্রদীপ জ্ঞানের প্রতীক। জড়মন্দির বাদ দিয়া জ্ঞান-প্রদীপ জ্বালানো দরকার, আর দরকার মনোময় দ্রব্যের সাহায্যে (ফুল, তুলসী ইত্যাদির দ্বারা) পূজা এবং কীর্তন ধ্যান বিশেষভাবে করা। যে স্থান হইতে সৎ শাস্ত্রবাণী সতত প্রচারিত হয় তাহারই নাম 'সত্র'। মন্দিরের প্রধানকে বলা হয় 'সত্রাধিকারী'। 'অধিকারী' বলিতে অধিক জনের উদ্ধারের দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করেন তাঁহাকে বুঝায়। আর যাঁহারা এই ভার বহনের পরেও একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বা সত্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁহাকে বলা হয় 'সত্রাধিকারী' বা 'ছত্রাধিকারী'। আজও মধুপুর ধাম বৈষ্ণবদের কাছে বিশেষ তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত। পরবর্তীকালে শঙ্করদেব এবং তাঁহার শিষ্য দামোদরদেবের মধ্যে

মতের কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শঙ্করদেব দুর্গাপূজায় মত দেন নাই, কিন্তু দামোদরদেব দিয়াছিলেন।

শঙ্করদেবের পর ধর্মগুরু হিসাবে মাধবদেব এবং দামোদরদেব কোচবিহারে আসিয়াছিলেন এবং রাজপ্রাসাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ধারা আমরা পরবর্তী কোন কোন রাজার আমলেও লক্ষ্য করিয়া থাকি। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হন। এই সময়ে মাধবদেব গুরুরূপে কোচবিহারে ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা প্রথমে বৈষ্ণব মতের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু মাধবদেবের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং নূতন ভাবে বৈষ্ণব মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করিয়া রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেন ও রাজকীয় পূজাপদ্ধতিতে কিছুকালের জন্য পশুবলি নিষিদ্ধ করেন। রাজকুমার বীরনারায়ণ মাধবদেবের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন। পরে বীরনারায়ণ রাজা হন। তাঁহার পর প্রাণনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় কোচবিহার 'ধর্মরাজ্য' বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। মধুপুরের বনমালী গোঁসাই মহারাজ প্রাণনারায়ণের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। পরবর্তীকালেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কাজে কোন বাধা আসে নাই। রাজা নরনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য দেবতাই আজিকার মদনমোহনের রূপ লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে রাজাদেরও বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। আজ কোচবিহারের জনজীবনে শ্রীশ্রীমদনমোহন বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে মদনমোহন মন্দির ও বৈষ্ণব সত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মদনমোহনকে স্মরণ করিয়া বিভিন্ন উৎসব এখনও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। কোচবিহারের ধর্মীয় জনজীবনে বৈষ্ণবদের মধ্যে শঙ্করপন্থী, দামোদরপন্থী, চৈতন্যপন্থী প্রভৃতি বর্তমানে দেখা যায়। এখনও অনেক স্থানে অধিকারী সম্প্রদায় গুরুগিরির কাজ করিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের প্রতি জনগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা খুবই গভীর।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব প্রভাব কম নয়। তখনও মুদ্রিত আকারে বই প্রকাশিত হয় নাই। সেই জন্য প্রাচীন অনেক পুঁথি এখানকার গ্রন্থাগারগুলিতে এখনও পাওয়া যায়। আবার অনেক ধর্ম-কথা অলিখিত থাকায় কালের গতিতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে কয়েকটি বৈষ্ণবীয় পুঁথি সংগৃহীত আছে তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি—জন্মাষ্টমী, ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ, শ্রীচৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস (আদ্য, মধ্য, অন্ত খণ্ড), শ্রীভাগবত বৈষ্ণব চরিত্র, বৈষ্ণব বন্দনা, চৈতন্য গীতা, হরিনাম কবচ, চৈতন্যচরিত, গীতগোবিন্দ,

পীতাম্বর-কৃত ভাগবত দশম স্কন্ধ ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও শঙ্করদেব ও মাধবদেব-কৃত অনেকগুলি বৈষ্ণবীয় প্রাচীন পুঁথি এইখানে পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলির মধ্যে বেশ কয়েকখানি কোচবিহারেই রচিত হইয়াছিল। ধর্ম-সাহিত্য সৃষ্টিতে শুধুমাত্র বৈষ্ণবীয় সাহিত্য নয়, অন্য বহু মূল্যবান ধর্ম পুস্তকও পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম ও সাহিত্য অনুরাগী রাজারাও এই বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আবার কোন কোন বিদ্যোৎসাহী রাজা গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্য-সাধনায় উৎসাহ দিয়াছেন। ধর্মরস পিপাসাকে তৃপ্ত করার প্রবণতা তখন হইতেই দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ রচনায় কোচবিহারের দান কোন অংশেই কম নয়। এই অধ্যায় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কোচবিহারে দুই বৈষ্ণব মহাপুরুষের প্রভাবই পড়িয়াছে। সেইজন্য আজ তাহাকে সম্প্রদায়গতভাবে ভাগ করা খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়। আবার শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে কোনটি বিশেষ প্রবল ছিল তাহা বলাও সহজ নয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব, সংঘাত বা কলহের সংবাদ সাধারণের মধ্যে কোথাও পাওয়া যায় না। এখনও দেখা যায় বাণেশ্বরে দোল উৎসব হয় এবং এখানকার অন্য উৎসবগুলিও শৈব এবং বৈষ্ণবের মিলিত উৎসবে পরিণত হইয়াছে। এখানকার উৎসর্গকৃত পশুর বিষয়েও বৈষ্ণব প্রভাব আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

শঙ্করদেব প্রচারিত মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব ধর্ম কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের জনজীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল? নিঃসন্দেহে বলা যায়, শিব ও শক্তির প্রতি অনুরক্ত মনের মাটিতে বৈষ্ণব ধর্মের যে আদর্শটি ছিল তাহা রাধাকৃষ্ণের রাখালিয়া প্রেমের রং-এ রাঙ্গানো। কোচবিহারের লোকসাহিত্য সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

সঙ্গীত জগতেও বৈষ্ণব প্রভাব কম নয়। কোচবিহারের জীবনধারার মধ্যে যে লোকসংস্কৃতি, পল্লীগীতি, লোকগাথা, উপাখ্যান ইত্যাদি পাওয়া যায় তার মধ্যেও ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির ছাপ বিদ্যমান। এই সমস্ত গানের মধ্যে সমাজ-জীবন, পারিবারিক জীবন ইত্যাদির ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কোচবিহারের সাধারণ মানুষের মধ্যে দেহতত্ত্বমূলক গানের প্রচলন আছে এবং সাধারণত এইগুলি ভক্তি-বিষয়ক। কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলে বাউল, ফকিরদের মধ্যে যথেষ্ট দেহতত্ত্বমূলক গান শোনা যায়। দোতরা, ঘোমক, সারেঙ্গা ইত্যাদি বাজাইয়া বাউল-ফকিরেরা পল্লী অঞ্চলে গান গাহিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। একটি দেহতত্ত্বমূলক গানের নমুনা—

চল দেখি মন গৌরাঙ্গের টোলে।
হয় ভাগবত, গীতা, হরিকথা, প্রেমদাতা নিতাই বলে ॥

ভাওয়াইয়ার অন্তর্গত দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানগুলির দুইটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষণীয়। প্রথমত এইখানে রহিয়াছে বৈষ্ণব গীতিকাব্যের দেবতার সেই অভেদ অভিন্নতার তত্ত্ব। দ্বিতীয়ত ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সেই আদি প্রেমতত্ত্ব কোথাও বা দেহতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া দেহাতীত হইয়া ধর্মের মন্দিরে গিয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা উদাস বাউল সুর। বৈষ্ণব কাব্যের সেই বিরহ-বেদনার আর্তি ও বাৎসল্য রসের দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়াছে এই গানগুলির মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলার বহু কাহিনীই নব রূপ গ্রহণ করিয়াছে গ্রামের এই রাখালিয়া গানের মধ্যে। এখানকার নারীর (রাধা) বিরহ গানের মধ্যে কৃষ্ণ কোথাও মইষাল বন্ধু, কোথাও বা মাহুত বন্ধু, আবার কোথাও বা কালা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজের কালা কোচবিহারের মাটিতে নূতন রূপ ধরিয়াছে। সমালোচকেরা যদিও বলেন এ কালা কৃষ্ণ নয়, তবুও মনে হয় প্রচ্ছন্ন আকারে তাহার প্রভাব রহিয়াছে।

ও মোর কালারে কালা
ওরে কালা ঘরে রইতে দিলিনারে
ওরে ধিক ধিক মইষাল রে মইষাল ধিক গাবুরালী,
(যৌবন) এ হেন সুন্দর নারী কেমনে যাইবেন ছাড়ি মইষালরে
তোমরা গেইলে কি আসিবেন, মোর মাহুত বন্ধুরে···ইত্যাদি।

ইহা ছাড়াও ভাওয়ায় (গোষ্ঠ লালা) পাওয়া যায়—

"ও মা জননী বিদায় দ্যাও মা যাব বৈদ্যাশে।"

শচীমাতার খেদ, নিমাই সন্ন্যাস পালার গান ইত্যাদিও ভাওয়াইয়া সুরে গাওয়া হইয়া থাকে। এই সমস্ত গানগুলি ছাড়াও রাখাল বালকেরা অসংস্কৃত কণ্ঠে এখনও গান গাহিয়া থাকে। সেইজন্য মনে হয় রাধাকৃষ্ণ অতি সাধারণ রূপ ধরিয়া কোচবিহারের মাটিতে ঘর বাঁধিয়াছেন। ইহা ছাড়াও প্রেম সঙ্গীতের জনপ্রিয়তাও কম নয়।

কৃষ্ণযাত্রা, কৃষ্ণলীলাও এইখানে গাওয়া হয় প্রাচীন কাল হইতে। কয়েকটি যাত্রাগানের দলও গড়িয়া ওঠে। অলিখিত থাকায় অথবা যত্নের অভাবে এখনও সেগুলি সংগ্রহ করা যায় নাই। এই সমস্ত যাত্রাগানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হইত। স্থানীয় গীদালের (মূল গায়ক) দলও অনেক সময় কৃষ্ণযাত্রা এই-খানেও করিয়া থাকে। এইগুলি স্থান বিশেষে অভিনব চরিত্ররূপ পাইয়াছে।

ইহা ছাড়াও ঢোলক, করতাল, খোল দিয়া অনেক গান কীর্তনের সুরে গাওয়া হয়, যেমন—

'কালা তুই আমারে কুলের বাহির করলি রে।
আরে ওরে কালা····· ।

চটকায় বর্ণিত এই রাধাকৃষ্ণ পৌরাণিক দেবমূর্তি পরিহার করিয়া রক্তমাংসে গড়া মানব-মানবী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের নাম যে কোন কারণেই হোক না কেন আদর্শ প্রেম সঙ্গীতের বিষয়বস্তু। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ লীলা অনেকাংশে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া ও অন্যান্য সঙ্গীতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কানাই নৌকা দিয়া লোক পারাপার করে আর রাধা একজন যাত্রী—সে পার হইতে চায়, কিন্তু নৌকাটি যে ভাঙ্গা, সেই কথা রাধা বলিতেছে—

তোক্ কঙ রসিক কানাই
তোর যে ভাঙ্গা নাও।···

কানাই ধামালী বা জাগের গান কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের আর একটি অভিনব সম্পদ। বিভিন্ন পালাগানে চরিত্ররূপ বিভিন্ন। কোন কোনটিতে রাধাকৃষ্ণ এবং বড়াই তিনটি চরিত্র লইয়া, আবার কতকগুলিতে চরিত্র সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণের কথোপকথনের মাধ্যমে কিছুটা অশ্লীলতার ছাপ থাকিলেও গ্রাম্য স্বাভাবিক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় ভদ্র পরিবেশেও এই সমস্ত পালা অভিনীত হইত এবং ৺গোবিন্দচরণ প্রামাণিক রচিত একটি কানাই ধামালী রেকর্ড করাও হইয়াছিল। পল্লী কবিদের স্বভাব-কল্পনার ভাব প্রকাশ পায় এই পালা গানগুলিতে। ভাষার দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাদের বলা যায় মিশ্র ভাষা। রাধাকৃষ্ণ এইখানে মাছ ধরিতে আসিয়াছে। কোথাও বা রাধা শাক তুলিতেছে। কোথাও বা আছে বিরহ ব্যথার কথা।

প্রভাতী সঙ্গীতের বৈষ্ণব রূপ এখন কোচবিহারে শোনা যায়। মনে হয় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বৈষ্ণবদের প্রভাবই এইখানে বেশী।

আজ কোচবিহারে বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের প্রভাব বেশী, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে মতের ও পথের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইতেছে। তথাপি এখনও কোচবিহারে বৈষ্ণব ধর্ম একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়া আছে। কেননা—

"এখনো সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটিরে।"

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীশঙ্করদেব

বাংলা ও আসামের ধর্ম জীবনের সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীশঙ্করদেব দুই প্রান্তে আবির্ভূত হইলেও মূলত তাঁহারা প্রায় একই এলাকার। কারণ চৈতন্য পরিবারের আদি নিবাস শ্রীহট্টও আসাম সংলগ্ন অঞ্চল, আর শঙ্করদেবের জন্মস্থান আসামের নওগাঁ জেলা। তাঁহারা আপন সাধনা, প্রেম, ভালবাসা ও ভক্তিভাবে সর্বস্তরের মানুষের মনের দুয়ারে প্রবেশ করিয়া নূতনভাবে ধর্ম-স্রোত প্রবাহিত করেন।

আসামে তখন ব্রাহ্মণ-প্রধান শক্তিবাদের ব্যাপক প্রসার, একদল মানুষ তাহাকে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করিয়া সাধারণ মানুষের মনে ধর্ম বিষয়ে বিদ্বেষ ভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল। সেই সময়ে শঙ্করদেব বৈষ্ণব ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়া ত্রাণ-কর্তা হিসাবে অবতীর্ণ হন। অপর দিকে বাংলার ধর্ম-জীবনেও এক পঙ্কিল পরিস্থিতিতে প্রেম ভক্তিরসে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করেন বৈষ্ণবসাধক সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি প্রচারধর্মী ইসলামী মুসলমান রাজার এবং হিন্দু সমাজের শতধা বিচ্ছিন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রেমহীন সমাজের প্রতিকূল পরিবেশে ত্রাতারূপে অবতীর্ণ হন। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আর শঙ্করদেবের (১৪৪৯-১৫১৮ ?) এই ধরাধামে অবস্থান প্রায় একই সময়ে।

এই সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই দুই বৈষ্ণব দিকপাল ধর্ম-প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করেন। ইঁহাদের পথ এক হইলেও মত ছিল ভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে কতটুকু মিল এবং অমিল আছে সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। উভয়ের ব্যক্তিগত জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেহরূপ, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, যুক্তিবাদিতা, বিচক্ষণতা, দুইবার বিবাহ, তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ মিল দেখা যায়। চৈতন্যদেব যেমন তীর্থ ভ্রমণে এক বৎসর আট মাস ছাব্বিশ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তেমনি শঙ্করদেব দীর্ঘ বার বৎসর কাল ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া ভারতের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। শঙ্করদেব শাক্ত কায়স্থ পরিবারের ছেলে হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন, আর নিরামিষ ভোজী হন। চৈতন্য-জীবনে এরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই কারণ তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত।

চৈতন্যদেব কোন গ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু শঙ্করদেব ধর্মগ্রন্থ, নাটক, গীত ইত্যাদি রচনা করিয়া এক

অভিনব আদর্শ স্থাপনা করেন। তাঁহার রচনার রূপ অনুসারে শ্রেণীভাগ করা যায়।

১। কাব্য :—১। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, ২। রুক্মিণী হরণ কাব্য, ৩। বলিছলন, ৪। অমৃত মথন, ৫। গজেন্দ্র উপাখ্যান, ৬। অজামিল উপাখ্যান, ৭। কুরুক্ষেত্র।

২। ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশক সংগ্রহ :—১। ভক্তি প্রদীপ, ২। ভক্তি রত্নাকর. [সংস্কৃত], ৩। নিমি নব-সিদ্ধ সংবাদ।

৩। অনুবাদমূলক :—১। ভাগবত—১ম, ২য়, ১০ম, ১১শ, ১২শ স্কন্ধ, ২। উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ।

৪। অঙ্কীয়া নাট :—১। পত্নীপ্রসাদ, ২। কালি দমন, ৩। কেলিগোপাল, ৪। রুক্মিণী হরণ, ৫। পারিজাত হরণ, ৬। রাম বিজয়।

৫। গীত :— ১। বরগীত, ২। ভটিমা।

৬। নামপ্রসঙ্গ :—১। কীর্তন, ২। গুণমালা।

(সূত্র—‘অসমীয়া সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’—ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা। পৃঃ ১০৯)

চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে চৈতন্য অনুরাগী বহু পণ্ডিত, ভক্ত এবং সেবক তাঁহার ধর্ম-কথা, চরিত-কথা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মুরারী গুপ্ত, স্বরূপ দামোদর, কবি কর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস প্রভৃতি অপূর্ব ভক্তিভাবে আপ্লুত হইয়া মনের মাধুরী মিশাইয়া অপূর্ব চরিতকথা রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে নূতন পথের সন্ধান দেন। পরবর্তীকালে এইগুলি ব্যাপক প্রচার লাভ করে। আজও বহু পরিবারে এই অমূল্য গ্রন্থগুলি সযতনে পঠিত ও রক্ষিত হয়। একদিকে জীবনীকার ও অপরদিকে নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি পার্ষদদের প্রভাবে ও ভাবে এই ধর্ম আরও প্রচার এবং প্রসার লাভ করে। চৈতন্য-দর্শনকে বলা যায় ভারতীয় মূল শাস্ত্র সার। গাছের মূল থাকে একটি আর তার শাখা-প্রশাখা বহু ভাবে বহু রূপে পল্লবিত হয়। চৈতন্য ভাষ্যকারেরাও এই ভারতীয় মূল সূত্রকে সময় উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করিয়া জনমনে দোলা দিতে পারিয়াছে। চৈতন্য মতের প্রচার সহজ হয় ভাবের বন্যায়। প্রেম আলিঙ্গনে সবার মন কাড়িয়া লয়। সহজ প্রেমের, সহজ সরণীই হইল তাঁহাদের লক্ষ্য। কীর্তনে নগর পরিক্রমা, কীর্তনকেই প্রচার মন্ত্র, ইহাকেই সম্মোহিনী শক্তি বলা যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু রাধাতত্ত্ব প্রচার করেন। এই স্থানে রাধাকৃষ্ণ একীভূত। ভাবে চৈতন্যদেব কখনো রাধা, কখনো কৃষ্ণ,

সাকার রূপে সাধন লোকে গমন। খালি হাতে যেমন আগুন আনা যায় না, তাহার জন্য একটি মাধ্যম দরকার।

কিন্তু শঙ্করদেব সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিতেন। তিনি হইলেন অদ্বৈতবাদী। একের মধ্যেই দুই, ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা। ভক্তি ভাবই তাঁহার মূলকথা। শঙ্করদেব নিজেকে "কৃষ্ণের কিঙ্কর" বলিয়াছেন। তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম, সূত্রের কোন ভাষ্য তিনি রচনা করেন নাই। "এক দেব, এক সেব, এক ভিন্ন নাই কেব।" সেইজন্য এইখানে পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন নয়। তাঁহার মধ্যেই সব আছে। শঙ্করদেব এককভাবে সাধনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের মত ভাবের বন্যায় জনমনে দোলা দিতে চেষ্টা করেন নাই। ভক্তিবাদী হিসাবে তিনি কিছুটা প্রচার বিমুখতা ছিলেন। কোচবিহার অধিপতিদ্বয় নরনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও সেনাপতি চিলারায়ের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রচার বিমুখ থাকায় আজ শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবের প্রভাব এই অঞ্চলে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। দৈত্যারী ঠাকুর, ভূষণ দ্বিজ, রামচরণ ঠাকুর, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি জীবনীকারেরা আসামী ভাষায় যে অমৃত কথা চয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কোচবিহার অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা না হওয়ায়, জনমনে বিশেষ দাগ কাটিতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়। শঙ্করদেব রচিত গ্রন্থগুলির ভাষাও শুদ্ধ বাংলা নয়। প্রকাশনা অনেক বিলম্বে হওয়ায় প্রচারে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইতিহাস ঘাঁটিলে কোথাও দেখা যায় না যে শঙ্করদেব দীক্ষা বিষয়ে নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। রাজা নরনারায়ণ তাঁহার গুণগ্রাহী হইলেও তাঁহাকে দীক্ষা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। শঙ্করপন্থীরা কীর্তন করিয়া নগর পরিক্রমা করিয়াছেন বলিয়া কোন নজির দেখি না। তিনি তাঁহার আদর্শকে কঠিনভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তাই আপামর জনসাধারণের কাছে তাড়াতাড়ি তাঁহার বাণী পৌছাইতে পারে নাই।

কিন্তু চৈতন্যদেব সর্বভারতীয় স্তরে দুর্লভ ধর্মীয় নেতৃত্বের নজির সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত স্তরের লোককে প্রভাবিত করেন। তাঁহার ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনার সরলীকরণ ও সার্বিকরণ পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তুলনীয়। চৈতন্যদেব ৪৮ বৎসরের অলৌকিক জীবনের ২৪ বৎসর বাংলায় এবং ২৪ বৎসর বহির্বাংলায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার উল্লেখ্য কীর্তি ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে হিন্দুদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুপ্রভাব হইতে মুক্তকরণ, হিন্দু সমাজের পতিত অচ্ছুৎদের সম্মানজনক স্থান প্রদানে "চণ্ডালোঅপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ"

বলিয়া সঞ্জিবনী মন্ত্রে হিন্দুদের আত্মমর্যাদার উদ্বোধন ; উচ্চ, নীচ, ধনী দরিদ্রের মিলন ; মুসলমান রাজাদের প্রেমধর্মের বিরুদ্ধে অত্যাচার প্রতিরোধ, কাজী দমন, হিন্দু গুণ্ডাদের দমন, সমাজে শান্তি স্থাপন, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে প্রচার ও সাম্যভাব স্থাপন তৎসহ রাধাতত্ত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধন-ভজনকে পঞ্চরসের আবির্ভাবের গৌরব দান, তাহার সঙ্গে ১২ বৎসর গম্ভীরালীলায় কাল যাপন প্রভৃতি।

এই দুই পরম বৈষ্ণবের মধ্যে সাক্ষাৎকার বিষয়ে নানা মত বিদ্যমান। তবে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হন নাই, সে বিষয়টি পরিষ্কার। চৈতন্যদেব তাঁহার জীবত কালেই নিজে এবং তাঁহার পার্ষদ মাধ্যমে প্রবল ভাবের বন্যা আনেন, কিন্তু ভক্তিবাদী শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেব প্রচার যন্ত্রকে সচল করেন এবং মহাপুরুষীয়া মতবাদ প্রচারক হিসাবে প্রাধান্য পান। দামোদরদেবও শঙ্করদেবের প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে একজন। প্রচার কর্মী সংখ্যাও আনুপাতিক হারে অনেক কম।

শঙ্করদেবের পরবর্তী কালেও রাজপরিবারে তাঁহার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। অনেক রাজাই তাঁহার শিষ্যদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং রাজগুরুপদেও বরণ করিতেন। কিন্তু মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণ মুর্শিদাবাদের সদানন্দ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে রাজগুরু পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় হইতেই শঙ্করপন্থীদের প্রভাব আরও কমিতে থাকে বলিয়া মনে হয়।

আসামেও রাজরোষ এবং ধর্মীয় প্রাচীন বিশ্বাসের চাপে শঙ্করের ভাবধারা ব্যাপক প্রচার লাভের সুযোগ পায় নাই। শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর শঙ্করদেব-শিষ্য মাধবদেব এবং দামোদরদেবের মধ্যে নেতৃত্ব ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা লইয়া মত-বিরোধ দেখা দেয় এবং ইহাতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রচার কার্য ব্যাহত হয় বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে চৈতন্যপন্থী প্রচারকেরা আসামে ধর্ম প্রচারে আসেন। প্রচারের শুরুতেই চৈতন্য মত লইয়া কোন বিরোধ দেখা যায় নাই।

শঙ্করদেবের মতবাদ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে দাস্যভাব প্রবল। গুরু এবং সেবকের মধ্যে সম্পর্ক। কৃষ্ণই সব। তিনিই অবতার শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য কোচবিহারে মদনমোহন রাধাবিহীন অবস্থায় বিরাজমান। এক শরণই তাঁহার আদর্শ। নিষ্কাম ভক্তিই তাঁহার শেষ কথা।

শঙ্করাচার্য বাংলাদেশ ও কামরূপ অঞ্চলে তাঁহার মত প্রচারে অসিয়াছিলেন

বলিয়া তাঁহার জীবনীপাঠে জানা যায়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখা যায়, এমনতর বহু ধর্মযাজকের আসা-যাওয়ায় ধন্য কোচবিহার অঞ্চল।

বর্তমান কালের অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় আসামে শঙ্করপন্থী অনেক 'সত্র' গড়িয়া উঠিয়াছে। পাশাপাশি চৈতন্যপন্থী সম্প্রদায়ও রহিয়াছে। কোচবিহারেও বর্তমানে একই অবস্থা বিরাজমান। কোচবিহারে শঙ্কর-পন্থীদের পবিত্র তীর্থস্থান থাকিলেও শঙ্করপন্থীদের প্রভাব খুব ব্যাপক নয়। বর্তমানে চৈতন্যপন্থীদের প্রচার বাড়িতেছে। আমাদের মনে হয় পূর্ববঙ্গ হইতে চৈতন্যপন্থীদের ব্যাপক আগমনে প্রচার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে কোন বিরোধ নাই। আজ সব এক হইয়া গিয়াছে। সব ধর্মের লোকই মদনমোহন বাড়ীতে গিয়া নত মস্তকে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব অঙ্গনে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। ইহা কোচবিহারের সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। এখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মদনমোহন বাড়ীতে চৈতন্যপন্থীদেরও ধর্ম আলোচনার আসর বসে।

আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কোচবিহারের আকাশতলে চৈতন্য-পন্থী ও শঙ্করপন্থী দুই সম্প্রদায়ই মিলিত ভাবে কৃষ্ণ প্রেমে, কৃষ্ণ আরাধনায় নিরত। ইহা একটি শুভ লক্ষণ বলা যায়।

রামমোহনের প্রস্তুতি পর্ব ও কোচবিহার

রামমোহন নবযুগের অগ্রদূত। তিনি যুগপুরুষ। দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আশা ও আলোর দীপ্ত বর্তিকা লইয়া তমসাচ্ছন্ন জাতির সম্মুখে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতের প্রাণ-গঙ্গার নূতন ভগীরথের অনন্ত কর্মধারার রোমন্থন না করিয়া কোচবিহারের সঙ্গে রামমোহনের কিভাবে পরিচয় হয় সেই দিক সম্পর্কে আলোকপাত করিতে চাই। তাহা ছাড়াও তাঁহার রংপুরে অবস্থান কালই পরবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও কর্মবীরের প্রস্তুতি পর্বের শেষ অধ্যায়। তাঁহার সংগ্রামী কর্মজীবন-বৃত্তের পূর্ণতা আনার পথে এই স্থান উত্তরকালের কর্মজীবনে কতটুকু ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার পরবর্তী জীবন অধ্যায় আলোচনা করিলে সহজেই বোঝা যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেভিনিউ বিভাগে চাকুরী লইয়া রামমোহন ভাগলপুর, রামগড় ইত্যাদি স্থানে কাজ করার পর উত্তর বাংলার রংপুরে আসেন। ১৮০৯ খৃঃ হইতে ১৮১৪ খৃঃ পর্যন্ত রামমোহন রংপুরে ডিগবী সাহেবের কর্মচারী রূপে ছিলেন। এই কার্যকালের মধ্যে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় দেড় বৎসর মিঃ ডিগবীর অস্থায়ী দেওয়ান হিসাবে রামমোহন কাজ করেন।

কালেক্টার জন ডিগবী সাহেবের অধীনে রামমোহন রায় সরকারী চাকুরী আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে দেওয়ানের কাজ অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তখন অনেক বড় বড় জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়াই থাকিত। রামমোহনকে এই সময়ে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত এবং ডিগবী সাহেব রামমোহনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সততার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করিতেন। এইখানেই রামমোহন ইংরাজী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। কাশীতে অবস্থান কালে তিনি প্রথম ইংরাজী শেখেন। তাহা ছিল সামান্য মাত্র। তখন তাঁহার বয়স ছিল বাইশ বৎসর। এইখানে এই প্রাপ্ত বয়সে তিনি অধিকতর পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত ডিগবী সাহেবের নিকট ইংরাজী শেখেন এবং ডিগবী সাহেবকে তাহার প্রতিদানে সংস্কৃত শিখাইতেন। এইভাবে দুইজনের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব বিনিময় হইতে লাগিল। দুইজনের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার

পর তিনি এত সুন্দর ও শুদ্ধ ইংরাজী লিখিতেন যে ডিগবী সাহেব নিজেও তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। য়ুরোপ হইতে ডিগবী সাহেবের নিকট যে সকল ইংরাজী সংবাদপত্র আসিত, রামমোহন তাহা সযত্নে পড়িতেন। এই সময় হইতেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় লাভ হয়। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ঘটনা, বিশেষভাবে নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থান ও বীরত্ব তাঁহাকে অত্যন্ত আনন্দ দিত। এই চাকুরী কালেও তিনি তাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার চাকুরী জীবনের তের বৎসরের মধ্যে দশ বৎসরই রংপুরে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি যেন নিজেকে পরবর্তী সংগ্রামের জন্য সমস্ত দিক হইতে প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন।

রামমোহন যখন রংপুরে ছিলেন, সেই সময়ে সারাদিনের কাজকর্মের পর সন্ধ্যাকালে আপনার বাড়ীতে ধর্মালোচনা করিতেন। অনেক মাড়োয়ারী সেখানে আসিতেন। এই সুযোগে তাহাদের মাধ্যমে রামমোহন 'কল্পসূত্র' প্রভৃতি জৈনদিগের ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। রামমোহন এই সান্ধ্য-সভায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বলিতেন। এই সময়ে গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। ইনি রংপুর জজ কোর্টের দেওয়ান ছিলেন এবং ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে "জ্ঞানচন্দ্রিকা" নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার অনুগত অনেক লোক ছিল। তাহাদের মাধ্যমে রামমোহনের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এই সকল অনিষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও রামমোহন অজেয় ও সুদৃঢ় রহিলেন। রামমোহন এইখানেই জৈন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানচক্রের পূর্ণতা আনিলেন।

রামমোহনের ধর্ম জীবনের প্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইনি হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত। রামমোহনের ধর্ম-জীবনের গতি অনেকটা ইঁহারই প্রভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সংসারাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল নবকুমার বিদ্যালঙ্কার। চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতেই রামমোহন এই সংস্কৃত অধ্যাপকের সংস্পর্শে সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন এবং তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট হন। হরিহরানন্দ বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিলেন। তারপর রামমোহন যখন রংপুরে সরকারী কার্যে নিযুক্ত, তখন হরিহরানন্দ সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রামমোহন তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন।

· ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন' (১৯৪২)

গ্রন্থে দেখা যায় যে ভুটানরাজ দেবরাজের সহিত তৎকালীন কোচবিহার অধিপতি হরেন্দ্রনারায়ণের সীমান্ত লইয়া কলহ লাগিয়াই ছিল। এই দুই রাজ্যের সীমান্ত বিবাদ মিটাইবার জন্য যে রিপোর্ট ডিগবী সাহেব দিয়াছিলেন তাহাতে ভুটানরাজ সন্তুষ্ট নন। এই সময়ে রামমোহন তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। অনেকের ধারণা ছিল যে কৃষ্ণকান্ত বসু ও রামমোহন রায় বাংলা সরকারের পক্ষ হইতে তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃঃ আশ্বিন মাসে লিখিত একখানি পত্রে ভুটানের দেবরাজা রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইতেছেন যে, তাঁহার উকিল রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসুর মারফৎ তিনি তাঁহার চিঠি ও উপহার পাইয়াছেন (পত্র নং ১৪০, পৃঃ ১৬৮)। এই রামমোহনই যে বিশ্ববিশ্রুত রাজা রামমোহন রায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেবরাজার পত্রে রামমোহন সম্বন্ধে দুইটি কথা জানা যাইতেছে। তিনি তাঁহার বন্ধু ও মুরুব্বি জন ডিগবীর সঙ্গেই রংপুর ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার তিব্বত ভ্রমণ সম্বন্ধে যে গল্প সাধারণে প্রচলিত আছে তাহা একেবারে অমূলক নহে। ভুটান তখন তিব্বতের অধীন ছিল। পত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি ভুটানের রাজধানী পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। ডিগবি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় তিনি উত্তরবঙ্গ পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ভুটান ভ্রমণের এই সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাই। তাঁহাদের পূর্বে মাত্র দুইজন ইংরাজ কর্মচারী ভুটানে গিয়াছিলেন। ভুটান ভ্রমণ তখনকার দিনে নিতান্ত সহজ ছিল না।

কৃষ্ণকান্ত ও রামমোহন গোয়ালপাড়া হইতে বিজনী এবং তথা হইতে সিডলি ও চেরঙ্গের পথে পাচু ও মাচু উপত্যকা অতিক্রম করিয়া পুণাখে পৌছেন। পুণাখ ভুটানের শীতকালীন রাজধানী। দেবরাজার চিঠিতেই প্রকাশ যে রামমোহন ওখানকার কথাবার্তা শেষ করিয়া রংপুরে ফিরিয়াছিলেন। এখন একটা প্রশ্ন, তবে রামমোহন কতবার তিব্বত গিয়াছিলেন ?

মুন্সী জয়নাথ ঘোষ লিখিত "রাজোপাখ্যান" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১৫শ অধ্যায়) গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, "দেওান দেওর প্রার্থনার বিবেচনা করার নিমিত্ত সদরের অভিপ্রায় মত ডিগবী সাহেব তাহার দেওান রামমোহন রায় সহিত বেহার আসিয়া ভেটাগুড়ির পার অন্তর অবস্থিতি হইলেন। ভূপতির সহিত সাক্ষাত হইয়া উপস্থিত দন্দেজ নিবৃত্তি হইবেক।" খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ লিখিত 'কোচবিহারের ইতিহাসে' আমরা দেখিতে পাই যে, "রামমোহন রায়

(পরে রাজা) মিঃ ডিগবীর দেওয়ান হইয়া ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সহিত কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন।" (পৃঃ ৩৫৫)

কোচবিহার সাহিত্য সভার দ্বাদশ বার্ষিক কার্য বিবরণীতে দেখি যে ১৩৩৪ সনে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা এবং তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচন করা হইয়াছিল। তিনি সম্বর্ধনার উত্তরে এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, "রাজা রামমোহন রায় এখানে আসিয়াছিলেন, ইহা আমি জানিতাম না, আমি তাঁহার স্বগ্রামবাসী।"

চল্লিশ বৎসর বয়সে কর্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া রামমোহন তাঁহার জীবনের মহাব্রত সাধনে আপনাকে সর্বতোভাবে অর্পণ করেন। পুরুষ-সিংহ রামমোহন দেশব্যাপী কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে চারিখানা শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। প্রথম—কথোপকথন, দ্বিতীয়—তর্ক-বিতর্ক, তৃতীয়—বিদ্যালয় স্থাপন, চতুর্থ—সভা সংস্থাপন।

———

কোচবিহার প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কোচবিহারের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কাছ হইতে কোচবিহার নামের সঙ্গে ঠাকুর পরিচিত হন বলিয়া মনে হয়। কেশবচন্দ্র ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও ঠাকুরের কাছে বহুবার বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আসিয়াছেন। ভাব রাজ্যের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের নানা সমস্যার কথা তিনি ঠাকুরের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছেন। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের বড় মেয়ে সুনীতি দেবীর ১৮৭৮ খৃঃ ৬ই মার্চ বিবাহ হয়। এই বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার ব্রাহ্ম মহলে বিরোধিতার ঝড় বহিয়া যায়। কেশব সেনও নানা আঘাতে জর্জরিত হন। শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কিত বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়। সমাজের অনুরাগীরা এই বিবাহকে সমর্থন না জানাইলেও ঠাকুর এই বিরোধের সংবাদে মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং পাকা সংসারীর মত ও প্রগতিবাদী ব্যক্তির মত মন্তব্য করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন—

"আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরকে নিজ সর্বস্ব বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে শ্রীযুক্ত কেশব কুচবিহার প্রদেশের রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া ঐরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ বিবাহ লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে বিশেষান্দোলন উপস্থিত হইয়া উহাকে বিভক্ত করিয়া ফেলে এবং শ্রীযুক্ত কেশবের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা আপনাদিগকে পৃথক করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নাম দিয়া অন্য এক নূতন সমাজের সৃষ্টি করিয়া বসেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া সামান্য বিষয় লইয়া উভয় পক্ষীয়গণের ঐরূপ বিরোধ শ্রবণে মর্মাহত হইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধীয় ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ম শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'জন্ম, মৃত্যু. বিবাহ ঈশ্বরেচ্ছাধীন ব্যাপার। উহাদিগকে কঠিন নিয়মে নিবদ্ধ করা চলে না; কেশব কেন ঐরূপ করিতে গিয়াছিল!'

কুচবিহার-বিবাহের কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে যদি কেহ শ্রীযুক্ত কেশবের নিন্দাবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তরে বলিতেন, 'কেশব উহাতে নিন্দনীয় এমন কি করিয়াছে? কেশব সংসারী, নিজ পুত্র-কন্যাগণের যাহাতে

কল্যাণ হয়, তাহা করিবে না ? সংসারী ব্যক্তি ধর্মপথে থাকিয়া ঐরূপ করিলে নিন্দার কথা কি আছে ? কেশব উহাতে ধর্মহানিকর কিছুই করে নাই, পরন্তু পিতার কর্তব্য পালন করিয়াছে।' ঠাকুর ঐ রূপে সংসার ধর্মের দিক দিয়া দেখিয়া কেশব-কৃত ঐ ঘটনা নির্দোষ বলিয়া সর্বদা প্রতিপন্ন করিতেন। সে যাহা হউক, কুচবিহার-বিবাহরূপ ঘটনায় বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত কেশব যে আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪০৩, স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন সং ১৩৮৩)

এই উদ্ধৃতি হইতে ঠাকুরের বিচারশীল ভাবনার স্ফুরণ আমরা দেখিতে পাই এবং কোচবিহারের সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে পরিচিত হইবার উপকরণ আমরা খুঁজিয়া পাই।

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বইটি পড়িতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্র সেন বিভিন্ন সময়ে নৌকাবিহারে যাইতেন, এই সময়ে প্রসঙ্গক্রমে কোচবিহারের নাম ও সেই বিবাহ প্রসঙ্গ আসিয়া গিয়াছে। যেমন আমরা প্রথম খণ্ডে দেখিতে পাই যে একদিন গঙ্গায় নৌকা ভ্রমণের পর ঘাটে আসিয়া ভাবস্থ ঠাকুরকে ঘরে লইয়া গিয়া একখানি চেয়ারে বসান হইল। তারপর—

"কেশব দেখিলেন ঘরের মধ্যে অনেক লোক, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়াছেন ও কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কাযের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই বিজয়কে দেখিয়া কেশব একটু অপ্রস্তুত। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৮, পঞ্চদশ সং, ১৩৮৫)

এই উদ্ধৃতি হইতে মনে করা যাইতে পারে বিবাহের বেশ কয় বৎসর পরেও কেশবচন্দ্র বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতদের কটু বাক্যের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। সেই জন্য ঠাকুরের সামনে তাঁহার বিরুদ্ধ-বক্তা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখিয়া তিনি বিরক্ত, এরূপ ঘটনাও ঠাকুরের সামনেই ঘটিয়াছে।

রামকৃষ্ণ কথামৃতের পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে (পৃঃ ২২৫) দেখি "১লা শ্রাবণ ১৫ই জুলাই ১৮৮১ শুক্রবার কেশব তাঁহার জামাতা কুচবিহারের মহারাজার জাহাজে (Steam yacht) করিয়া অনেক ব্রাহ্ম ভক্ত লইয়া কলিকাতা হইতে সোমড়া পর্যন্ত বেড়াইয়াছিলেন। পথে দক্ষিণেশ্বরে জাহাজ থামাইয়া পরমহংসদেবকে তুলিয়া লইলেন, সঙ্গে হৃদয়।

জাহাজে কেশব ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণ, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, নগেন্দ্র প্রভৃতি।

নিরাকার ব্রহ্মের কথা কহিতে কহিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল গান গহিতেছেন ও খোল, করতাল বাজিতেছে। সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর গাহিতেছেন—

শ্যামা মা কি কল করেছে।
চৌদ্দ পুয়া-কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে।

জাহাজ ফিরিবার সময় ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে নামাইয়া দেওয়া হইল। কেশব আহিরীটোলা ঘাটে নামিলেন—মস্‌জিদবাড়ি স্ট্রীট দিয়া পদব্রজে শ্রীযুক্ত কালীচরণ ব্যানার্জীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইবেন।"

কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের জাহাজে কোচবিহারের কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ঠাকুরের নৌকা ভ্রমণ এক আশ্চর্যজনক ঘটনা।

কথামৃতের দ্বিতায় ভাগের ১৬৫ পৃষ্ঠায় দেখি চঞ্চল মনের কার্য-কলাপ বিষয়ে উদাহরণ দিতে গিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—"মনটি পড়েছে ছড়িয়ে—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি ষোল আনার কাপড় চাও, তা হলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হলে আর খবর যাবে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোচবিহারে না আসিলেও, এই নামটির সঙ্গে তাঁহার সুসম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। কথাপ্রসঙ্গে সুযোগ পাইলেই তিনি বিভিন্ন ভাবে কোচবিহার নামটি ব্যবহার করিয়াছেন। কোচবিহারের সঙ্গে তাঁহার এই সুমধুর সম্পর্ক গড়িয়া তোলার মাধ্যম ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে কোচবিহার নামটি উচ্চারিত হইয়াছে, এই গর্বেই আজ আমাদের ধন্য মনে করিতে হইবে।

কোচবিহারের ঠাকুর পঞ্চানন

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমা হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে খলিসামারী গ্রামে ১২৭২ সালের ১লা ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশী তিথিতে (ইংরাজী ১৮৬৫) শিব আশীর্বাদ ধন্য পঞ্চাননের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম খোসাল চন্দ্র সরকার এবং মাতার নাম চম্পলা দেবী। তাঁহাদের পারিবারিক জীবন ছিল এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের মতন।

গ্রাম্য পরিবেশেই পঞ্চাননের শিক্ষার শুভ সূচনা হয়। তাহার পর পাঠশালার অঙ্গন ছাড়িয়া মাথাভাঙ্গায় মধ্য ইংরাজী স্কুলে তাঁহার লেখাপড়া আরম্ভ হয়। সেইখানে তিনি কৃতী ছাত্র হিসাবে স্বীকৃতি পান। ১৮৮৫-৮৬ সনের গেজেটে দেখা যায় রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত এম. ই. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। ইহার পর জেন্‌কিন্স স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় এবং পরবর্তীকালে ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে ১৮৯৪ সনে বি. এ., ১৮৯৬ সনে সংস্কৃতে এম. এ. ও ১৮৯৮ সনে বি. এল. পাশ করিয়া এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মহাপুরুষদের জীবনে বহু ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমরা কর্মবীর পঞ্চাননের জীবনেও দেখিতে পাই যে উচ্চশিক্ষা লাভের পরেও কোচবিহারে সম্মানজনক একটি চাকুরী তিনি জোগাড় করিতে পারিলেন না। যিনি সমাজ সেবার প্রতিমূর্তি হইবেন, তাঁহাকে কি আর ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়? স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ তৎকালীন কোচবিহার অধিপতিদের সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কর্মক্ষেত্র রূপে কোচবিহারকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিলেও পরিস্থিতির চাপে তাঁহাকে ১৯০১ সনে কোচবিহার ছাড়িয়া রংপুর জজকোর্টে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করিতে হয়। এইখানেই তাঁহার আগামী দিনের নবজাগরণের কর্মযজ্ঞের শুভ সূচনা হয়।

১৮৯১ সনে জনগণনায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়কে 'কোচ' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে আশাপ্রদ ফল হইল না। তাই এই আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য যুবক কর্মবীর, উদ্যমী, সাহসী নির্ভীক এবং সাংগঠনিক কাজে ব্রতী উকিল পঞ্চাননকে তাহারা খুঁজিয়া লইল। ১৯১০ সনের ১লা মে রংপুর নাট্য মন্দিরে সমাগত ক্ষত্রিয় সমাজের নেতা এবং কর্মীবৃন্দ কয়েকটি

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—যথা (১) ক্ষত্রিয় সমিতি প্রতিষ্ঠা; (২) রাজবংশী ও কোচ পৃথক জাতি স্বীকৃতির মাধ্যমে জনগণনার রিপোর্ট পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন; (৩) ক্ষত্রিয় ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ, সংবাদপত্র প্রচলন, সমিতির প্রচারক নিয়োগ; (৪) শিক্ষা বিস্তার; (৫) সমিতির ধনভাণ্ডার গঠন বিষয়ে সকলের ব্রত গ্রহণ।

এই আলোচনা সভায় জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর এবং গোয়ালপাড়া জেলা হইতে প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই ক্ষত্রিয় সমিতির প্রথম অধিবেশনে উকিল পঞ্চাননকে সম্পাদক পদে নির্বাচন করা হয়। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই গুরুভার বহন করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষত্রিয় সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি চিন্তা ভাবনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কাশী, নবদ্বীপ, কনৌজ, মিথিলা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া শাস্ত্রমত সকল রাজবংশী ক্ষত্রিয়কে উপবীত গ্রহণের আহ্বান জানান। তাহার পর ১৩১৯ সনের ২৭শে মাঘ রবিবার ডোমার স্টেশন হইতে দুই ক্রোশ (চার মাইল) পশ্চিমে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে পেরলবাড়ী গ্রামের পূর্ব প্রান্তে এক মহামিলন ক্ষেত্রে বৈদিক ও বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং পুরোহিত দ্বারা শাস্ত্রীয় বিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপবীত গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং দ্বাদশাহে অশৌচান্ত চালু হয়। এই দিনটি ক্ষত্রিয় সমাজের কাছে স্মরণীয় হইয়া আছে।

পরবর্তী কালে ১৯১৩ সনে জনগণনায় পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া রাজবংশী ও কোচ জাতিকে পৃথক বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কোচবিহার রাজ-রোষে পঞ্চাননকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে কোচবিহার ত্যাগ করিতে হইলেও কেহই তাঁহার আন্দোলনের গতি রোধ করিতে পারে নাই। ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করিতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি ছাত্রাবাস তৈয়ারী করেন। ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ক্ষত্রিয়দের সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহ দান করেন। তখন বহু লোক তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। সেই সময়ে তিনি ক্ষত্রিয়দের নামে একটি পৃথক ব্যাটেলিয়ন গঠনের জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ শেষে ইংরাজ সরকার ১৯১৯ সনে কর্মবীর পঞ্চাননকে রায় সাহেব এবং এম. বি. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯১৯ সনে ভারতীয় আইন সভা চলু হইলে ১৯২১ সনে তিনি এম.এল.সি. হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই আইন সভার সদস্য থাকিয়া সমাজের

নানাবিধ সংস্কারমূলক কাজে তৎপরতা দেখান। ১৯২৭ সনে বঙ্গীয় খাজনা আইন প্রজা ও জোতদারগণের অনুকূলে আনার পক্ষে তিনি জোরালো বক্তব্য রাখেন। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি দরিদ্র নিপীড়িত জাতির কল্যাণকর পরিকল্পনায় গঠনধর্মী মত দিয়া আইন পাশ করাইয়া লইয়াছেন।

১৯৩২ সনে ভারতে তপশিলী কাহারা এই লইয়া মতবিরোধ দেখা যায়। দূরদর্শী পঞ্চানন বহুজনের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করিয়া রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের তপশিলী শ্রেণীভুক্ত করাইয়া লন। যাহার ফলশ্রুতি হিসাবে আজ তাহারা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাইয়া আসিতেছে।

অনগ্রসর জাতির মধ্যে শিক্ষার আলো বিকীরণ করার জন্য তিনি সংগ্রাম করিয়াছেন, প্রাচীন সংস্কার দূর করিয়া বিদ্যার গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য উৎসাহ দানার্থে বহু স্থানে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ছেলেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তিনি মনোযোগ দেন। তাঁহার নিরলস পরিশ্রমের ফল বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। নারীকে তিনি মাতৃতুল্য জ্ঞান করিতেন। যুবকদের মধ্যে সাহস এবং শরীর শিক্ষা বিষয়েও তিনি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চাননকে কেবলমাত্র সমাজ সংস্কারক হিসাবে চিহ্নিত করিলেই সঠিক মূল্যায়ণ হইবে না। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান স্মরণীয় হইয়া আছে। 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ' গঠিত হওয়ার পর তিনি তাহার কর্মসমিতির সদস্য হন। পরবর্তীকালে পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার প্রথম সম্পাদক হন। এই পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন সময়ে রাজবংশী ভাষা, গান, উপকথা, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। নারী জাতির উপর নির্যাতন বন্ধ করিতে সমাজের মাধ্যমে তিনি ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাহাদের উদ্ধার এবং আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে প্রচলিত 'ডাং ধরী মাও' নামক কবিতাটি একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছে।

মৃতপ্রায় একটি জাতিকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া যুগপুরুষ পঞ্চানন বর্মা ১৯৩৫ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে কলিকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিরাট শোভাযাত্রার মাধ্যমে কলিকাতা নিমতলা মহাশ্মশানে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আজ তিনি সশরীরে আমাদের মধ্যে না থাকিলেও ঠাকুর পঞ্চানন হিসাবে তিনি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার নবজাগরণের মন্ত্র, কর্ম-ভাবনা, সেবাব্রত আজ সর্বজন স্বীকৃত। তিনি বর্তমানে শুধু একটি নাম নন,

একটি ইতিহাস। তাঁহার পুণ্য স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে সম্প্রতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কল্যাণ-ধর্মী কর্মসূচী গ্রহণ করা হইতেছে। তাঁহাকে জাতীয় নেতার স্বীকৃতি দান করিয়া গত ১৯৮১ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁহার একটি তৈলচিত্র বসান হয়। ইহা ছাড়াও কোচবিহারে মানসাই নদীর সেতুটিকে 'পঞ্চানন সেতু' নামাঙ্কিত করা হয় এবং নারী জাগরণের মন্ত্রদাতা হিসাবে 'ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস' স্থাপন করা হয়। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আমাদের গর্ব।

রবীন্দ্রনাথ ও কোচবিহারের রাজপরিবার

বিশ্বজোড়া খ্যাতির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের সহিত কোচবিহারের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্পর্ক একজন রাজার সঙ্গে নয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত মহারাজা নৃপেন্দ্র-নারায়ণের বিবাহ হয় ১৮৭৮ সনের ৬ই মার্চ। ঠাকুর পরিবারের সহিত কেশব সেনের মধুর সম্পর্ক ছিল। কেশবচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথের যৌবনের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে কেশবচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। দুই পরিবারের এই পূর্ব সূত্র ধরিয়া কোচবিহারের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। কিন্তু তিনি কখনো কোচবিহারে আসিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যাদি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে কলিকাতা হইতে দার্জিলিং তিনি একাধিকবার গিয়াছেন। সেই সময়ে দার্জিলিং মেল পার্বতীপুর স্টেশন হইয়া কোচবিহারের হলদীবাড়ী স্টেশনের উপর দিয়া যাতায়াত করিত। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় যে, একবার হলদীবাড়ী স্টেশনে রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে প্রচুর জনসমাগম হইয়াছে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

মহারাণী সুনীতি দেবীর সহিত রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল, একথা সুবিদিত। তাঁহার স্বামী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অবশ্যই ছিল। তবে তাহা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। উভয়ের সাক্ষাতের দুটি মাত্র প্রসঙ্গ-সূত্র পাই। ১৯০১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্যর সঙ্গে দার্জিলিং গিয়াছিলেন, তখন উক্ত মহারাজা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ বিলাত-প্রবাসী জগদীশচন্দ্র বসুকে ত্রিপুরার যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্বাচনের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তখন কোচবিহার-রাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণও দার্জিলিং ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে হয় কোচবিহার-রাজকে অনুরূপ শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাই জগদীশচন্দ্রকে পত্রে সে বিষয়ে লিখিয়াছিলেন—"কুচবিহার বলেন, বেতন পাঁচ শত হইতে আট শত হওয়াই নিয়ম।" 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে ব্যক্তি-পরিচিতিতে বলা হইয়াছে, পত্রোক্ত

'কুচবিহার' হইলেন কুচবিহার-মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ। উক্ত চিঠিপত্রের ১ম পরিশিষ্টে পাই—বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সগৌরবে স্বদেশ প্রত্যাগমন উপলক্ষ্যে 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য একটি 'সারস্বত সম্মিলন'-এর আয়োজন করেন। (১৯ মাঘ, ১৩০৯ বা ২ ফেব্রুয়ারী ১৯০৩)। সেই সম্বর্ধনানুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কোচবিহারের মহারাজ বাহাদুর। অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'জয় হোক তব জয়' গানটি রচনা করিয়াছিলেন। তবে এই পরিচিতি সত্ত্বেও শান্তিনিকেতন গঠনের ব্যাপারে দানশীল মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কোন আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কেশবচন্দ্র সেনের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতি দেবী প্রায় সমবয়সী ছিলেন। পারিবারিক সু-সম্পর্ক থাকায় উভয়ের মধ্যেই একটা যোগসূত্র গড়িয়া ওঠে। সুনীতি দেবী ও তাঁহার এক বোন ময়ূরভঞ্জের রাণী সুচারু দেবী রবীন্দ্রনাথকে বহুবার "ভাই ফোঁটা" দিয়াছেন। সুনীতি দেবীর মেয়ে সুকৃতি দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় বোন কবি স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের বিবাহ পারিবারিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। কেশবচন্দ্র ব্যক্তিগত ভাবে আজীবন নিরামিষ ভোজী হইলেও ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই আমিষ ভোজী ছিলেন। ঠাকুর বাড়ীতেও সব কিছু চলিত। কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ যে কিছুটা নিরাসক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার এই উদ্ধৃতি হইতেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে—"আমি এই ভক্তের সময়ে জন্মিয়াও তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারি নাই। তিনি যখন স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া হিন্দু আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন এবং আমার পিতৃ গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আমি সদ্যপ্রসূত শিশু। তারপর যখন আমি বালক, কিছু কিছু জ্ঞান হইয়াছে, তখন ব্রাহ্ম সমাজে বিরোধের সময়। আমার মনেও সেই বিরোধের ভাব। আমার মনে হইত, তিনি যে ধর্ম, যে সত্য প্রচার করিতেছেন, তাহা আমাদের স্বদেশীয় নহে, বিদেশী, তাঁহাকে লইয়া যখন খুব গোলমাল হইতেছে, তখন তাহার প্রতি আমার একটা বিরোধ ভাব আসিয়াছিল, এটা আমার বেশ মনে আছে। স্বীকার করিতে হইবে, আমার অন্তরের ভিতরে বিরোধ ভাবের সঞ্চার আমার বালক কাল হইতেই হইয়াছিল। কি একটা কুহেলিকা আসিয়াছিল যে তাঁহার সঙ্গে সে যোগ স্থাপন করিতে পারি নাই। তখন বোল ছিল স্বদেশী। এই তখন দম্ভ, দর্প ছিল। আমার মনে হইত বুঝি

আমাদের স্বদেশের যে মাহাত্ম্য আছে, বুঝি সেই মহাপুরুষ সে গৌরব খর্ব করিয়াছেন।" (ধর্মতত্ত্ব, ১২ই মাঘ ১৩৮৩)

সুনীতি দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিষয়ে আর একটি উদ্ধৃতি তুলিয়া ধরিতেছি—"সেবার রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং গিয়েছেন। কোচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী ছিলেন সেখানে। কেবলই রবীন্দ্রনাথের মুখে গল্প শুনতে চাইতেন তিনি। একদিন সুনীতি দেবী রবীন্দ্রনাথকে বললেন, 'একটা ভূতের গল্প বলুন। আপনি নিশ্চয়ই ভূত দেখেছেন।' 'আমি ভূত দেখিনি।' রবীন্দ্রনাথ যতই দেখার কথা অস্বীকার করেন, সুনীতি দেবী ততই মাথা নাড়েন, বলেন, 'না, কখনই না, নিশ্চয়ই আপনি ভূত দেখেছেন। একটা ভূতের গল্প বলুন।'

অগত্যা রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে একটা গল্প শোনালেন। সুনীতি দেবীর তাগিদে মুখে মুখে রচিত হল রবীন্দ্রনাথের 'মণিহার'।"

সুনীতি দেবীর সঙ্গে দার্জিলিং-এর রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে শুনিয়েছিলেন 'দুরাশা' গল্পটি এবং 'মাষ্টার মশায়' গল্পটির ভূতুড়ে ভূমিকা অংশটুকুরও জন্মের মূলে ওই একই ইতিহাস। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে সেই কথাই বলেছেন—"অনেক কাল পূর্বে একবার যখন দার্জিলিং গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারাণী। তিনি আমাকে গল্প বলতে কেবলই জেদ করতেন। তাঁর সঙ্গে দার্জিলিং-এর রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে মুখে মুখে বলেছিলুম 'মাষ্টার মশায়' গল্পের ভূমিকা অংশটা এবং 'মণিহার' গল্পটিও এমনি করে তাঁরই তাগিদে মুখে মুখে রচিত।" (চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, চিঠি নং ৪৫, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠির অংশ)

এই অংশটুকু পাঠ করিলে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প রচনার বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে সুনীতি দেবীরও কিছুটা ভূমিকা ছিল।

১৯৩২ সনের ১০ই নভেম্বর সুনীতি দেবীর মৃত্যুর এক বছর পরে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৩ সনে কলিকাতায় কমলকুটীরে একটি সুনীতি স্মৃতি সভার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই সভার সভাপতি। সভাপতির ভাষণে তিনি যে স্মৃতিচারণা করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—

"ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে হৃদয়ের দৌত্য অবরুদ্ধ হয় না, এই আশা মনে রেখে আজ এসেছি স্বর্গগতা সুনীতি মহারাণীর উদ্দেশে এই কথা জানাতে যে, আমাদের সম্বন্ধ ঐহিক সীমা অতিক্রম করে অক্ষুন্ন আছে। মহারাণীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এক অংশ পৈত্রিক, এক অংশ ব্যক্তিগত। কেশবচন্দ্র যখন একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার অনতিকাল

পূর্বেই আমার জন্ম। সেই সময়ে মহারাণীর মাতৃদেবী আমাকে তাঁর যে ক্রোড়ে লালন করেছিলেন, সেই ক্রোড়ই তার অনেক বৎসর পরে সুনীতি দেবী মাতৃস্নেহ সম্ভোগ করেছেন।

অবশেষে তিনি যখন স্বামীগৃহে অধীশ্বরী হলেন, তার পরে কতবার কতদিন তাঁদের আলিপুরের বাড়ীতে, কমলকুটীরে, দার্জিলিং-এ তাঁর আতিথ্য লাভ করেছি। সেইসকল আনন্দ হিল্লোলিত কলহাস্য মুখর দিনগুলি তাঁর প্রসন্ন মুখের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। দুঃখের দিনেও শান্তির জন্যে, সান্ত্বনার জন্যে তিনি আমাকে স্মরণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। আমাদের পরস্পরের দেখা হবার অবকাশ ঘটত না, কিন্তু আত্মীয়তার যোগসূত্র আত্মায় আত্মায় নিরবচ্ছিন্ন ছিল।" (ধর্মতত্ত্ব, ১লা মাঘ, ১৩৩৯)

বিস্ময়ের বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ সুনীতি দেবীর আলিপুরের বাড়ীতে, কমলকুটীরে, দার্জিলিং-এ বহুবার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের ঘনিষ্ঠতার কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

পরবর্তীকালে সুনীতি দেবীর নাতনী মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের কন্যা রাজকুমারী ইলা দেবী ও গায়ত্রী দেবী প্রভৃতি শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেন এবং রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহাদের অভিভাবিকা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট ইন্দিরা রায়। তিনি ১৯২৬ সনে কলিকাতার 'ডায়সেশন' কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। পরে মহারাজার এ. ডি. সি. পূর্ণানন্দ রায় (ফণীবাবু)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইন্দিরা রায়ের বাবা ছিলেন তৎকালীন সিভিল-সার্জন ডাঃ কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ, মাতা ত্রিপুরার নবদ্বীপ মাণিক্য বাহাদুরের কন্যা। মাতুল দিকপাল সুরকার শচীন দেববর্মণ। শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে ইন্দিরা রায় সংগীত ও চিত্রকলায় পারদর্শিতা দেখাইয়া সকলকে মোহিত করেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সুসম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। ১৩৪৩ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠির মাধ্যমে তাঁহাদের সম্পর্কের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই চিঠিতে সুচেতার সংগে জে বি. কৃপালনীর বিবাহে নিমন্ত্রণের আহ্বান সহ অনেক পারিবারিক কথা আছে। এখানে চিঠিখানি তুলিয়া ধরি—(ইন্দিরা রায়ের নিকট রবীন্দ্রনাথের চিঠি)

ওঁ

শান্তিনিকেতন
শ্যামলী

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। নানা প্রদেশ ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর কিছুদিন পরে হাওয়া বদলের জন্যে কোথাও যাবার ইচ্ছে আছে।

ইতিমধ্যে ব্যস্ত আছি বুড়ির বিয়ের উদ্যোগে। বোধহয় খবর পেয়ে থাকবে কৃপালানের সঙ্গে বুড়ির বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। আগামী ১২ বৈশাখে বিয়ের দিন। শান্তিনিকেতনেই কর্ম সম্পন্ন হবে। এই সময়ে তুমি থাকতে পারলে খুব খুসি হতুম।

গরম পড়েছে বটে কিন্তু অত্যন্ত বেশি নয়। তবু শরীরটাকে আর একবার একটুখানি তাজা করে নেওয়ার দরকার আছে। হয়তো শিলং যাওয়া হবে। যদি বাড়ি না পাই তা হলে পুরীতে যাবার চেষ্টা করব। তাও যদি ঘটে না ওঠে তা হলে যেখানে আছি সেখানেই থেকে যাব। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে থাকার কথা চিন্তা করতে গেলেই দেহটা শুকিয়ে আসে।

আশা করি আবার কখনো একবার এখানে তোমাদের আসবার অবকাশ জুটবে। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৪৩

আশীর্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ বিশ্বকবির বৈচিত্র্যময় সাহিত্য-সাধনা লইয়া যেখানে ভাব গম্ভীর আলোচনা হয় সেইখানে আমরা কোচবিহারের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ পরিচয়ের সূত্রটি তুলিয়া ধরিয়া শ্রদ্ধা জানাই এবং গর্ব অনুভব করি।

কোচবিহারে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

মহামনীষী জ্ঞানতাপস আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের স্ফূর্ত প্রদীপ্ত প্রতিভা। সেই সময়ে আমরা রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের মত বহু স্মরণীয় ব্যক্তির সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেও পাইয়াছি। অজানাকে জানার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তিনি জীবনের প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি দর্শন, অংক, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অপরিমেয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আচার্য শীলের জ্ঞান, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, বিচক্ষণতা, প্রশাসনিক নৈপুণ্য প্রভৃতি তাঁহাকে দেবোপম মহিমা দান করিয়াছে। তাঁহার গৌরবময় কর্মজীবনে, যখন যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার স্মৃতিমাখা বহু কাহিনী বিজড়িত। সর্বত্রই তাঁহার অগণিত ভাগ্যবান ছাত্র, গুণমুগ্ধ মননশীল ব্যক্তিদের কাছে তিনি জ্ঞানযজ্ঞের মহান হোতা ছিলেন। প্রায় ষোল বৎসর তাঁহাকে নিকটে পাইয়া কোচবিহারবাসী ধন্য হইয়াছিল।

১৮৬৪ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতার রামমোহন সাহা লেনে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রথম দিনের আলো দেখেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি ছিল হুগলী জেলার জয়নগরে। পিতা মহেন্দ্রলাল শীল ছিলেন সুপণ্ডিত ও কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। শৈশবের দিনগুলি তাঁহার সুখের ছিল না। পিতার অকাল মৃত্যুতে (১৮৪০-১৮৭২) সংসার অচল হইয়া পড়িল। মামার বাড়ীতে থাকা অবস্থায় তিনি আবিষ্কার করিলেন গণিতের মধ্যে অমৃতের স্বাদ লুকাইয়া আছে। ভুলিয়া গেলেন সকল দুঃখ, শোক, তাপ। এই বিষয়ে তাঁহার ছেলেবেলার একটি কাহিনী এইখানে তুলিয়া ধরিতেছি। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র (বর্তমানে সপ্তমমান) ব্রজেন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের ছুটিতে দিনরাত বীজগণিত লইয়া বসিয়া আছেন। শেষে স্কুল খোলার পর দেখা গেল তিনি সমস্ত বীজগণিত কষিয়া শেষ করিয়াছেন। ব্যাপারটি বিস্ময়জনক হইলেও কেবলমাত্র তাঁহার পক্ষেই সম্ভব ছিল। যখন প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিয়া তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে বীজগণিতের সমস্যাগুলির সমাধান কঠিন নয়। প্রধান শিক্ষক তাঁহার এই তীক্ষ্ণ মেধা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। জেনারেল আ্যাসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনের (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) স্কুল বিভাগের

ছাত্ররূপে তিনি ১৮৭৮ সনে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে ঐ কলেজে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁহার নীচের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিলেও দুইজনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয়ে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলিয়াছেন, "এই শিক্ষায়তনে তখন ভাবী প্রথিতযশা দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও অধ্যয়ন করিতেন। ইনি উপরের শ্রেণীর ছাত্র হইলেও ছাত্রদের কোন এক দার্শনিক সভায় উভয়ের মিলন ঘটিত এবং অপরাপর সুযোগে উভয়ে দার্শনিক আলোচনা করিতেন।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬২।) ১৮৮৩ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় ব্রজেন্দ্রনাথ একাদশ স্থান অধিকার করিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবার গৌরব অর্জন করেন। এম. এ.-তে ব্রজেন্দ্রনাথ কোন্ বিষয় লইয়া উচ্চতর অধ্যয়ন করিবেন তাহা লইয়া কলেজের অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেব এবং অধ্যাপক গৌরীশংকর দে-র মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। হেস্টি চাহিয়াছিলেন দর্শন শাস্ত্র লইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ পড়ুক আর অধ্যাপক দে চাহিয়াছিলেন অংক শাস্ত্র লইয়া তাঁহাদের প্রিয় ছাত্র পড়াশোনা করুক। শেষ পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সনে দর্শন শাস্ত্র লইয়া এম.এ. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মজার বিষয় হইল, সেই বৎসর তিনিই ছিলেন একমাত্র সফল পরীক্ষার্থী। ১৯১০ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল—"Mechanical, Physical and Chemical theories of ancient Hindus." (প্রাচীন হিন্দুদের যান্ত্রিক, ভৌতিক, রসায়ন ও রসায়নতত্ত্বসমূহ)। ১৯২১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি. এস. সি. উপাধিতে ভূষিত করে।

এম. এ. পাশ করার পর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কলিকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তারপর আসামের নওগাঁ জেলার জয়গোপাল রক্ষিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। কর্মজীবনে বিস্ময় সৃষ্টি করিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। ১৯০০ সনে ইন্দুমতী মাত্র আঠাশ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁহার চার পুত্র ও এক কন্যা। একমাত্র কন্যা সরযূবালার বিবাহ হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যারিষ্টার বসন্তরঞ্জনের সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিবাহের কিছুকাল পরেই তাঁহাকে অকাল বৈধব্য বরণ করিয়া লইতে হয়। স্বামীবিয়োগে শোকাকুলা সরযূ দেবী 'বসন্ত প্রয়াণ' 'দেবোত্তর বিশ্বনাট্য' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

সিটি কলেজে অধ্যাপনা কালেই ব্রজেন্দ্রনাথ নাগপুরের মরিস মেমোরিয়াল

কলেজে (১৮৮৫) ইংরাজী ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হন। তাহার পর ১৮৮৭ সনে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেন। ছাত্র সমাজের কাছে এই জ্ঞান-নায়কের নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে থাকে। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া ছাত্রগণ মোহিত হইয়া যাইত। ১৮৯৬ সনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান ভাণ্ডারের ধারক ও বাহক আচার্য শীলকে কোচবিহারের বিদ্যাৎসাহী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে সরাসরি নিয়োগ করেন। কোচবিহার স্টেট কাউন্সিলের সভ্যগণের সহিত আলোচনার পূর্বেই ব্রজেন্দ্রনাথের গুণ ও জ্ঞান মুগ্ধ মহারাজ তাঁহাকে এই পদে কলিকাতা হইতেই নিয়োগপত্র দেন। এই সময়ে তাঁহার বেতন ধার্য হইয়াছিল ৫০০-৫০-৭০০ টাকা। তিনিই এই কলেজের প্রথম ভারতীয় স্থায়ী অধ্যক্ষ। সেই সময়কার কৃতী অধ্যাপকদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ সিংহ, জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, মনোরথধন দে, শরৎচন্দ্র গুপ্ত, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, শ্যামাচরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আর তিনি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যমণি। এই জ্ঞানবৃক্ষের ছায়ায় যে সমস্ত ছাত্র আশ্রয় লাভের সুযোগ পাইয়াছে, তাঁহারা নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহার দীর্ঘ ষোল বছর কোচবিহারে অবস্থান আমাদের কাছেও একটি স্মরণীয় অধ্যায় হইয়া আছে। এই জ্ঞান ভিক্ষুর সান্নিধ্য পাওয়া কোন ছাত্রের পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। তাহাদের কাছ হইতে শোনা কিছু ঘটনা এইখানে তুলিয়া ধরিতেছি। তিনি বিভিন্ন সময়ে ক্লাসে এমন গভীর ভাবে জ্ঞান দিতেন যে সময়ের কোন বাঁধন থাকিত না। আর ছাত্রগণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার কবিত্বপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ অবাক বিস্ময়ে শ্রবণ করিতে করিতে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া যাইত। কোন কোন দিন সন্ধ্যা হইয়া যাইত। অনেক সময় অন্য ক্লাসের ছাত্ররাও আসিয়া ভাষণ শুনিতে ভীড় করিত। আবার কখনো দেখা গিয়াছে যে ক্লাসের নির্ধারিত সময় পার হইয়া গেলেও তাঁহার আলোচনা শেষ হইত না। অন্য অধ্যাপকদের ক্লাসের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ছাত্রদের দিকে তাকাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "ঘণ্টা কি পড়িয়া গিয়াছে ?" ছাত্রদের উত্তর শোনার পর তিনি ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন। এমনি ভাবে ছাত্রদের তাঁহার নিকট হইতে বিচিত্র জ্ঞানের স্বাদ পাইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি ছিলেন দরদী শিক্ষক। কখনও ছাত্রদের কড়া ভাষায় শাসন করিতেন না। অন্যায়কারী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেই এমন অভিভূত

হইয়া যাইত যে সে নিজেই অন্যায়ের ক্ষমা চাহিয়া বসিত এবং মানসিক বেদনার মাধ্যমে তাহার পরিবর্তন হইয়া যাইত। শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টাও তিনি কম করেন নাই। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যে, সেই সময়ে এই ভিক্টোরিয়া কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মত একজন বিদগ্ধ অধ্যক্ষের আগমন এবং তাঁহার শিক্ষার সংস্কার চিরদিন কোচবিহারবাসী স্মরণ করিবে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সময়ে ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. এবং আইনশাস্ত্র পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। তিনি এই স্নাতকোত্তর বিভাগে সকল বিষয়েই পড়াইতেন বলিয়া শোনা যায়।

সকল সময়েই গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন এই জ্ঞান-তাপস। অনেক সময়ে পোষাক-পরিচ্ছদ কিরূপ পরিলেন সে বিষয়ে কোনরূপ খেয়াল থাকিত না। একদিনের একটি ঘটনা এইখানে তুলিয়া ধরিতেছি। আচার্য শীল জামা কাপড় পরিয়া কলেজে নিজ কক্ষে গিয়া বসিয়াছেন। সকলেই তাঁহার দিকে তাকাইতেছে, কিন্তু কেহই কিছুই প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। সহকর্মীদের মধ্য হইতে একজন নরম স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"স্যার, আপনি কোন্ চাদর ঘাড়ে করিয়া আসিয়াছেন?" এতক্ষণে তাঁহার হুস হইল যে, ঘাড়ে একটি ভাঁজ করা মশারি রহিয়াছে। নিজেই তখন হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেদিন সকলেই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারিল যে, তিনি কোন্ মার্গের দার্শনিক।

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"আচার্য ব্রজেন শীল তখন কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ, প্রতিদিন হেঁটেই কলেজে আসেন। এমনি একদিন, কলেজে আসার পথে দেখলেন, মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে তিনি খেলা দেখলেন। তারপর কলেজে ঢুকলেন এবং নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। আচার্যের মুখ চোখ থমথমে।

সহকর্মীরা এর আগে কোনদিন তাঁর এ ধরনের চেহারা দেখেন নি। সুতরাং তাঁরা সভয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে স্যার?'

তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'বড় বাবুকে ডাকো।'

বড়বাবু এসে দাঁড়াতে তাঁকে বেশ গম্ভীর গলায় বললেন—'কোচবিহার কলেজের কি খুব দুরবস্থা?'

বড় বাবু হতভম্ব, প্রশ্ন, 'কেন স্যার?'

গর্জন করে উঠলেন জগৎবিখ্যাত দার্শনিক—'কেন মানে?' এইমাত্র কলেজের মাঠে দেখে এলাম, কলেজের বাইশটি ছেলে একটা বল নিয়ে

কাড়াকাড়ি করছে। কেন বাইশটা বল কিনে দেবার মত পয়সাও কি এত বড় কলেজের নেই?" (যুগান্তর, ৪৮ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা [উত্তরবঙ্গ সং] ১৭.১০.৮৪.)

কর্মজীবনে আচার্য শীল যেমন ছিলেন ছাত্র দরদী, তেমনি আবার ছাত্রদের বিশৃঙ্খলা বা দায়িত্বহীন কাজকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। একবার এক অধ্যাপকের সঙ্গে ছাত্রদের গণ্ডগোল বাধে। যার ফলে ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে। আচার্য এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গম্ভীর কণ্ঠে ছাত্রদের আচরণের জন্য তিরস্কার করেন। তাহার পর ছাত্ররা ভুল স্বীকার করিয়া অধ্যাপকের কাছে ক্ষমা চাহিয়া লওয়ায় সেইখানেই ঘটনার সমাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে কোন এক ছাত্রকে তাঁহার নিজের লেখা একটি বই উপহার দিয়াছিলেন এবং তাহাতে লিখিয়াছিলেন—'উইথ রিগার্ডস্'। ইহা দেখিয়া ছাত্রটি লজ্জিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ছাত্র যেমন অধ্যাপককে শ্রদ্ধা দেখাইবে। অধ্যাপকও ছাত্রকে কখনও অযথা অসম্মান করিবে না।'

অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে কোন জিনিস ব্রজেন্দ্রনাথ শিখিয়া লইতে পারিতেন। তিনি তাস খেলা জানিতেন না, কিন্তু 'রেপ অব দ্য লক' পড়াইবার সময় একজন পাকা খেলোয়াড়ের মত তাস খেলার কৌশল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতেন। একবার তিনি আরবী শিখিবার জন্য এম. এ. পাস এক মৌলভীকে তিন মাসের জন্য নিযুক্ত করেন, কিন্তু পনের দিন পরেই সেই মৌলভী আচার্যকে বলেন যে, তাঁহাকে শিখাইবার মত তাঁহার আর কোন বিষয় জানা নাই।

একবার তাঁহার স্ত্রীর ভীষণ অসুখ। বড় বড় ডাক্তারগণ আলোচনা করিয়া ওষুধের ব্যবস্থা করিয়াও রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইতেছিলেন না। এই সব দেখিয়া তিনি ডাক্তারী শাস্ত্রের কয়েকটি বই পাঠ করিয়া স্বল্পকালেই এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন যে, পরে তিনিও চিকিৎসকদের আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করিয়া রোগনির্ণয় বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন অধ্যাপকদের অধ্যাপক। সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়ীতে যে মজলিস বসিত সেখানে বহু অধ্যাপক এবং রাজ সরকারের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া জ্ঞানসুধা পান করিতেন। ইহাও দেখা যায় যে কলিকাতা হইতে একাধিক দিক্‌পাল কোচবিহারে আসিয়া তাঁহার দর্শন লাভের অমূল্য সুযোগ লাভ করিত। ১৯০৮-০৯ সনের একটি তথ্যে দেখা যায় যে প্রখ্যাত বাগ্মী, রাজনৈতিক নেতা ও লেখক বিপিনচন্দ্র পাল সপ্তাহ কাল ধরিয়া তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া বিভিন্ন ধরনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন

যেখানে এম. জে. এন. হাসপাতালের বহির্বিভাগ, সেইখানেই পূর্বে একটি পাকা দোতলা বাড়ীতে অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল থাকিতেন। উহা পরবর্তী কালে 'ব্রজেন্দ্র ভিলা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

আচার্যদেব ঠিক সময় মত কলেজে আসিতেন। কিন্তু একদিন কলেজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, আচাযদেব তখনও কলেজে আসিতেছেন না। শরীর খারাপ হইল বা অন্য কোন কাজে আটকাইয়া গেলেন তাহার কিছুই বোঝা গেল না। প্রধান করণিক আধ ঘণ্টা সময় অপেক্ষা করিয়া বাড়ীতে খোঁজ লইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, আচার্যদেব অন্যান্য দিনের মত ঠিক সময় মতই কলেজে যাইবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছেন। তবে কি রাজ দরবারে গেলেন অথবা কলেজের কাজে কোন সরকারী দপ্তরে গেলেন? এইসব কাজের জন্য হঠাৎ তিনি নিজেই বা যাইবেন কেন? কিন্তু তিনি হঠাৎ কোথায় যাইতে পারেন চিন্তা করিয়া অনেকেই তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া গেল। খোঁজ পাইতেও দেরী হইল না। দুই একজনের কাছ হইতেই শোনা গেল যে আচাযদেবকে কলেজের রাস্তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ সাগর দীঘির দিকে যাইতে দেখা গিয়াছে। তখন সন্ধানীরা সাগর দীঘির দিকে অগ্রসর হইলেন। করণিক মহাশয় সাগর দীঘির পাড়ে পৌছিয়াই আচার্যদেবকে দেখিতে পাইলেন। তিনি পুকুর পাড় দিয়া দক্ষিণ দিকে হাঁটিতেছেন। রাস্তার নাগরিকবৃন্দ সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়া যাইতেছে। করণিকটি আচার্যদেবকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন। আচার্যদেব কোন দপ্তরেই গেলেন না। পুকুরের চারি পাশ একবার ঘোরা হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার চলার বিরাম নাই। এইবার করণিকটি সাহস করিয়া আচার্যদেবের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'স্যার, আপনি কোন অফিসে যাইবেন?'

'অফিস! অফিসে যাইব কেন?' আচার্যদেব বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন—'আমি তো কলেজে যাইতেছি।'

অত্যন্ত বিনীত ভাবে করণিক মহাশয় স্মরণ করাইয়া দিলেন যে তিনি বিপরীত রাস্তা ধরিয়া হাঁটিতেছেন।

'ঠিক, ঠিক'—আচার্যদেবকে যেন একটু অপ্রতিভ মনে হইল। 'একটা বিষয় লইয়া ভাবিতেছিলাম। তাই ভুল পথে চলিয়া আসিয়াছি।' তখনই আচার্যদেব কলেজের পথ ধরিলেন।

কথাটা মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের কানে গেল। মহারাজা আচার্যদেবের কলেজে যাতায়াতের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এইটুকু রাস্তার জন্য

গাড়ী ? আচার্যদেবের ঘোরতর আপত্তি। সুতরাং ও প্রস্তাব বাতিল হইল, তবে আচার্যদেবের জন্য একজন চাপরাশীর ব্যবস্থা করা হইল। তাহার কাজ আচার্যদেবের সঙ্গে কলেজে যাওয়া আর কলেজ শেষে বাড়ীতে ফিরিয়া আসা। তবে কেউ কেউ বলেন যে তিনি ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করিতেন।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন। কোচবিহারে অবস্থান কালে এই সমাজের কাজে বিভিন্ন আলোচনা সভায় তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন। বৈরাগী দীঘির দক্ষিণ পাড়ে বর্তমান সাংস্কৃতিক সংঘের ভবনটি ছিল উপাসনা কক্ষ আর তাহার সংলগ্ন মাঠে উৎসবের সময় সমাবেশের ব্যবস্থা করা হইত।

ভিক্টোরিয়া কলেজে আচার্য শীলের ছাত্র, পরবর্তী কালে সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, লেখক স্বর্গত অশ্রুমান দাশগুপ্ত স্মৃতিচারণা করিতে গিয়া এক জায়গায় বলিয়াছেন—"আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ স্থিতধী প্রাজ্ঞের মত আজীবন জ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। আবার সৌভাগ্যের দিনে যখন বিশ্ববিদগ্ধমণ্ডলী কর্তৃক তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতার স্বীকৃতি, তাঁহার কণ্ঠে জগৎ জোড়া যশের মাল্য পরাইয়া দিয়াছিল, তখনও তিনি আত্মবিহ্বল হন নাই। পূর্বের ন্যায় অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান বারিধির অন্তর্নিহিত রত্নরাজি আহরণে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। আচার্য শীল ছিলেন যথার্থই এক স্থিত প্রাজ্ঞ জ্ঞানযোগী। জ্ঞানকে তিনি শুধু জ্ঞানের জন্য আজীবন আরাধনা করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানই ছিল তাঁহার পরম ইষ্ট। ইষ্টের আরাধনায় ছিলেন তিনি সর্বতোভাবে নিষ্কাম।"

বিশ্ব বিবুধ সংসদে আচার্য শীলের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রথম স্বীকৃতি ঘটিয়াছিল ১৮৯৯ সনে রোমে অনুষ্ঠিত International Congress of Orientalists (৩-১৫ অক্টোবর ১৮৯৯)-এর দ্বাদশ অধিবেশনে। এই অধিবেশন সম্পর্কে উক্ত আন্তর্জাতিক মহাসভা ভারত সরকারের নিকট এবং সেক্রেটারি অব স্টেট ইণ্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিকট নিম্নলিখিত আমন্ত্রণ-লিপি প্রেরণ করেন।

"Indian above all and the Far East are to us of the deepest interest. We trust, theretore, that the Oriental Princess who will read this invitation will extend their sympathy to the Twelfth Congress of Orientalists in Rome and honour it by their assistance as members or show their good-will by

sending those of their subjects or friends who wish to join our meeting "

আচার্য শীলের পাণ্ডিত্যের প্রতি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। এই আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়া তিনি কোচবিহার রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধিরূপে আচার্য শীলকে সেখানে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। শুভ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইল। এই বিষয়ে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে মঞ্জুর করিলেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন Hon'ble Mr. O. Kinealy. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন পণ্ডিতপ্রবর F. Maxmuller.

আচার্য শীল এই মহাসভায় নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।—

1. Evolution of Religious Ideas and Discipline in India.
(Ancient, Mediaeval and Modern)

2. System of Indian Philosophy compared with ancient, mediaeval and modern European System—a contribution towards History of Universal Culture.

কিন্তু সেইখানে গিয়া সকলের অনুরোধে তাঁহাকে যে বিষয়ে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল তাহা হইল—

A comprehensive Study of Christianity and Vaisnavism.

ইহার পর ১৯১১ সালে (২৬-২৯ জুলাই) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে The First Universal Race Congress-এর প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দিবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই মহাসভার অধিবেশন উদ্‌বোধন করিবার সম্মান সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকেই অর্পণ করা হয়। এই বিদ্বৎ সভায় তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Race Origins' নামীয় একটি গবেষণা পত্র। এই উপলক্ষে তিনি যে অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়। সমাগত বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী দ্বারা তিনি এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অন্যতম বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশে তাঁহার পাণ্ডিত্যের এই দ্বিতীয়বার স্বীকৃতি তাঁহার দেশবাসীর নিকট পরম গর্বের বিষয়।

বিশ্বজোড়া যশের বিজয় মুকুট পরিধান করিয়া আচার্য শীল ১৯১১ সনের নভেম্বর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যাঁহার অকুণ্ঠ সহৃদয়তা ও সাহায্যে এই বিশ্ববিশ্রুত গৌরব তিনি অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার সেই গুণমুগ্ধ বন্ধু মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ আর ইহলোকে নাই। ১৯১১ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। আচার্য শীলের গৌরবে গৌরবান্বিত কোচবিহারের শিক্ষিত সমাজ, অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্রগণ ভিক্টোরিয়া কলেজের উত্তরাংশের হলে আচার্য শীলকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মহারাজার পরলোক গমনে তিনি তাঁহার গভীর শোক বেদনাপ্লুত কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি দীর্ঘকাল ছুটিতে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অধ্যক্ষতা কাল ১৯১২ সনের প্রারম্ভেই শেষ হইয়া যায়।

কোচবিহার হইতে অবসর গ্রহণ কালে কোচবিহার রাজসরকার আচার্য শীলের সম্বন্ধে যে প্রশস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার কিছু অংশ এখানে তুলিয়া ধরিলাম—

The invaluable services of Dr. Brojendra Nath Seal M.A. Ph.D. whose retirement from the State Service caused an irreparable loss to the Victoria College of which he was the Principal for sixteen years deserve appreciative notice and grateful recognition. He was appointed to the post in March, 1896 and the departure made by His Highness the late Maharaja Bhup Bahadur in his selection was amply justified by Dr. Seal's distinguished academic attainments, intimate acquaintance with the working of the Calcutta University and extensive experience of the needs and conditions of Indian Education which immediately bore fruit in raising the status of the College.

The College had, however, before it years of strenuous endeavour under exceptional difficulties and trying circumstances due to successive crises of the Earthquake of 1897

which left it completely crippled in its resources, the imposition of a tuition fee in 1907-08 and the severe strain of the New University Regulations requirments but it maintained its steady progress under the wise guidance and able supervision of its Principal who unspairingly devoted himself to its welfare and its succeeded in attaining the position of one of the mostly conducted and highly efficient First Grade College of the Reformed Calcutta University to which alone was granted the unique privilege of unrestricted affiliation in all branches of Philosophical studies for the M.A. degree. Dr. Seal extended his untiring energy and activity beyond the sphere of his legitimate duties of the re-organisation of the State Higher English Schools (Collegiate and subdivisional) which he admirably effected with the limited resources at his disposal.

The climate of Cooch Behar and the nature of his duties resulted in a complete break-down of his health compelling him to retire in February, 1913 on a special pensionary allowance but he has left the educational institutions of the State in a really efficient condition with their popularity and progress assured.

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কোচবিহারে অবস্থানকাল (১৮৯৬-১৯১৩) স্মরণীয় হইয়া আছে।

কোচবিহারে তাঁহার স্মৃতিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে বহু লেখা-লেখি, আবেদন-নিবেদনের পর ১৯৭০ সনে ভিক্টোরিয়া কলেজের নাম.পরিবর্তন করিয়া আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয় করা হইয়াছে এবং তাঁহার শতবর্ষ উপলক্ষে কলেজের একটি ভবন নির্মাণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে :

ACHARYA

BROJENDRANATH SEAL

(B. Sep. 3, 1864, ;D. Dec. 3., 1938)

PRINCIPAL VICTORIA COLLEGE
COOCH BEHAR
(1896-1913)

This bust is erected by the Acharya Seal Birth Centenary Celebration Committee in December 1967, to mark the occasion of his Birth Centenary Celebration held in March, 1965.

রাজা পঞ্চম জর্জের ভারত ভ্রমণকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানস ও নৈতিক বিজ্ঞানের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। ১৯১৩ সনে কোচবিহারের কর্মভার ত্যাগ করিয়া তিনি ঐ সম্মানিত পদে সাত বৎসর কাজ করেন। যদিও ইহার পূর্বেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান উভয় অনুষদের সদস্য মনোনীত হন। তাঁহার পঠন পাঠন পদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন অসংখ্য গুণ-মুগ্ধ ছাত্র ও শিষ্য। তাহাদের স্মৃতিচারণের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও ব্যক্তিত্বের আভাস।

১৯২১ সনে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেখানে দীর্ঘ দশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। এই রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁহার দান অপরিসীম। ১৯৩০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সনে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহীশূর রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে তিনি "রাজতন্ত্র-প্রবীণ" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সকল উপাধির উর্ধে তিনি সকলের আচার্যদেব হিসাবেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

তাঁহার নিজস্ব মৌলিক রচনা এবং গবেষণা-ধর্মী লেখার তালিকা বিরাট। তাহা হইতে কয়েকটি বিশ্ব-বন্দিত রচনার নাম এখানে উল্লেখ করিলাম।—

"A Memoir of the Co-efficient of Numbers—A Chapter on the Theory of Numbers" (1891) ; "Neo-Romantic Movement in Bengali Literature 1890-91" ; "A Comparative Study of Christianity and Vaisnavism" (1899) ; "New Essays in Criticism" (1903) ; "Introduction to Hindu Chemistry" ; "Positive Sciences of the Ancient Hindus" (1915) ; "Race-Origin" ; "Syllabus of Indian Philosophy" (1924) ; "Rammohan, the Universal Man" (1933) ; "The Quest Eternal" (1936).

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তিত্বের প্রভাব ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উপর পড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার গভীর অন্তরঙ্গতার অনেক তথ্য সর্বজনবিদিত। একটি অপূর্ব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা জানাইয়াছিলেন।

শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন এবং কয়েকবার পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী থাকিলেও জরা, ব্যাধির জ্বালার উর্ধে থাকিয়া জ্ঞানচর্চা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৮ সনের ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতার ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই জ্ঞান-বর্ত্তিকা নিভিয়া যাওয়ার সংবাদে সমস্ত বিশ্ব শোকবিহ্বল হইয়া পড়ে। বিভিন্ন স্থানে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এইখানে দার্শনিক রাজনীতিবিদ্ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণানের একটি সশ্রদ্ধ অভিমত দিয়া শেষ করিতেছি।—

"He was great as an educationist, philosopher and political theorist, but the more impressive point was his symplicity of disposition and largeness of heart. ...This is not the moment to recount the great services which Sir Brajendranath Seal has rendered to this country, and its culture. He was known in his time as the greatest servant. His prodigious learning in many branches of knowledge was the admiration and despair of lesser minds. Generations of students in Bengal sat at his feet and received his inspiration. As Principal of the Cooch Behar (Victoria) College, as the first George V Professer of this University, as a member of the Senate and Post-Graduate Committee, at a time when the Post-Graduate courses were being shaped in Calcutta, at the Vice-Chancellor of the University of Mysore, he rendered inestimatable services to the course of education. His work as a practical social reformer is well-known. His report on the Mysore reforms is a document worthy of any political thinker."

কোচবিহারে নজরুল ইসলাম

"আসা-যাওয়া পথের ধারে" কোচবিহারের সঙ্গে বহু স্মরণীয় ব্যক্তির পরিচয় হইয়াছে। এই অধ্যায়ে 'বিদ্রোহী কবি' নজরুলকে সম্পূর্ণ রূপে জানার চেষ্টা নয়। তিনি কোচবিহারে আসিয়া কোথায় কি করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে একটি তথ্য তুলিয়া ধরার চেষ্টা মাত্র বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মদ লিখিত "আমার শিল্পী জীবনের কথা" বইটী হইতে একটি উদ্ধৃতি তুলিয়া ধরিতেছি। এই অংশটুকু পড়িলে নজরুল ইসলামের কোচবিহারে আগমন বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা হইবে বলিয়া মনে করি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে তিনি লিখিতেছেন—

"কাজি নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখি আমি যখন কুচবিহার কলেজে বি. এ. ক্লাশের ছাত্র। স্কুল ও কলেজের মিলিত বার্ষিক মিলাদ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি কুচবিহারে আসেন। স্টেশনে গিয়েছি তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য। ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা হতে তিনি নামলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই কী বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন! মাথায় বিরাট কালো কৃষ্ণ বাবরী চুল, বিশালায়ত আঁখি আর মোম-লাগানো এক জোড়া গোঁফ। শোভাযাত্রা করে তাঁকে কলেজ হোস্টেলে নিয়ে আসা হল। সৌভাগ্য বশতঃ আমার প্রকোষ্ঠেই তাঁর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুপুরে মিলাদ অনুষ্ঠান শেষ হল। নতুন মসজিদ প্রাঙ্গণে বিকাল চারটা থেকে কবির বক্তৃতা। তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন আর চার-পাঁচ মিনিট পরে পরেই বলছেন—'আপনারা এই মিলাদ উপলক্ষ্যে আমার বক্তৃতা শুনবার জন্য আমার কাছ থেকে যা আশা করছেন সে আশা পূর্ণ আমি করতে পারব না। আমি বক্তা নই, বক্তৃতা দিতে উঠলে আমি কথার খেই হারিয়ে ফেলি। আমার যা বক্তব্য আমি গানে-গানে বলতে চেষ্টা করি।'

আসরের নামাজের জন্য পনের মিনিট সভার কাজ বন্ধ রইল। নামাজ শেষে পুনরায় সভার কাজ শুরু হল। কবি বলে উঠলেন, 'আপনারা আমাকে মিলাদের সভায় ডেকে এনে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনবেন আশা করেছিলেন, কিন্তু আমি ধর্ম বিষয়ে কি বলব? যৌবনই আমার ধর্ম, যৌবনের কর্ম-চাঞ্চল্যের প্রতিটি মুহূর্তই আমার এপার ওপারের পাথেয়। আমার কথা হল, বর্ত্তমানে

বড় ধর্ম দেশের কাজ। পরাধীনতার গ্লানি আর আপনারা কত কাল বয়ে চলবেন? আপনারা লক্ষ্য করেছেন, আসরের নামাজ আমি পড়লান না। পরাধীন দেশে কী করে নামাজ পড়ি? আমার দেশ স্বাধীন না হলে আজ নামাজ পড়তে বসে যদি ইংরেজ আমার জায় নামাজ কেড়ে নেয়…?'

এ কথা শোনা মাত্রই সভায় উঠল অস্ফুট গুঞ্জন। সে গুঞ্জন ক্রমশঃ কলহে পরিণত হতে চলল। আমরা ছাত্ররা বেগতিক দেখে তাঁকে নিয়ে হোস্টেলে সরে পড়লাম। সন্ধ্যার পর বৈরাগী দীঘির ধারে কুচবিহার ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর গানের আসব বসল। শহরের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সে আসরে ভিড জমিয়েছে। সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা অবধি সেখানে তিনি একা গেয়ে চলেছেন তাঁর শিকল পরার গান, চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতি ইত্যাদি। গানে আবৃত্তিতে সবার প্রাণে এনে দিলেন যৌবন জোয়ার।

কুচবিহার করদ-মিত্র রাজ্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে এত কথা এত গান বড় বড কর্তাদের কানে গেল। পুলিশের কর্মচারীরা সাদা পোষাকে হোস্টেলের আশেপাশে আনাগোনা শুরু করল। কাজি সাহেব নির্বিকার। তাঁকে নিয়ে এ-বাসা সে-বাসায় চলল ঘরোয়া জলসা। আমি তখন কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প লিখি। আয সাহিত্য সমাজ থেকে আমি 'কাব্য রত্নাকর' উপাধি পেয়েছি। নামের শেষে সেই উপাধিটা দেখে কাজি সাহেব বলে উঠলেন, 'এত অল্প বয়সে এত বড় লেজ লাগিয়েছ কেন?' লজ্জায় মরে গেলাম। জীবনে অতঃপর আর এ উপাধিটা কোথাও ব্যবহার করি নি। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেউ হয়তো গোপনে আমার শত্রুতা সাধন করেছিল, কারণ কাজি সাহেব বলে উঠলেন, 'তোমার লেখা গল্পতো পড়লাম, এবার একখানা গান শোনাও দেখি?' আমি এবার সত্যি লজ্জায় যেন মিইয়ে গেলাম। শিল্পীদের প্রথম জীবনে এটা হয়ই। কেউ যদি বলে, 'এ বেশ গায়', অমনি বলা হয়, 'যাঃ মিথ্যুক কোথাকার। কিছুতেই সংকোচ কাটিয়ে হারমোনিয়ামের পাশে যেতে পাচ্ছি না। কাজি সাহেব বলে উঠলেন, 'তুমি ভয় পেয়ো না, আমি কোনও ভুল ধরব না, নিশ্চিন্তে গেয়ে যাও।' রবীন্দ্র-সংগীত ধরলাম—'সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে।' কাজি সাহেব মহা উৎসাহে আমার পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, 'অদ্ভুত মিষ্টি কণ্ঠ! দেখ, তোমার নিজের চেহারা যেমন আয়না ছাড়া তুমি নিজে দেখতে পাও না, তেমনি তোমার গলার সুরও কত মিষ্টি তুমি নিজে বুঝতে পারবে না,

যদি না রেকর্ডের মাধ্যমে শোনো। তুমি কলকাতা চল, গান রেকর্ড করাব তোমার।"

(আমার শিল্পী জীবনের কথা, আব্বাসউদ্দীন আহম্মদ, পৃ-১৮০ ।)

কোচবিহার স্টেশন হইতে শোভাযাত্রা করিয়া কবিকে ভিক্টোরিয়া কলেজ (বর্তমান এ. বি. এন. শীল কলেজ) হস্টেলে লইয়া আসা হইল। কাজী সাহেবের বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল নতুন মসজিদ প্রাঙ্গণে। লাল দীঘির পশ্চিম পাড়ে এই মসজিদটি অবস্থিত। কাজী সাহেবের জ্বালাময়ী ভাষণ শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইল না। যাহার ফলে সভাস্থলের শান্তি বিঘ্নিত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া ছাত্ররা তাঁহাকে হস্টেলে লইয়া যায়। সন্ধ্যার পর বৈরাগী দীঘির দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত কোচবিহার ক্লাব প্রাঙ্গণে গানের আসর বসে। অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হয়। রাত্রি একটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান হয়। এই সমাবেশে পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে শিকল পরার গান, চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতি প্রভৃতি দীর্ঘ দিন কোচবিহারবাসীর মুখে শোনা যায়। কবির দরাজ গলার গান শোনার স্মৃতি এক অমৃত-নির্ঝর বাণী বলিয়া স্মরণীয় হইয়া আছে। করদ-মিত্র রাজ্য কোচবিহারে স্বদেশী গান গাওয়া বা রাজনৈতিক আন্দোলন করা নিষিদ্ধ ছিল। সেই সময়ে নজরুলের কণ্ঠস্বর এবং ব্যক্তিত্ব কোচবিহারে এক নূতন জোয়ার লইয়া আসে। পুলিশের নজরদারিকে পরোয়া না করিয়া তিনি নিজের মনে গাইতে-বলিতে থাকেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় দিন তিনি স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে ঘরোয়া আসরে গান করেন। সেই সময়ে কোচবিহারের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও পরিচারিকা পত্রিকার সহ-সম্পাদক জানকীবল্লভ বিশ্বাসের বাড়ীতে কবি যান এবং আলাপ আলোচনার পর হারমোনিয়াম লইয়া গান করিতে বসেন। তাহার পর জেন্‌কিন্স স্কুলের যশস্বী শিক্ষক এবং লেখক বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতেও তিনি যান। ইহা ছাড়াও ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালিত মাতৃ মঠেও কিছু সময় কাটান এবং গান করেন। এইভাবে তিনি কোচবিহারে দুই দিন কাটাইয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। মসজিদের এত গণ্ডগোল কিন্তু পরবর্তী তাঁহার বিভিন্ন গানের আসরে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

কাজী সাহেব কবে কোচবিহারে আসেন সেই সন তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। শ্রীবিশ্বনাথ দে-সম্পাদিত 'নজরুল স্মৃতি' গ্রন্থে আব্বাস-উদ্দীন আহ্‌মদ "কাজীদার কথা" নামক স্মৃতি কথায় বলিয়াছেন—"১৯৩০ সনে প্রথম গান রেকর্ড করে কুচবিহারে চলে আসি। ১৯৩১ সনে আবার কলকাতা

যাই এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করি। গ্রামাফোন কোম্পানীর রিহার্সাল ঘর তখন চিৎপুর রোডে। শুনলাম কাজী সাহেব সেখানে রোজই যান। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজী সাহেব কোথায়?' তিনি বললেন, 'পাশের ঘরে গান লিখছেন।' আমি ঢুকলাম। তিনি মহা উৎসাহে বলে উঠলেন, 'আরে আব্বাস, তুমি কবে এলে? বস বস।' সর্বনাশ, এই কি কাজী সাহেব! চেহারার কী পরিবর্তন! এক বৎসর আগে কুচবিহারে যে কাজী সাহেবকে দেখেছি তিনি যে এমন ভাবে বদলে যেতে পারেন স্বপ্নেও ভাবি নি।" এই উদ্ধৃতি দেখিয়া মনে হয় তিনি ১৯৩০ সন নাগাদ কোচবিহারে আসিয়াছিলেন।

কোচবিহার পৌরসভা

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত জেলা সহর কোচবিহার। একদিন মানুষের প্রয়োজনে এই সহর গড়িয়া ওঠে। সেই সময়ে সহরের আয়তন ছিল ২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ছয় হাজার। ১৯৫০ সনে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই নূতন সাজে রূপ গ্রহণ করে। সহরের আয়তন, লোকসংখ্যা, রাস্তাঘাট, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। বর্তমানে সহরের আয়তন ৩·২০ বর্গ মাইল।

এই সহরের গোড়াপত্তনের পর ১৮৮৪ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী টাউন কাউন্সিল গঠিত হয়। রাজদরবারের অনুগ্রহ-পুষ্ট মনোনীত ব্যক্তিগণই এই কাউন্সিলের সদস্য হন। কিছুদিন পরেই ১৮৮৫ সনে টাউন কমিটি এ্যাক্ট নামে রাজদরবারে একটি আইন পাশ হয়। ইহা State Council Act I of 1885-এর অংশ। ৪ঠা এপ্রিল টাউন কমিটির পত্তন হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া টাউন কমিটি গঠিত হয়—

১। মেজর ইভান্স গর্ডন—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব স্টেট, চেয়ারম্যান
২। বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী—ফৌজদারী আহিলকার, ভাইস চেয়ারম্যান
৩। বাবু কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর—দেওয়ান, সদস্য
৪। বাবু বুল্লুরাম মল্লিক বাহাদুর—সিভিল জজ, সদস্য
৫। ডাঃ জে. ব্রীজকো—সিভিল সার্জেন, সদস্য
৬। বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব ওয়ার্কস্, সদস্য
৭। কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ—সদস্য
৮। বাবু মহেশচন্দ্র সেন—ব্যবহারজীবী, সদস্য
৯। মনোমোহন বক্সী—সদস্য

প্রত্যেক মাসের সোমবার এই টাউন কমিটির সদস্যগণ মিলিত হইয়া তাঁহাদের কার্যবিধি স্থির করিতেন।

কর নির্ধারণের জন্য পাঁচজন সদস্য লইয়া একটি পঞ্চায়েত কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা কর সম্পর্কীয় যাবতীয় নীতি স্থির করিতেন। তাঁহাদের গৃহীত কয়েকটি কর নীতি এইখানে তুলিয়া ধরা হইতেছে। প্রতি খাটা পায়খানার জন্য ১২ আনা (বর্তমান ৭৫ পয়সা) হিসাবে কর ধরা হইয়াছিল এবং প্রতি গরুর

গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী এবং চক্রযানের জন্য কত কর ধরা হইবে ইহাও স্থির হইয়াছিল। পৌর এলাকায় জলের অভাব থাকায় টাউন কমিটিতে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সেই জন্য দেখা যায় টাউন কমিটি সাগর দীঘির জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং অন্য ভাবে ব্যবহার করিলে তাহার জন্য শাস্তিরও বিধান করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত শ্মশান এবং কবরখানার জন্যও স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রথম বৎসরের বাৎসরিক বিবরণীতে দেখা যায় যে সর্বসাকুল্যে বিভিন্ন খাতে টাউন কমিটির আয় মাত্র ১৬২৮৭ টাকা ১৫ আনা ৯ পাই এবং বিভিন্ন খতে ব্যয় হয় মাত্র ১৬২৬৪ টাকা ২ আনা ৯ পাই। তখন হিসাব পরীক্ষার দায়িত্ব ছিল কোচবিহার রাজ্যের অডিট বিভাগের উপর। তখন ওয়ার্ডের সংখ্যা ছিল ৮। টাউন কমিটির অফিস কর্মচারীর হিসাব না পাওয়া গেলেও বহির্বিভাগীয় (out-door) কর্মাদের যে হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে মোট কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ—

চৌকিদার—৩০ জন, কেরোসিনের বাতি জ্বালাইবার জন্য—৫ জন, ঝাড়ুদার—১২ জন, অগ্নিনির্বাপক—৬ জন, কর আদায়কারী—১ জন।

মল অপসারণের জন্য :—

ওভারসিয়ার—১ জন, জমাদার—১ জন, সর্দার—৪ জন, হরিজন (পুরুষ)—১৮ জন, হরিজন (মহিলা)—৭ জন।

টাউন কমিটির এলাকায় মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৭½ মাইল। তাহার মধ্যে পাকা রাস্তা ছিল ৭½ মাইল। টাউনের অনেক রাস্তাই খানা-ডোবায় ভর্তি ছিল। সেই সমস্ত বড় বড় খানা-খন্দগুলিকে সংস্কার করিয়া পুকুরে পরিণত করা হয় এবং বাড়তি মাটি দিয়া ছোট ছোট গর্তগুলিকে ভর্তি করা হয়। সহরের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সম্পর্কে দেখা যায় যে কোচবিহার সহর স্বাভাবিক ভাবেই নিচু এবং জলা জায়গা, পুরাতন নদীগর্ভের অংশ, তাহার উন্নতির জন্য এই কমিটি যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। ভূমির গুণে বর্ষাতে সহরে অল্পতেই জল জমিয়া যায়। সহরটি পুরাতন তোর্ষা নদীর বিভিন্ন শাখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং শাখা নদীগুলি সহরের একমাত্র জল নিষ্কাশনের পথ ছিল। টাউন কমিটি অনুভব করেন যে সহরের ভূমির উচ্চতা এবং নদীর জলের উচ্চতা সমান হওয়ায় বর্ষাকালে নদীর জলের স্ফীতি সহরকে জলমগ্ন করে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন। এই মর্মে বিভিন্ন প্রস্তাব টাউন কমিটি গ্রহণ করে। বর্তমানে প্রায় সমগ্র

সহরকে বেষ্টন করিয়া বাঁধ দেওয়ার ফলে এই জলমগ্নতার সমস্যার সমাধান হইলেও সমস্ত সহর জলবদ্ধতার নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে।

টাউন কমিটির বিভিন্ন হিসাবে দেখা যায় যে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য কমিটি সরকারের কাছে ঘাটতি পূরণের জন্য বার বার অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই আর্থিক দুরবস্থার চিত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

সুদীর্ঘ ১৮৮৫ সন হইতে ১৯৪৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সহরের নানাবিধ উন্নয়ণের কাজ করার দায়িত্ব এই টাউন কমিটির হাতেই ন্যস্ত ছিল। এই টাউন কমিটির সদস্যগণ রাজদরবারের দ্বারাই মনোনীত হইতেন। তাহার পর ১৯৪৬ সনের ১লা জানুয়ারী মাস হইতে কোচবিহার পৌরসভা গঠিত হয়। এই বোর্ডের সদস্যগণও রাজদরবার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। সহরের সমস্ত পুকুর এবং পার্ক কোচবিহার টাউন কমিটি করিলেও ১৯৪৩-৪৪ সনে তৎকালীন রাজদরবারের আদেশ বলে নূতন করিয়া ফিসারী এবং হরটিকালচার বিভাগ খোলা হয় এবং টাউন কমিটির হাত হইতে সমস্ত পার্ক এবং পুকুরগুলি ঐ বিভাগের অধীনে চলিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাহার পর হইতেই পৌর সদস্যগণ বারংবার রাজ্য সরকারের কাছে ঐগুলি পুনরায় ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন-নিবেদন করিয়া আসিতেছেন।

রাসমেলার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, বিশেষ করিয়া জনস্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য ১৯০৭ সন হইতে টাউনকমিটিকে রাসমেলাপরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। টাউন কমিটির ১৯০৭-০৮ সনের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় মেলার পরিচালনার বাবদ ২৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তৎকালীন টাউন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ ই. এল. এল. হামণ্ড, বি. এ. আই. সি. এস.। রাসমেলায় প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর প্রবর্তন হয় ১৯২৮ সনে।

সহরের একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য বাজার (ভবানীগঞ্জ বাজার) তৎকালীন ১০-১৫ হাজার লোকের অনুপাতে তৈয়ারী করা হইয়াছিল। পরে ইহা ১৮৮৫ সনে টাউন কমিটির হাতে আসে। পরবর্তী কালে সহরের দক্ষিণ প্রান্তে কালিকা বাজার ১৯০৫ সনে স্থাপিত হয়। দীর্ঘদিন পরে গত ২৭.১১.১৯৮৫ তারিখে কালিকা বাজারের আমূল সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করিয়া উদ্বোধন করা হয়। রাত্রিতে বাজার করার চেষ্টা কর্তৃপক্ষ করিলেও তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। বর্তমানে ভবানীগঞ্জ বাজারের উপর সহরের, সহরতলীর এবং বিভিন্ন মহকুমার কয়েক লক্ষ লোককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নির্ভর করিতে হয়। বাজার সম্প্রসারণে কোন স্থান না পাওয়ায় রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান গড়িয়া ওঠে।

বিভিন্ন এলাকায় বৌবাজার, জামাই বাজার, দীপ্তি সংঘের বাজার তৈয়ারী হয়। এইসব বাজারগুলি রাস্তার যান চলাচলের অসুবিধা সৃষ্টি করিলেও দৈনন্দিন প্রয়োজনে ভিড় এড়াইবার জন্য ও দূরত্বের অসুবিধা অতিক্রম করিবার জন্য ইহাদের প্রয়োজনীয়তাকে পৌর জীবনে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইগুলিকে একত্রিত এবং কেন্দ্রীভূত করিয়া একটি সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করা যায় কিনা সে বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষের চিন্তা এবং প্রচেষ্টা গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহাতে পৌর আয় বৃদ্ধি পাইবে। পৌর এলাকার সৌন্দর্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে এবং যান চলাচলের বিপদ দূরীভূত হইবে। জীবিকা সংস্থানের জন্য যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা রাস্তার দুই পাশে নূতন দোকান চালু করিয়াছেন তাহাদের জন্য সহরের উন্নত এলাকায় পরিচ্ছন্ন পরিবেশে আধুনিক রুচিসম্মত আবাস গৃহে দোকান স্থাপনের সুযোগ দান করা উচিত। ইহাতে পৌর এলাকার যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইবে, সেই রূপ অর্থনৈতিক গুরুত্বও বাড়িবে এবং নূতন কর্ম-সংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাইবে। সেই সঙ্গে এককালে কোচবিহার পৌর এলাকা, যাহা উত্তরবঙ্গের উদ্যান বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহার আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

টাউন কমিটির পরিবর্তে যে 'পৌরসভা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই পৌর সভার সকল সদস্যই মনোনীত ছিলেন। এই নব-বিধানের সূচনা হয় ৬.১.১৯৪৬ তারিখে নিজস্ব পৌর ভবনে সকাল দশটার সময়ে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া প্রথম পৌরসভা গঠিত হয়।

১। রায় সাহেব উমানাথ দত্ত—পৌরপতি
২। নির্মলকুমার মুস্তফী—উপ-পৌরপতি
৩। বজলে রহমান—সদস্য
৪। হিমাদ্রিবল্লভ বিশ্বাস—সদস্য
৫। ধীরেন্দ্রমোহন সেন—সদস্য
৬। রায় সাহেব পি. আর. বিশ্বাস—সদস্য
৭। মেজর বি. সি. চ্যাটার্জী—সদস্য
৮। অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য—সদস্য
৯। উমেশচন্দ্র বণিক—সদস্য
১০। সুধাংশুমোহন বক্সী—সদস্য
১১। মজিরউদ্দিন আমেদ—সদস্য

এই মনোনীত সদস্য দ্বারা গঠিত পৌর ভা ১৯৪৯ সনে নির্বাচিত প্রতিনিধি

দ্বারা গঠিত পৌর সভায় পরিণত হয়। ইহার মধ্যে ৯ জন নির্বাচিত এবং ৬ জন মনোনীত সদস্য। সুধাংশুমোহন বক্সী নির্বাচিত কমিশনার কিন্তু কোচবিহার রাজদরবার কর্তৃক মনোনীত পৌরপতি এবং অজিতকুমার রায় কমিশনারদের মধ্য হইতে নির্বাচিত উপ-পৌরপতি ছিলেন। ১৯৪৬ সনে পৌরসভার স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৯৭ জন।

তাহার পর ১৯৫৩ সনের নির্বাচনের পর শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রথম নির্বাচিত কমিশনার এবং নির্বাচিত পৌরপতি হন। তাহার পর নিয়মিত ভাবে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই নির্বাচন ১৯৪৪ সনের কোচবিহার পৌর আইন অনুসারে পরিচালিত হইয়াছে। এই আইনের ধারা সংশোধন করা হয় ১৯৬৪ সনে। পৌর এলাকার প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের এই সংশোধনী আইন গৃহীত হয় এবং সেই নিয়ম অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচিত বোর্ড দীর্ঘকাল কাজ করিবার পর ১৯৩২ সনের বঙ্গীয় পৌর আইন কোচবিহারে চালু করা হইয়াছে। ১৯৭০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে বোর্ড মনোনীত হইয়া কাজ করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের কার্যকাল শেষ হইয়াছে ১৯৭৩ সনের ১৮ই মে এবং পৌর বোর্ড বাতিল করিয়া রাজ্য সরকার নিজের হাতে পৌর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও প্রশাসক নিয়োগ করেন। ১৯৬৪ সনের পর আর নির্বাচন হয় নাই। এই সময়ে ১২টি ওয়ার্ড ছিল। ১৯৭৪ সনে স্থায়ী কর্মচারী ছিল ৩২৪ জন আর পৌর এলাকার জনসংখ্যা ছিল ৫৩,৭৩৪ জন (জনগণনা-১৯৭১)।

যে আকার লইয়া পৌরসভার সূচনা হইয়াছিল তাহা এখন আর নাই। দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাহার অনেক কিছুই পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না করিয়া ১৯৭২-৭৩ সনের মোট আয়-ব্যয়ের বাজেটের একটি চিত্র তুলিয়া ধরিতেছি।—

আয়—১২,৫৪,১৬৮·৯৩ টাকা (সরকারী অনুদান ও ঋণ সহ)।

ব্যয়—১২,৪১,৮০৩·৪২ টাকা।

কোচবিহার পৌর আইনে কেবলমাত্র করদাতা ও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই ভোটদানের সুযোগ পাইতেন।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা দ্রুত পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রত্যেক সহরের পৌরসভাকেও এই পরিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাত বহন করিতে হইতেছে। ইহার ফলে তাহাদের আয়তন,

কর্মনীতি প্রভৃতি প্রত্যেক দিক দ্রুত পরিবর্তনশীল। কোচবিহারের পৌরসভাও ইহার ব্যতিক্রম নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভার সঙ্গে কোচবিহার পৌরসভারও ১৮ বছর বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলভিত্তিক প্রথম পৌর নির্বাচন হয় ৩১.৫.১৯৮১ তারিখে। তবে কংগ্রেস দল এই সময়ে নির্বাচন বয়কট করে। সেই সময়ে ওয়ার্ড সংখ্যা হয় ১৮টি। নির্বাচনে অনেকেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন। বোর্ড প্রতিনিধিদের দলগত অবস্থা :—সি. পি আই. (এম)—৬, ফরোয়ার্ড ব্লক—৫, আর. এস. পি—২, সি. পি. আই.—১, নির্দল—৪।

বামফ্রন্টের হাতেই স্বাভাবিক ভাবে পৌরসভা পরিচালনার দায়িত্ব আসে। সি, পি, আই, (এম) দলের পক্ষ হইতে পৌরপতি নির্বাচিত হন। এই বোর্ডের মাধ্যমে পৌর সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করার দিকে ব্যাপক দৃষ্টি দেওয়া হয়। বড় বড় কাজগুলির মধ্যে মস্‌জিদবাড়ী দীঘি ভরাট করিয়া ভবানী বাজারের সম্প্রসারণ (উদ্বোধন ১৪.৪.১৯৮৫), কালিকা বাজার সংস্কার, জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থায় পাকা নর্দমা, টাউন লাইব্রেরী, রাস্তায় নিয়ন লাইট, ২৭.১১.১৯৮৫ তারিখে পান্থ নিবাস ও সুকান্ত মঞ্চ উদ্বোধন, ১৫.৫.১৯৮৬ তারিখে পৌরসভার পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্বোধন বিশেষ স্মরণীয়। ১৯৮১ সনের জনগণনা অনুসারে কোচবিহার পৌর এলাকার লোকসংখ্যা—৬৭,৬৯০ জন।

এই বোর্ড পাঁচ বছর দায়িত্বে থাকার পর ১৯৮৬ সনের ১৫ই জুন দ্বিতীয় বার নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনেও বামফ্রন্ট প্রার্থীরা পুনরায় ক্ষমতা দখল করেন। নির্বাচিত বোর্ড সদস্যদের দলগত অবস্থা—সি, পি, আই (এম)—৮, ফঃ বঃ—৪, কংগ্রেস—৪, নির্দল—২। সি, পি, আই (এম) দলের সদস্য পৌরপতি নির্বাচিত হন।

কোচবিহার পৌরসভা তাহার আর্থিক দুর্বলতা কাটাইয়া গণমুখী কাজ দ্রুততার সঙ্গে করিয়া যাইতেছে। আগামীতে আরও অনেক কাজ হইবে বলিয়া আশা রাখি।

কোচবিহারে পঞ্চায়েতীরাজ

কোচবিহার করদ-মিত্র রাজ্য হইলেও এইখানকার শাসন ব্যবস্থা ছিল কিছুটা ভিন্ন ধরনের। সম্ভবত অনুন্নত গ্রামগুলির কথা চিন্তা করিয়াই তৎকালীন শাসকবৃন্দ একটি গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনা করেন ১৮৯৩ সনে। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে যে কানুন প্রবর্তিত হয়, তাহাই 'কোচবিহার গ্রামীণ চৌকিদারী' আইন নামে অভিহিত। এখন অবশ্য আমাদের কাছে 'পঞ্চায়েত কথাটি খুবই পরিচিত। এমনকি, সাম্প্রতিক কালে ইহার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণও হইয়া থাকে। অথচ ভাবিলে আশ্চয হইতে হয় যে উনিশ শতকের শেষের দিকে কোচবিহারে চৌকিদারী কানুনের মাধ্যমে যে গ্রাম্য বিচার সভা চালু হইয়াছিল, কাযতঃ ইহাও একটি পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার প্রাচীন নিদর্শন।

এই গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার একটি নিয়মতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থাও ছিল। ইহার গঠন কাঠামোটি ছিল নিম্নরূপ—প্রত্যেক গ্রাম কিম্বা কয়েকটি গ্রামাংশের জন্য অন্যূন তিন এবং অনধিক পাঁচ সদস্যের পঞ্চায়েত গঠন করা ফৌজদারী আহিলকারের দায়িত্ব। তবে এই পঞ্চায়েত গঠনের পূর্বে কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইত পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার যোগ্য কোন্ কোন্ ব্যক্তি। পঞ্চায়েত সদস্যদের যোগ্যতার মাপকাটি ছিল তিনটি—১। প্রত্যেক সদস্যকে সেই গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা হইতে হইবে। ২। সেই এলাকায় জমির মালিকানা বা দখলীকৃত জমি থাকা চাই। ৩। কোন অঞ্চলে জমির মালিক পঞ্চায়েত সদস্যকে সেই গ্রামাঞ্চলের এক মাইলের মধ্যে বসবাস করিতে হইবে।

যদি কোন নির্বাচিত সদস্য দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক হন অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে কাজে অবহেলা দেখান তবে ত্রিশ দিনের মধ্যে ফৌজদারী আহিলকারকে আবেদন পত্রে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, নতুবা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইত। এইরূপ জরিমানা হইলে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল হইবে এবং ঐ তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে তিনি আর সদস্য হইতে পারিবেন না। ফৌজদারী আহিলকার তাঁহার লিখিত আদেশ বলে কোন সদস্যকে পদচ্যুত অথবা কর্মচ্যুত করিতে পারিতেন। তিনি গ্রামের চৌকিদারের সংখ্যা স্থির করিতেন এবং তাহাদের মাসিক বেতন তিন টাকা

হইতে ছয় টাকার মধ্যে কত হইবে তাহাও ঠিক করিতেন। গ্রামে বাৎসরিক কর ধার্য করিয়া চৌকিদারদের বেতন বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থাপন করা হইত।

সম্পত্তির রকম অনুসারে খাজনার হার স্থির করা হইত। এক ব্যক্তির উপর ধার্য কর কোনক্রমেই আট আনার বেশী হইত না। এক পয়সা কর দিতেও অক্ষম এমন গরীবদের রেহাই দেওয়া হইত।

বাংলা বৎসর সূচনার দুই মাস পূর্বে পরবর্তী বছরের জন্য পঞ্চায়েত একটি নির্ধার তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি লিখিত থাকিবে এবং মাসিক কত কর ধার্য করা হইল তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া নূতন বৎসর সূচনার পনের দিন পূর্বে ঐ গ্রামের একটি প্রকাশ্য স্থানে উহা টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে।

নির্ধার তালিকা প্রকাশিত হইবার সাত দিনের মধ্যে ঐ তালিকা প্রকাশনের বিবরণ সহ সেইটি ঐ এলাকার আউট পোষ্টে অথবা পুলিশ স্টেশনে জমা দিতে হইবে। তারপর ঐ আউট পোষ্ট অথবা পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার যথাশীঘ্র ঐ তালিকা উক্ত এলাকার ফৌজদারী কোর্টে পাঠাইতেন।

ফৌজদারী আহিলকারের সম্মতিযুক্ত নির্ধার তালিকা অপরিবর্তিত রাখিয়া পরবর্তী বছরেও ব্যবহার করা যাইত, কিন্তু সেইক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় তালিকাটি পুনঃ প্রকাশ করিতে হইত এবং আউট পোষ্ট অথবা পুলিশ স্টেশনে তাহার প্রতিলিপি জমা দিতে হইত।

নির্ধারিত কর সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি ঐ তালিকা প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সাদা কাগজে ঐ এলাকার ফৌজদারী কোর্টে আবেদন করিতে পারিতেন; তারপর ঐ কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল।

ফৌজদারী আহিলকার অথবা মহকুমা শাসক ক্ষমতা বলে নির্ধার তালিকা পুনঃ পরীক্ষা অথবা পরিবর্তন করিতে পারিতেন। ধার্য করের কিস্তি প্রতি মাসে সমভাবে দেয়; সেই জন্য করদাতার কর্তব্য ছিল, ধার্য কর মাসের প্রথম দিন ঐ মহল্লার চৌকিদারের কাছে জমা দেওয়া।

প্রতি কোয়ার্টারের (ত্রৈমাসিক) শেষে চৌকিদার কর খেলাপকারীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফৌজদারী আহিলকারের কাছে পাঠাইত। কোন কর খেলাপকারীর নাম ভুলক্রমে ঐ তালিকা হইতে বাদ পড়িলে তাহাকে আর বকেয়া কর দিতে বাধ্য করা যাইত না। তালিকাটি পাইবার পর ফৌজদারী আহিলকার খেলাপকারীকে দশ দিনের মধ্যে বকেয়া কর

চৌকিদারের নিকট জমা দিতে, অথবা কর না দিবার যথোপযুক্ত কারণ দর্শাইতে নোটিশ দিতেন। এই সময়ের পরে, কর জমা না পড়িলে বা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না পাওয়া গেলে, কর খেলাপকারীর সম্পত্তি (চাষের গরু, চাষের অথবা ব্যবসার যন্ত্রপাতি বাদে) ক্রোক করিয়া ধার্য কর আদায় করা হইত।

সদরের ক্ষেত্রে ফৌজদারী আহিলকার এবং মহকুমার ক্ষেত্রে মহকুমা শাসক চৌকিদার নিয়োগ করিতে পারিতেন। পঞ্চায়েত কাউকে অপসারণের জন্য, মনোনয়ন অথবা সুপারিশ করিতে পারিত, তাহাদের আবেদন পত্রটি পুলিশের মাধ্যমে ফৌজদারী আহিলকার কিংবা মহকুমা শাসকের নিকট যাইত। চৌকিদার সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ঐ এলাকার থানায় রাখা হইত। চৌকিদারের দায়িত্ব ছিল গ্রামের শান্তি রক্ষা করা, গ্রামে কোনরূপ দাঙ্গা, অপমৃত্যু অথবা নিন্দাজনক কিছু ঘটিলে নিকটস্থ পুলিশ থানায় খবর দেওয়া; গ্রাম্য পুলিশের দায়িত্ব পালন করিত ঐ চৌকিদার। থানায় তাহাকে হাজিরা দিতে হইত এবং পঞ্চায়েতের সঙ্গে সে যুক্ত থাকিত।

পরবর্তী কালে (১৯৪১ সালে) আমরা এই আইনের সংশোধনে দেখিতে পাই, একটি গ্রাম বা গ্রামসমূহের ইউনিয়নের জন্য একজন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা; ফৌজদারী আহিলকার গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত করিতেন। কোন গ্রামের জন্য এবং কি কি ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে সে বিষয়ে সে অবগত থাকিত।

পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করিবার জন্য প্রেসিডেন্টের সুচিন্তিত অভিমত প্রয়োজন হইত। প্রাথমিক বিদ্যালয়, খোঁয়াড় ও ফেরীঘাট পরিদর্শন, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা, সংক্রামক ব্যাধি এবং গবাদি পশুর সংক্রামক রোগ ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখাও প্রেসিডেণ্টের কাজ ছিল।

সদস্যদের কর্তব্য ছিল পঞ্চায়েতের কোন পদ শূন্য হইলে, সেই পদ পূরণের জন্য সদস্য মনোনীত করা, কোন গ্রামে কোন চৌকিদারের পদ শূন্য থাকিলে তাহা জানানো, গ্রামে অবৈধ কিছু ঘটিলে বা ঘটিবার আশঙ্কা থাকিলে চৌকিদারের মাধ্যমে তাহা জানানো, তাহারা ব্যর্থ হইলে নিজে কিংবা প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে সেই সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়া। গ্রামের শান্তি রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অবাঞ্ছিত লোকের অনুপ্রবেশ অথবা চোরাই মালের খবর তাহারা রাখিত। জন-স্বাস্থ্য, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, শিক্ষা, চিকিৎসা, পশু-চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কেও তাহারা সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করিত।

ইহা ছাড়াও মহারাজের নির্দেশানুসারে তাহাদের অন্য কোন কাজও করিতে হইত।

'কোচবিহার চৌকিদারী আইন' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী কোচবিহার স্বাধীন ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে রাজ্যগত প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থার নয়া প্রবর্তন ও পরিবর্তনের জন্য পর্যালোচিত আইন আর চালু রাখা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশনামা অনুসারে প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই গ্রামীণ স্বায়ত্ব-শাসনের জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সনে 'পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন' পাশ হয় এবং 'পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইন' পাশ হয় ১৯৬৩ সনে। এই ব্যবস্থায় পরবর্তী কালে আইন মোতাবেক চারটি স্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কোচবিহারে এই ব্যবস্থার পরিসংখ্যানগত রেখাচিত্রটি নিম্নরূপ—

গ্রামসভা—৫৮২টি

অঞ্চল পঞ্চায়েত—১০৫টি

আঞ্চলিক পরিষদ—১১টি

জিলা পরিষদ—১টি

১৯৫৯ সনে কোচবিহারে গ্রাম স্তর হইতে নির্বাচন আরম্ভ হয় এবং দিনহাটা মহকুমায় প্রথম নির্বাচন হয়। ১৯৬৪ সনে জিলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের মাধ্যমে প্রারম্ভিক কাজ শেষ হয়। এই সময়ে কোন দলভিত্তিক নির্বাচন না হইলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে কংগ্রেস সমর্থিত ব্যক্তিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করে।

এই আইনের কাঠামোর মধ্যে দীর্ঘ দিন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু থাকার পর ১৯৭৩ সনে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত আইন পাশ হয় এবং ১৯৭৮ সনের ৪ঠা জুন প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তিনটি স্তরেই প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচনে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের দলীয় প্রতীক লইয়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। প্রথম এই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে চালু করা হয়। নির্বাচনের পর পঞ্চায়েত স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থা পর্যালোচনার সুযোগ পাওয়া যায়। এই নির্বাচনের পর গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর হইতে জিলা পরিষদ স্তর পর্যন্ত ব্যাপক উন্নয়ন-মুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা দলভিত্তিক নির্বাচনের বিরোধীতা করে, যার ফলে প্রচুর নির্দল প্রার্থী নির্বাচিত হন। পূর্বে পঞ্চায়েতরাজ সংস্থা-

গুলি সীমিত সামর্থ্যের মাধ্যমে কাজ করিত। কিন্তু ১৯৭৮ সনের নির্বাচনের পর ন্যস্ত দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। আর্থিক অনুদান ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। গ্রাম স্তরে একটি স্বীকৃত সংস্থা হিসাবে গ্রামীণ নেতৃত্ব এবং সার্বিক উন্নয়নের বন্ধ দরজা খুলিয়া যায়।

১৯৭৮ সনে নির্বাচনের পর কোচবিহারের পঞ্চায়েত কাঠামো হইল—

গ্রাম পঞ্চায়েত—১২৮
পঞ্চায়েত সমিতি—১১
জিলা পরিষদ—১

তবে ১৯৮৩ সনের ৩১শে মে পাঁচ বৎসর পর দ্বিতীয় বার যে নির্বাচন হয় তাহার ফলাফল দেখিয়া মনে হয় রাজনৈতিক দলগুলির দিকেই ভোটারগণ সমর্থন জানাইয়াছে।

এই সময়ে কোচবিহারের পঞ্চায়েত কাঠামো হইল—

গ্রাম পঞ্চায়েত—১২৮
পঞ্চায়েত সমিতি—১২
জিলা পরিষদ—১

এখন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত কোচবিহারে পর পর দুইটি নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আসন দখলের চিত্রটি তুলিয়া ধরা হইল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৮ সনের নির্বাচনের পর জিলা পরিষদের সভাধিপতি ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক দলের, আর ১৯৮৩ সনের নির্বাচনের পর সভাধিপতি নির্বাচিত হন সি, পি, আই (এম) দলের। ১৯৭৮ সনের নির্বাচনের পর ১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের মধ্যে সি, পি, আই (এম) পায়—৬৮, ফরোয়ার্ড ব্লক—৫০, কংগ্রেস—১০টি। পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে ১১টির মধ্যে সি, পি, আই (এম)—৫, ফরোয়ার্ড ব্লক—৬, কংগ্রেস—০।

১৯৮৩ সনের দ্বিতীয় নির্বাচনের পর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্তরে দলগত অবস্থা হইল সি, পি, আই (এম)—৬৫, ফরোয়ার্ড ব্লক—৩১, কংগ্রেস—৩২।

১২টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে সভাপতিদের দলগত অবস্থা হইল সি,পি, আই (এম)—৭, ফরোয়ার্ড ব্লক—৪, কংগ্রেস—১।

১৯৭৮ সনের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের দলগত অবস্থা

ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতির নাম	মোট আসন সংখ্যা	সি. পি. আই (এম)	ফঃ বঃ	কংগ্রেস (আই)	আর. এস.পি.	সি. পি. আই	কংগ্রেস (আর)	নির্দল ও অন্যান্য	মোট গ্রাম পঞ্চায়েত	দলগত অবস্থা
কোচবিহার ১ নং	২১৯	৮০	৭৮	২৭	১	—	—	৩৩	১৫	ফঃ বঃ—৮, কং—১ সি পি. আই (এম)—৬
কোচবিহার ২ নং	২১৯	১০০	৭৬	১২	—	—	—	৩১	১৩	সি. পি. আই (এম)—১১ ফঃ বঃ—২
দিনহাটা ১ নং	২০২	৪২	৮৮	৫০	—	৪	১	১৭	১৬	ফঃ বঃ—৮, কং—৫ সি. পি. আই (এম)—৩
দিনহাটা ২ নং	১৬৬	৩৩	৮৬	২৮	—	—	৭	১২	১২	ফঃ বঃ—৯, কং—১ সি. পি. আই (এম)—২
সীতাই	৬৬	৯	৩৭	১৬	—	—	১	৩	৫	ফঃ বঃ—৪ সি. পি. আই (এম)—১
মাথাভাঙ্গা ১ নং	১৪১	৯৬	১০	২৫	—	৩	৩	৪	১০	সি. পি. আই (এম)—৯ ফঃ বঃ—১
মাথাভাঙ্গা ২ নং	১৩০	৬৭	১৯	২২	—	—	৪	১৮	১০	সি. পি. আই (এম)—৬ কং—২, ফঃ বঃ—২
শীতলখুচী	১২৪	৮৫	১৯	১৭	—	—	১	২	৮	সি. পি. আই (এম)—৬ ফঃ বঃ—২
মেখলীগঞ্জ	১০৯	১১	৬৮	২৮	—	—	—	২	৮	ফঃ বঃ—৭, কং—১
হলদীবাড়ী	৭৬	২	৩১	৩	—	—	—	৪০	৬	ফঃ বঃ—৬
তুফানগঞ্জ	২৯৪	২৫৩	১৯	১৯	—	—	—	৩	২৫	সি. পি. আই (এম)—২৪ ফঃ বঃ—১
মোট	১৭৪৬	৭৭৮	৫৩১	২৪৭	১	৭	১৭	১৬৫	১২৮	

১৯৭৮ সনের পঞ্চায়েত সমিতির ফলাফল

ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতির নাম	মোট আসন সংখ্যা	সি. পি. আই (এম)	ফঃ বঃ	কংগ্রেস (ই)	কংগ্রেস (আর)	সি. পি. আই	নির্দল ও অন্যান্য	পঃ সমিতি কোন দলের হাতে	জিলা পরিষদ: মোট আসন সংখ্যা	জিলা পরিষদ: সি. পি. আই (এম)	জিলা পরিষদ: ফঃ বঃ
কোচবিহার ১ নং	৪১	১৬	১৬	৪	—	—	৫	ফঃ বঃ	২	১	১
কোচবিহার ২ নং	৩৮	১৮	১৪	২	—	—	৪	সি পি. আই (এম)	২	১	১
দিনহাটা ১ নং	৩৮	৭	১৮	১০	—	—	৩	ফঃ বঃ	২	১	১
দিনহাটা ২ নং	৩০	৪	১৫	৭	—	—	৪	ফঃ বঃ	২	—	২
সীতাই	১৩	১	১০	২	—	—	—	ফঃ বঃ	২	—	২
মাথাভাঙ্গা ১ নং	২৬	১৮	৫	১	—	১	১	সি. পি. আই (এম)	২	২	—
মাথাভাঙ্গা ২ নং	২৭	১৫	৩	৬	২	—	১	সি. পি. আই (এম)	২	২	—
শীতলখুচী	২৪	১৯	৩	২	—	—	—	সি. পি. আই (এম)	২	১	১
মেখলীগঞ্জ	২০	২	১৬	২	—	—	—	ফঃ বঃ	২	—	২
হলদীবাড়ী	১৫	২	৬	—	—	—	৭	ফঃ বঃ	২	—	২
তুফানগঞ্জ	৫৯	৫৫	১	২	—	—	১	সি. পি. আই (এম)	২	২	—
মোট	৩৩১	১৫৭	১০৭	৩৮	২	১	২৬	—	২২	১০	১২

১৯৮৩ সনে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলগত অবস্থা

ব্লকের/পঞ্চায়েত সমিতির নাম	মোট অ সংখ্যা	সি.পি.আই (এম)	ফঃ বঃ	কংগ্রেস	আর.এস পি	সি. পি. আই	অন্যান্য	মোট পঞ্চায়েত	দলগত অবস্থা
কোচবিহার ১নং	২১৫	৯১	২৪	৯৪	—	১	৫	১৫	ফঃ বঃ—১, কং—৫ সি. পি. আই (এম)—৯
কোচবিহার ২নং	২১৬	১০৩	২৩	৮৫	১	১	৩	১৩	সি. পি. আই (এম)—৮ ফঃ বঃ—১, কং—৪
দিনহাটা ১নং	২০০	১২	৬৮	১১৮	—	—	২	১৬	ফঃ বঃ—৭, কং—৯
দিনহাটা ২নং	১৬১	১৪	৭৭	৭০	—	—	—	১২	ফঃ বঃ—৭, কং—৫
সীতাই	৬৭	৪	৪৩	২০	—	—	—	৫	ফঃ বঃ—৫
মাথাভাঙ্গা ১নং	১৪১	৮১	১১	৪৭	—	—	২	১০	সি.পি.আই (এম)—৮ ফঃ বঃ—১, কং—১
।থাং ঙ্গা ২নং	১৪৭	৭৪	১৩	৫৬	২	—	২	১০	সি. পি. আই (এম)—৭ ফঃ বঃ—১ কং—২
শীতলখুচী	১২৮	৯৮	১৯	১১	—	—	—	৮	সি. পি. আই (এম)—৭ ফঃ বঃ—১
মেখলীগঞ্জ	১০৩	১৯	২৯	৫৩	—	—	২	৮	সি. পি. আই (এম)—২ ফঃ বঃ—২, কং—৪
হলদীবাড়ী	৭০	৮	২৬	৩০	—	—	৬	৬	ফঃ বঃ—৪, কং—২
তুফানগঞ্জ ১নং	১৬৭	১৩০	—	৩৭	—	—	—	১৪	সি. পি. আই (এম)—১৪
তুফানগঞ্জ ২নং	১২৯	১০০	১২	১৭	—	—	—	১১	সি. পি. এম—১০ ফঃ বঃ—১
মোট	।৪৪	৭৩৪	৩৪৫	৬৩৮	৩		২৪	২৮	

১৯৮৩ সনে পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ নির্বাচনে দলগত অবস্থা

ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতির নাম	পঞ্চায়েত সমিতি				জিলা পরিষদ				
	মোট আসন সংখ্যা	সি. পি আই (এম)	ফঃ বঃ	কংগ্রেস	দলগত অবস্থা	আসন সংখ্যা	সি. পি. আই (এম)	ফঃ বঃ	কংগ্রেস
কোচবিহার ১ নং	৪২	২০	৩	১৯	সি. পি. আই (এম)	২	২	—	—
কোচবিহার ২ নং	৩৯	২৫	১	১৩	সি পি. আই (এম)	২	১	—	১
দিনহাটা ১ নং	৩৮	১	১১	২৬	কংগ্রেস	২	—	—	২
দিনহাটা ২ নং	৩০	১	১৬	১৩	ফঃ বঃ	২	—	২	—
সীতাই	১৩	—	১১	২	ফঃ বঃ	২	—	২	—
মাথাভাঙ্গা ১ নং	২৭	১৯	১	৭	সি. পি. আই (এম)	২	২	—	—
মাথাভাঙ্গা ২ নং	২৭	১৪	১	১২	সি. পি. আই (এম)	২	১	—	১
শীতলখুচী	২৪	১৯	৪	১	সি. পি. আই (এম)	২	২	—	—
মেখলীগঞ্জ	২০	২	৮	১০	ফঃ বঃ	২	—	২	—
হলদীবাড়ী	১৪	—	৬	৮	ফঃ বঃ	২	—	১	১
তুফানগঞ্জ ১ নং	৩৩	৩০	—	৩	সি. পি. আই (এম)	২	২	—	—
তুফানগঞ্জ ২ নং	২৭	২৪	১	২	সি. পি. আই (এম)	২	২	—	—
মোট	৩৩৪	১৫৫	৬৩	১১৬		২৪	১২	৭	৫

কোচবিহারের নির্বাচনী চালচিত্র

কোচবিহারের লোক সভা, রাজ্য সভা, বিধান সভা, বিধান পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি তালিকা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীসহ বিভিন্ন প্রার্থীর তালিকা তুলিয়া ধরা হইল। এই তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া একাধিক পত্র-পত্রিকার সাহায্য লইয়াছি। জেলা নির্বাচনী দপ্তর ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বারস্থ হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই গড়মিল দেখিয়া বাধার সম্মুখীন হইয়াছি। আমার সংকলিত তথ্যগুলি নির্ভুল করিবার চেষ্টা করিলাম। তথ্যের অপ্রতুলতায় পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলিয়া ধরা সম্ভব হইল না। অনেক ক্ষেত্রেই শতকরা হার নিরূপণ করিতে পারিলাম না। আমি প্রার্থী, দল, ভোটের ফলাফল, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা তুলিয়া ধরিলাম, তাহার সঙ্গে নির্বাচিত প্রতিনিধির ভোটের ব্যবধান ও শতকরা হার কোথাও কোথাও দিয়াছি।

এই অধ্যায়টির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার জন্য পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হইবে।

কোচবিহারের বিধান সভা নির্বাচন

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তাহার পর কোচবিহার রাজ্যের ভারত ভুক্তি এবং পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা-রূপে স্বীকৃতি লাভের ফলে কোচবিহারের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় দীর্ঘ দিনের রাজ শাসনের সমাপ্তি ঘটে এবং ভারতীয় সংবিধানের নিয়মতন্ত্র অনুসারে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সহিত কোচবিহারে ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৭ সনে মোট দশবার বিধান সভার নির্বাচন হইয়াছে। প্রথম নির্বাচনের পূর্বে কোচবিহার জেলা হইতে ১৯৫০ সনের ২৪শে জানুয়ারী রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত সদস্য ছিলেন সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার ও উমেশচন্দ্র মণ্ডল। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আট বার সাধারণ নির্বাচন এবং দুইবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মধ্যবর্তী নির্বাচন (১৯৬৯, ১৯৭১) অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সন পর্যন্ত বিধান সভা এবং লোক সভার নির্বাচন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। তাহার পর বিধান সভার কয়েকটি মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলে আর একসঙ্গে করা সম্ভব না হইলেও ১৯৭১ সনে আবার একই দিনে নির্বাচন হয়।

বিধান সভা নির্বাচন—১৯৫২

আসন সংখ্যা—৬

১৯৫২ সনের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কোচবিহার জেলার আসন সংখ্যা ছিল ৬টি, তাহার মধ্যে ৩টি সাধারণ ও ৩টি তপসীল। কোচবিহার, তুফানগঞ্জ কেন্দ্রটি দুই আসন যুক্ত এবং দিনহাটা কেন্দ্রটিও দুই আসন যুক্ত ছিল। তাহার মধ্যে আবার একটি করিয়া সংরক্ষিত তপসীল আসন ছিল। মেখলীগঞ্জ আসনটি ছিল সাধারণ এবং মাথাভাঙ্গা আসনটি ছিল তপসীল। ১৯৫২ সনের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কোচবিহার জেলার ৬টি আসনই কংগ্রেস জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে বামপন্থীরা তেমন সংগঠিত ছিল না। অথচ কোচবিহার-বাসী আজ ৩৭ বৎসর যাবৎ পঞ্চ শহীদের স্মরণ করিয়া থাকে। সেই সময় খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন হয় নির্বাচনের মাত্র আট মাস পূর্বে ১৯৫১ সনের ২১শে এপ্রিল। প্রথম নির্বাচনে ১৭টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া নির্দল প্রার্থীরাও ছিলেন। ২রা জানুয়ারী হইতে ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়।

মেখলীগঞ্জ কেন্দ্র, আসন সংখ্যা—১

মোট ভোটার—৪১২০৯

ডাঃ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—কংগ্রেস (নির্বাচিত)—		৭৭৪৮
ব্যবধান—৫৭৩ ভোট		
মুকুন্দমোহন সরকার—নির্দল	—	৭১৭৫
অমলকুমার সেন—নির্দল	—	২০৩৬

মাথাভাঙ্গা কেন্দ্র, আসন সংখ্যা—১

মোট ভোটার—৪২৪৪২

সারদাপ্রসাদ প্রামাণিক—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	১৫৮৭১
ব্যবধান—১৩২৩৮ ভোট		
গজেন্দ্রনারায়ণ বসুনীয়া—নির্দল	—	২৬৩৩
ক্ষিতিশচন্দ্র নাগ—নির্দল	—	১৭২২
প্রফুল্ল রায়—নির্দল	—	১৩৮৩

দিনহাটা কেন্দ্র, আসন সংখ্যা—২

মোট ভোটার—৮৭১৯৪৮

সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার—কংগ্রেস (সাঃ) (নির্বাচিত)	— ২৪৩৮৮
উমেশচন্দ্র মণ্ডল—কংগ্রেস (তপঃ) (নির্বাচিত)	— ২৩৭৮৬
অমূল্যচরণ পাল—কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি	— ২৭৫৫
তরণীকান্ত বর্মন—সি, পি, আই (তপঃ)	— ৫৪৯৮
হরিশচন্দ্র রায় সরকার—নির্দল (তপঃ)	— ৯৪৮৯
প্রবোধচন্দ্র পাল—ফঃ ব্লক (মাঃ)	— ৬২৩৬

কোচবিহার-তুফানগঞ্জ কেন্দ্র, আসন সংখ্যা—২

মোট ভোটার—৮৫৯২৮

মজির উদ্দিন আমেদ—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	— ১৭৫৯৫
যতীন্দ্রনাথ সিংহ সরকার—কংগ্রেস (তপঃ) (নির্বাচিত)	— ১৬২৫১
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি	— ২০২১
নরেশচন্দ্র বসু—ফরোয়ার্ড ব্লক (মাঃ)	— ৮২৯৯
বৈজনাথ বিশ্বকর্মা—সোসালিস্ট	— ২০০৭
ব্রজেন্দ্রনাথ রায়—সোসালিস্ট (তপঃ)	— ১৭৯৩
দীনেশচন্দ্র সিংহ—সি, পি, আই (তপঃ)	— ৬৯৪৫
জলধর সাহা—নির্দল	— ১৮৫৭
গিরিজাকান্ত চক্রবর্তী—নির্দল	— ১২৭৫
দেবেন্দ্রানন্দ চক্রবর্তী—নির্দল	— ২৭৮৮
দেবেন্দ্রনাথ ঈশোর—নির্দল	— ৯৮৮
গোবিন্দচন্দ্র রায়—নির্দল	— ১৫৫০

এই নির্বাচনের পর কোচবিহার জেলা হইতে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভায় সতীশ চন্দ্র রায় সিংহ সরকার পরিবহন দপ্তরের উপমন্ত্রী হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব পান।

বিধান সভা নির্বাচন—১৯৫৭

আসন সংখ্যা—৭

১৯৫৭ সনের নির্বাচনে কোচবিহার জেলার বিধান সভার একটি আসন বৃদ্ধি পাইয়া সাতটিতে দাঁড়ায়। এই সাতটি আসনেই কংগ্রেস প্রার্থীগণ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। ১৯৫২ সনে যে ছয় জন কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন

এবং জয়ী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই এই দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে মনোনয়ন পান। ইহা ছাড়াও তৎকালীন জেলা কংগ্রেস সভাপতি ভবানীপ্রসন্ন তালুকদার প্রার্থী হন। এই সময়ে নির্বাচনী এলাকাগুলি নূতন করিয়া বিন্যাস এবং নামকরণ করা হয়। ১০ই মার্চ হইতে ১২ই মার্চ-এর মধ্যে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোট হয়। এই নির্বাচনের পরেও সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার পরিবহণ দপ্তরের উপমন্ত্রী হন। এই নির্বাচনের সময় কম্যুনিস্ট পার্টি, প্রজা সোস্যালিষ্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল এবং মার্কসিষ্ট ফঃ বঃ এই পাঁচটি দল লইয়া সম্মিলিত বামপন্থী নির্বাচনী মোর্চা গঠিত হয়। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এই সময়ে নির্দল প্রার্থীদের স্বতন্ত্র প্রার্থী বলা হইত। নির্বাচনে ৪০ শতাংশ ভোট পড়ে বলিয়া মনে করা হয়।

কোচবিহার কেন্দ্র, আসন সংখ্যা—২

মোট ভোটার—১০৭০০০

সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার—কংগ্রেস (সং) (নির্বাচিত)	— ২১৯১৪
মজির উদ্দিন আমেদ—কংগ্রেস (সাঃ) (নির্বাচিত)	— ২০৮৭
দীনেশচন্দ্র কার্যী—সি. পি. আই	— ১৮৭৮৩
নরেশচন্দ্র বসু—ফঃ বঃ	— ১৭২০৩
সোনামণি দেবী—নির্দল	— ৮৩১৬
সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী—নির্দল	— ৩৮৬৩

দিনহাটা কেন্দ্র, আসন সংখ্যা—২

মোট ভোটার—১৩১১৭০

ভবানীপ্রসন্ন তালুকদার—কংগ্রেস (সাঃ) (নির্বাচিত)	— ৩২৭০২
উমেশচন্দ্র মণ্ডল—কংগ্রেস (নির্বাচিত) (সং)	— ৪১৪৫৫
কমলকান্তি গুহ—ফঃ বঃ	— ২৪২২৬
বিজয়কুমার রায়—ফঃ বঃ	— ২১৬২৪
হরিশচন্দ্র রায় সরকার—নির্দল	— ৭১৪৮
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—নির্দল	— ৫৬২১

মাথাভাঙ্গা কেন্দ্র, আসন—১ (সংরক্ষিত)

মোট ভোটার—৬২৭৭৭

সারদাপ্রসাদ প্রামাণিক—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	— ১৪৬৬৮
মহেন্দ্রনাথ ডাকুয়া—নির্দল (বামপন্থী সমর্থিত)	— ১২১৯৬

মেখলীগঞ্জ কেন্দ্র, আসন সংখ্যা—১

মোট ভোটার—৪৪২৬২

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	৯৪৯৩
অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান—ক: ব:	—	৭০০৩
মুকুন্দমোহন সিংহ সরকার—নির্দল	—	৩৩৪৪
মনোরঞ্জন গুহ রায়—নির্দল	—	১১০৬
দেবব্রত সিংহ—হিন্দু মহাসভা	—	৮৩১

তুফানগঞ্জ কেন্দ্র, আসন সংখ্যা—১

মোট ভোটার—৬০৮১৩

যতীন্দ্রনাথ সিংহ সরকার—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	২১৯১৫
জীবনকৃষ্ণ দে—সি. পি. আই	—	৯২৫৩
হেমন্তকুমার বর্মন—নির্দল	—	২৮৭২

বিধান সভা নির্বাচন ১৯৬২

আসন সংখ্যা—৭

এই সাধারণ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য হইল, এই সর্বপ্রথম কোচবিহার হইতে বামপন্থী প্রার্থী কংগ্রেসের হাত হইতে আসন ছিনাইয়া লইবার সুযোগ পায়। কংগ্রেসের ব্যাপক পরাজয় ঘটে। এই নির্বাচনের ফলাফল হইল—কংগ্রেস—১, ফরোয়ার্ডব্লক—৫ এবং ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি—১। ১৯. ২. ১৯৬২ হইতে ২৫. ২. ১৯৬২ তারিখ পর্যন্ত কোচবিহারের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়।

এই নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে যখন কংগ্রেসের জয়-জয়কার তখন কোচবিহার জেলার সাতটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র একটি আসন পায়। বাকী আসনগুলি বামপন্থীদের দখলে যাইবার একমাত্র কারণ এই যে, নির্বাচনের দুই মাস পূর্বে ১৯৬১ সনে রাসমেলা উপলক্ষে একটি সার্কাস পার্টির তাঁবুতে অগ্নি সংযোগে ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র-পুলিশের সংঘর্ষ এবং পরে কোচবিহার সহরে সপ্তাহব্যাপী পুলিশের ব্যাপক তাণ্ডবলীলা চলে। পুলিশের অত্যাচারকে মূলধন করিয়া বামপন্থীরা নির্বাচনী প্রচারে নামেন এবং সফলকাম হন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং কোচবিহার হইতে মহেন্দ্রনাথ ডাকুয়া শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী হন।

মেখলীগঞ্জ কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮১৪০০

অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ১৭৫৯২

ব্যবধান—৬৯৬২ ভোট

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—কংগ্রেস — ১০৬৩০

মাথাভাঙ্গা কেন্দ্র

মোট ভোটার—৬৪৪৯৮

মহেন্দ্রনাথ ডাকুয়া—কংগ্রেস (নির্বাচিত) — ১৮৭৭০

ব্যবধান—৩২৮৮ ভোট

দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া—সি. পি. আই — ১৫৪৮১

শীতলখুচী কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭০৬৮২

বিজয়কুমার রায়—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ১৫৫৯৬

ব্যবধান—৩৮৪৪ ভোট

হেমলতা দেবী—কংগ্রেস — ১১৭৫২

বীজেন্দ্রনারায়ণ বর্মন—নির্দল — ৬২২১

দিনহাটা কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭১১০৬

কমলকান্তি গুহ—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) ২৬৮৭০

ব্যবধান—১০৪২২ ভোট

উমেশ চন্দ্র মণ্ডল—কংগ্রেস ১৬৩৮৫

মহেশচন্দ্র সিংহ—নির্দল ৯২১

কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র

মোট ভোটার—৬৪৫৪৬

সুনীল বসুনীয়া—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) ১৬১০১

ব্যবধান—৬৫৫২ ভোট

সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার—কংগ্রেস ৯৫৪৯

পতিরাম দেব সিংহ—স্বতন্ত্র ১৮৭৬

কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭০৯০১

সুনীল দাশগুপ্ত—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	১৯২৯৬
ব্যবধান—৭৯৩০ ভোট		
মজির উদ্দিন আমেদ—কংগ্রেস	—	১১৩৬৬

তুফানগঞ্জ কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮৫৩১১

জীবনকৃষ্ণ দে—সি, পি, আই, (নির্বাচিত)	—	২৬২২২
ব্যবধান—৫৪৭৬ ভোট		
যতীন্দ্রনাথ সিংহ সরকার—কংগ্রেস	—	২০৭৪৬
শ্যামাকান্ত দাস—নির্দল	—	২২৪৩
বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—নির্দল	—	৯০১

বাতিল ভোট—১৪১৮

বিধান সভা নির্বাচন—১৯৬৭

আসন সংখ্যা—৮

১৯৬৭ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই সাধারণ নির্বাচনের সময়ে কোচবিহর জেলার বিধান সভা কেন্দ্রের একটি আসন বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনের পর দেখা যায় কংগ্রেস দল কিছু আসন পুনরায় উদ্ধার করে কিন্তু মাথাভাঙ্গার আসনটি হারায়। নির্বাচনের ফলাফল—কংগ্রেস—৫, সি. পি. আই (এম)—১, ফরোয়ার্ড ব্লক—২। ভারতে চীনের আক্রমণের পর কম্যুনিস্ট পার্টি দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায় এবং নির্বাচনে তাহার প্রতিফলন আমরা দেখিতে পাই। স্বতন্ত্র পার্টি নামে আরও একটি নূতন রাজনৈতিক দল এই সময়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। কোচবিহারের রাজকুমারী জয়পুরের রাণী গায়ত্রী দেবী এই দলের পক্ষে কাজ করেন, কিন্তু কোচবিহারে কোন আশাপ্রদ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। এই নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয় এবং কংগ্রেস বিরোধী দলের আসনে বসে। যদিও এই সরকার অন্তর্কলহে লিপ্ত হওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এইবারের মন্ত্রীসভায় কোচবিহার হইতে মন্ত্রীপদে কেহই মনোনীত হন নাই, তবে সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক হিসাবে কমলকান্তি গুহ নির্বাচিত হন।

মেখলীগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭১৩৭৪

অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ৩১৪০২

ব্যবধান—১৪৬৪৯ ভোট

মধুসূদন রায়—কংগ্রেস — ১৬৭৫৩

তারাপ্রসন্ন রায় বসুনীয়া—স্বতন্ত্র পার্টি — ৯০৫

মাথাভাঙ্গা (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৪৮৪০

দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া—সি, পি, আই (এম) (নির্বাচিত) — ২৬৮৭২

ব্যবধান—১১৯২৯ ভোট

মহেন্দ্রনাথ ডাকুয়া—কংগ্রেস — ১৪৯৪৩

সীতাই কেন্দ্র

মোট ভোটার—৬৪৪৯৮

ডাঃ মহঃ ফজলে হক—কংগ্রেস (নির্বাচিত) — ২০৪৮৫

ব্যবধান—১৩১৫ ভোট

বিজয়কুমার রায়—ফঃ বঃ — ১৯১৭০

ডাঃ মহঃ আবদুর আউয়াল—স্বতন্ত্র পার্টি — ২১৬১

দিনহাটা কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৭৩২৭

কমলকান্তি গুহ—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ২৯৩৭১

ব্যবধান—৬১৬৫ ভোট

উমেশচন্দ্র মণ্ডল—কংগ্রেস — ২৩২০৬

কমলকৃষ্ণ রায় সিংহ—স্বতন্ত্র পার্টি — ৮১৮

কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭০৮৬২

মতিরঞ্জন তর—কংগ্রেস (নির্বাচিত) — ১৭৪৪০

ব্যবধান—২১৪৭ ভোট

সুনীল দাশগুপ্ত—ফঃ বঃ — ১৫২৯৩

গোপালচন্দ্র সাহা—সি, পি, আই (এম) — ৮৯৪০

নির্মলচন্দ্র ঘোষ—স্বতন্ত্র পার্টি — ৪৫৫৪

কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮৭৫৮৩

সন্তোষকুমার রায়—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	১৯৪৭৯
ব্যবধান—৪৭০৭ ভোট		
দুর্গেশ নিয়োগী—ফঃ বঃ	—	১৪৭৭২
কুমার প্রমোদেন্দ্রনারায়ণ—স্বতন্ত্র পার্টি	—	৩৯৭৭
শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—সি, পি, আই (এম)	—	৫৯০৩
মিয়া মহম্মদ হোসেন—নির্দল	—	৭৮৯
জীবনকৃষ্ণ দে—নির্দল	—	৬৭৭

কোচবিহার পশ্চিম (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮০৭৮৮

প্রসেনজিৎ বর্মন—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	১৮৪০৯
ব্যবধান—৩০৪২ ভোট		
জিতেন্দ্রনাথ রায়—ফঃ বঃ	—	১৫৩৬৭
মুরারীমোহন পাটোয়ারী—স্বতন্ত্র পার্টি	—	৯৫৪৬

তুফানগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭২১২৫

শঙ্কর সেন ঈশোর—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	২৭২৮৩
ব্যবধান—১৫৪৮৮		
দীনেশচন্দ্র কার্যী—সি, পি, আই (এম)	—	১১৭৯৫
মন্দেশ্বর বর্মন—সি, পি, আই	—	২৬৯০
ধর্মনারায়ণ বর্মা—স্বতন্ত্র পার্টি	—	৭২০২

বিধান সভা নির্বাচন—১৯৬৯

আসন সংখ্যা—৮

১৯৬৭ সনে নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা দখল করে এবং এই চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের প্রথম বিরোধীদলের আসনে বসিতে হয়। জনগণের রায়কে তাঁহাদের মাথা

পাতিয়া লইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার বেশীদিন সুখে রাজত্ব করিতে পারে নাই। তিনি সেই সময়ে বাংলা কংগ্রেস দল গঠন করিয়াছিলেন। দলীয় মতবিরোধের ফলেই সবকারের পতন ঘটে। তাহার পর অনেক বিতর্কীত ঘটনার পর বিধান সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং ১৯৬৯ সনে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যে এই নির্বাচন হয়। ১৯৬৯ সনের নির্বাচনে কোচবিহার জেলার ৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস—৬টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক—২টি আসন পায়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে 'লোকদল' গঠিত হয়। কিন্তু নির্বাচনে একটি আসনও লাভ করিতে পারে নাই।

মেখলীগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭২৪০৮

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৬৯.৬৬

অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	২৫৬৭৮=৫০.৯১
ব্যবধান—২৮৫৫		
মধুসূদন রায়—কংগ্রেস	—	২২৮২৩=৪৫.২৫
শিবেন্দ্রনাথ রায়—আমরা বাঙ্গালী	—	৫৩২=১.০৫
বাতিল ভোট	—	১৪০৭=২.৭৯
প্রদত্ত ভোট	—	৫০৪৪০

মাথাভাঙ্গা (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৫০০৭

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৬৪.২২

বীরেন্দ্রনাথ রায়—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	২৩৮৪৫=৪৯.৫০
ব্যবধান—১৩৬৭		
দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া—সি. পি. আই (এম)	—	২২৪৭৮=৪৬.৬৭
বাতিল ভোট	—	১৮৪৪=৩.৮৩
প্রদত্ত ভোট	—	৪৮১৬৭

কোচবিহার পশ্চিম কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮৩২৮১

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৫৮.৭৬

প্রসেনজিৎ বর্মন—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	২৪৯১৫=৫০.৯১
ব্যবধান—৪৫০০ ভোট		
যতীন্দ্রনাথ রায়—ফঃ বঃ	—	২০৪১৫=৪১.৭১
কুমার নিধিনারায়ণ—লোকদল	—	১২৬০= ২.৫৭
ধনপতি রায়—জনসংঘ	—	৬৭৫= ১.৩৮
বাতিল ভোট	—	১৬৭৪= ৩.৪৩
প্রদত্ত ভোট	—	৪৮৯৩৯

সীতাই কেন্দ্র

মোট ভোটার—৬৫৬৪৪

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৭০.৬৫

ডাঃ মহঃ ফজলে হক—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	২৬৯৮২=৫৮.১৮
ব্যবধান—৯১২০ ভোট		
বিজয়কুমার রায়—ফঃ বঃ	—	১৭৮৬২=৩৮.৫১
বাতিল ভোট	—	১৫৩৩= ৩.৩১
প্রদত্ত ভোট	—	৪৬৩৭৭

দিনহাটা কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৯৪৯০

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৭১.৮১

অণিমেশ মুখার্জী—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	২৯৭৬৪=৫২.১৪
ব্যবধান—৫২৪৮ ভোট		
কমলকান্তি গুহ—ফঃ বঃ	—	২৪৫১৬=৪২.৯৫
চারুচন্দ্র মণ্ডল—আমরা বাঙ্গালী	—	৮৮২= ১.৫৫
হরেন্দ্রকুমার রায়—নির্দল	—	৪৯২= ০.৮৬
বাতিল ভোট	—	১৪৩০= ২.৫০
প্রদত্ত ভোট	—	৫৭০৮৪

কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র

মোট ভোটার—৬৮৪০৯

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৭২·১৪

সন্তোষকুমার রায়—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	২৬০২৯=৫২ ৭৫
ব্যবধান—৪৩০৬ ভোট		
দীপক সেনগুপ্ত—ফঃ বঃ	—	২১৭২৩=৪৪·০২
মৌলভী ইসমাইল উদ্দিন—লোকদল	—	৪৭৯= ০·৯৭
বাতিল ভোট	—	১১১৬= ২·২৬
প্রদত্ত ভোট	—	৪৯৩৪৭

কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭১৫০৮

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৬৬·৪৩

বিমলকান্তি বসু—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	২৩৮১০=৫০·১৩
ব্যবধান—২২৯৬ ভোট		
মতিরঞ্জন তহ—কংগ্রেস	—	২১৫১৪=৪৫·২৯
শিবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য—লোকদল	—	৫৯৯= ১·২৬
সন্তোষকুমার সরকার—আমরা বাঙ্গালী	—	৫৭= ০ ১২
হরিপদ পাল—জনসংঘ	—	২০৮= ০·৪৪
বাতিল ভোট	—	১৩১১= ২·৭৬
প্রদত্ত ভোট	—	৪৭৫০১

তুফানগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৩১২৩

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৭১·৫৭

অক্ষয়কুমার বর্মা—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	৩০৮০৮=৫৮·৮৭
ব্যবধান—১০৪৬৭ ভোট		
মণীন্দ্রনাথ বর্মা—সি. পি. আই (এম)	—	২০৩৪১=৩৮ ৮৭
বাতিল ভোট	—	১১৮৭= ২·২৬
প্রদত্ত ভোট	—	৫২৩৩৬

বিধান সভা নির্বাচন—১৯৭১

আসন সংখ্যা—৮

১৯৬৯ সনে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করে, কিন্তু এই সময়েও ক্ষমতাশীল দলের মধ্যে আবার অন্তঃ বিরোধ আরম্ভ হয়। ১৯৬৯ সনের আগস্ট মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া ১৯৭০ সনে কংগ্রেস দল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। একটি গোষ্ঠীর নাম হয় আদি কংগ্রেস বা সংগঠন কংগ্রেস, অপরটি শাসক কংগ্রেস বা নব কংগ্রেস। এই নির্বাচনে কংগ্রেস দলের যেমন একাধিক প্রার্থী দেখা যায়, তেমনি বিরোধী দলগুলিও সম্মিলিত ভাবে প্রার্থী দিতে সমর্থ হয় নাই। সেই জন্য এই সময়ে প্রার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে কোচবিহারে এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলে শাসক কংগ্রেস দল—৭টি আসন লাভ করে এবং ফরোয়ার্ড ব্লক—১টি আসন পায়। এই সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গে একাধিক বার রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হয়। ১৯৭১ সনের ১০ই মার্চ নির্বাচনে আবার একই সঙ্গে লোক সভা ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস ও অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত বাংলা কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। কিন্তু তিন মাস পরেই তিনি পদত্যাগ করেন। আবার রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হয়। এই মন্ত্রীসভায় সন্তোষকুমার রায় পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন।

মেখলীগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৫৩৭৫

মিহিরকুমার রায়—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	১৯৮৮০
ব্যবধান—৩৮৯৮		
মণিভূষণ রায়—কংগ্রেস-শা	—	১৫৯৮২
ক্ষীরপ্রসাদ বর্মন—সি, পি, আই (এম)	—	৩৯৯৬
তারাপ্রসন্ন রায় বসুনীয়া—কংগ্রেস-সং	—	৩৭৪৫
সুধাংশুকুমার রায় সরকার—নির্দল	—	১৬২৭

মাথাভাঙ্গা (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৭৭৬৫

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৬৩.৯৩

বীরেন্দ্রনাথ রায়—কংগ্রেস-শা (নির্বাচিত)	—	২১৩০২=৪২.৮৫
ব্যবধান—২৯১৬ ভোট		
দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া—সি. পি. আই (এম)	—	১৮৩৮৬=৩৬.৯৮
মুকুন্দনাথ বর্মন—ফঃ বঃ	—	২৫৪৯= ৫.১২
কুমার নিধিনারায়ণ—কংগ্রেস-সং	—	২১৯৮= ৪.৪২
অবিনাশ সিংহ—বাংলা কংগ্রেস	—	১৪১০= ২.৮৪
অশোককুমার রায় বসুনীয়া—নির্দল	—	১৪৪৩= ২.৯০
বাতিল ভোট	—	২৪২৮= ৪.৪৯
প্রদত্ত ভোট	—	৪৯৭১৬

কোচবিহার পশ্চিম কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮৯৪৯১

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার — ৫৮.২৬

রজনীকান্ত দাস—কংগ্রেস-শা (নির্বাচিত)	—	২২৫৬৫=৪৩.২৮
ব্যবধান—৮৮১৬ ভোট		
সুধীর প্রামাণিক—সি. পি. আই (এম)	—	১৩৭৪৯=২৬.৩৭
মুরারীমোহন পাটোয়ারী—কংগ্রেস-সং	—	৭০৪৮=১৩.৫২
ধ্বজেন্দ্র বর্মন—ফঃ বঃ	—	৬৫৯২=১২.৬৫
বাতিল ভোট	—	২১৮০= ৪.১৮
প্রদত্ত ভোট	—	৫২১৩৪

সীতাই কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৪০৯৮

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৬৫.৮৪

ডাঃ মহঃ ফজলে হক—কংগ্রেস-শা (নির্বাচিত)	—	২০৯৬৭=৪২.৯৮
ব্যবধান—৮৭২৩ ভোট		
হিতেন্দ্রচন্দ্র নাগ—ফঃ বঃ	—	১২২৪৪=২৫.১০
মোদনাথ রায় মণ্ডল—কংগ্রেস-সং	—	৯৩২০=১৯.১০

সহীদার রহমান—সি. পি. আই (এম)	—	৪৩২১=৮.৮৬
বাতিল ভোট	—	১৯৩৬=৩.৯৬
প্রদত্ত ভোট	—	৪৮৭৮৮

দিনহাটা কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮২৭০৫

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৬৭.৯৩

যোগেশচন্দ্র সরকার—কংগ্রেস-শা (নির্বাচিত)	—	২৪২৪৯=৪৩.১৬
ব্যবধান—২৪২৬ ভোট		
কমলকান্তি গুহ—ফঃ বঃ	—	২১৮২৩=৩৮.৮৪
জহির উদ্দিন মিঞা—কংগ্রেস-সং	—	২৭১৪= ৪.৮৩
ননীগোপাল রায়—সি. পি. আই (এম)	—	৪৯২৯= ৮.৭৭
বাতিল ভোট	—	২৪৬৯= ৪.৪০
প্রদত্ত ভোট	—	৫৬১৮৪

কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮৩৭২১

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৬১.৭৯

সুনীলকুমার কর—কংগ্রেস-শা (নির্বাচিত)	—	২৫০৯৯=৪৮.৫২
ব্যবধান—৮৬০২ ভোট		
শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—সি. পি. আই (এম)	—	১৬৪৯৭=৩১.৮৯
মোহিতলাল চক্রবর্তী—ফঃ বঃ	—	৬৩২০=১২.২২
দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত—কংগ্রেস-সং	—	১০২৫= ১.৯৮
পল্লব দাসগুপ্ত—বাংলা কংগ্রেস	—	৫৫২= ১.০৬
বাতিল ভোট	—	২২৪১= ৪.৩৩
প্রদত্ত ভোট	—	৫১৭৩৪

কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৪৪১৪

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৬২.১৮

সন্তোষকুমার রায়—কংগ্রেস-শা (নির্বাচিত)	—	২১৫৮২=৪৬.৬৪
ব্যবধান—৬৫৯৪ ভোট		
গোপালচন্দ্র সাহা—সি. পি. আই (এম)	—	১৪৯৮৮=৩২.৩৯

সুধীর নিয়োগী—কংগ্রেস-সং	—	৩১৮২=৬·৮৮
বিমলকান্তি বসু—ফঃ বঃ	—	২৮৫৮=৬·১৮
রাইমোহন রায়—বাংলা কংগ্রেস	—	১৫৩২=৩·৩১
বাতিল ভোট	—	২১২৯=৪·৬০
প্রদত্ত ভোট	—	৪৬২৭১

তুফানগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮০০৯৫

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৭১·১৫

শিশিরকুমার ঈশোর—কংগ্রেস শা (নির্বাচিত)	—	২৮৬৭৮=৫০·৩২
ব্যবধান—১০১০৫ ভোট		
মণীন্দ্রনাথ বর্মা—সি. পি. আই (এম)	—	১৮৫৭৩=৩২·৫৯
দোলমোহন পাখাবরা—ফঃ বঃ	—	৪৫৫৬= ৮·০০
নরেন্দ্রনাথ বর্মন—কংগ্রেস-সং	—	২৪৮৮= ৪·৩৬
বাতিল ভোট	—	২৬৯৫= ৪·৭৩
প্রদত্ত ভোট	—	৫৬৯৯০

বিধান সভা নির্বাচন—১৯৭২

আসন সংখ্যা—৮

১৯৭২ সনের ১১ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস দল রাজ্য স্তরে ক্ষমতা দখল করে। কোচবিহারের সব কয়টি আসনেই কংগ্রেস দল জয়লাভ করে। এই নির্বাচনের সময় ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস দল হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সংগঠন কংগ্রেস থাকিলেও কোন প্রভাব এই সময়ে দেখা যায় নাই। বাম দলগুলি পুনরায় সংগঠিত ভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হইবার ফলে প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়া যায়। কোন কোন কেন্দ্রে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয়। মোট আটটি আসনের মধ্যে ৪টি সাধারণ এবং ৪টি তপসিলী সংরক্ষিত। এই নির্বাচনের পর কোচবিহার জেলা হইতে সন্তোষকুমার রায়, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং তপসীল জাতি, উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী এবং ডাঃ ফজলে হক স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। কিন্তু ১৯৭৪ সনে সন্তোষকুমার রায় মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করেন। এই নির্বাচনের সময় কংগ্রেস ও সি. পি. আই দল মিলিতভাবে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা নামে একটি ফ্রন্ট গঠন করে।

নির্বাচনোত্তর কালে কংগ্রেস দল মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং সি. পি. আই সমর্থন জানায়। সি. পি. আই (এম), ফ: ব: ইত্যাদি কয়েকটি দলেরও আর একটি মোর্চা ছিল।

মেখলীগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৭৩৩০

মধুসূদন রায়—কংগ্রেস (নির্বাচিত) — ২৫৮১৬

ব্যবধান—৭৫৮৩ ভোট

অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান—ফ: ব: — ১৮২৩৩

সুধাংশুকুমার সরকার—নির্দল — ৩৭৫

মাথাভাঙ্গা (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৮৬৯৬

বীরেন্দ্রনাথ রায়—কংগ্রেস (নির্বাচিত) — ২৭৪৯৩

ব্যবধান—৯৩২০ ভোট

দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া—সি. পি. আই (এম) — ১৮১৭৩

কোচবিহার পশ্চিম (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮৯৪০০

রজনীকান্ত দাস—কংগ্রেস (নির্বাচিত) — ৩০৮০৪

ব্যবধান—১৬৬৭৮ ভোট

অজিতকুমার বসুনীয়া—ফ: ব: — ১৪১২৬

সীতাই কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৪৫০৪

ডাঃ মহঃ ফজলে হক—কংগ্রেস (নির্বাচিত) — ২৮৫৯২

ব্যবধান—১৩২৪৭ ভোট

দীপক সেনগুপ্ত—ফ: ব: — ১৫৩৪৫

দিনহাটা কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮৫৮৪২

যোগেশচন্দ্র সরকার—কংগ্রেস (নির্বাচিত) — ৩০৪০৪

ব্যবধান—৯৬৯২ ভোট

কমলকান্তি গুহ—ফঃ বঃ	—	২০৭১২
রামচন্দ্র সাহা—নির্দল	—	৮৫৫

কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮২৪২০

সুনীলকুমার কর—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	২৯১৪২
ব্যবধান—৯২৯৬ ভোট		
অপরাজিতা গোপ্পী— ফঃ বঃ	—	১৯৮৪৬
জহির উদ্দিন মিঞা—কংগ্রেস-সংগঠন	—	৫৪১

কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৫০১৭

সন্তোষকুমার রায়—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	২৯৬০০
ব্যবধান—১২৪০৪ ভোট		
শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—সি. পি. আই (এম)	—	১৭১৯৬
রাইমোহন রায়—নির্দল	—	২৯৩

তুফানগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮১০০৪

শিশিরকুমার ঈশোর—কংগ্রেস (নির্বাচিত)	—	৩৬৩৬৪
ব্যবধান—৯০৮৬ ভোট		
মণীন্দ্রনাথ বর্মা—সি. পি. আই (এম)	—	২৭২৭৮

বিধান সভা নির্বাচন—১৯৭৭

মোট আসন সংখ্যা—৯

পূর্ববর্তী নির্বাচনের পর এই নির্বাচনে কোচবিহার জেলায় আরও একটি আসন বাড়িয়া ৯টি আসন হইল। ১৯৭৭ সনের ১১ই জুনের নির্বাচনে রাজ্য স্তরে কংগ্রেসের ভরাডুবি হইল। কেন্দ্রে তখন প্রথম অকংগ্রেসী জনতা সরকার। ১৯৭৫ সনের ২৬শে জুন দেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়। দেশে জরুরী অবস্থা জারি করিবার বিষয় লইয়া কংগ্রেস দল দ্বিধাগ্রস্থ। দলীয় সংহতি বিনষ্ট। কোচবিহার জেলায় যেখানে ১৯৬২ সন বাদে কংগ্রেস দল দীর্ঘ দিন ধরিয়া মোটামুটি সাফল্য দেখাইয়া আসিতেছিল, সেইখানে এই

নির্বাচনে জনতার রায়ে তাহাদের হাতে একটি আসনও আর রহিল না। ৯টি আসনের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক ৫টি এবং সি. পি. আই (এম) ৪টি আসন লাভ করিল। ১৯৭৭ সনের নির্বাচনী পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায় যে বামফ্রন্টের এরূপ সাফল্য গত ৩০ বৎসরে হয় নাই। এই নির্বাচনের পর কোচবিহার হইতে কমলকান্তি গুহ কৃষি দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী এবং শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। কোচবিহারে মোট ভোটারের সংখ্যা ৭৮৩৯১৮, এইবার ভোট পড়িয়াছে প্রায় ৬০%, বামফ্রন্টের মোট ভোট ২৭৩৮৫২, তাহার মধ্যে ফঃ বঃ ১৬২৭৯১টি, সি. পি. আই (এম) ১১১০৬১টি, শতকরা হার ৬০.১২% আর কংগ্রেস পায় ৯৭৩৮২টি ভোট, শতকরা ২১.৩৭%, জনতা পার্টি পায় ৬৪৫৬১টি ভোট, শতকরা ১৪.১৭%।

মেখলীগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৯২৬১১

সদাকান্ত রায়—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	২১৩৩৯
ব্যবধান—৮৭১৭ ভোট		
মধুসূদন রায়—কংগ্রেস	—	১২৬২২
প্রাণহরি সিংহ সরকার—জনতা পার্টি	—	৮৯০১
সুভাষচন্দ্র মৈত্র—নির্দল	—	২৫৭৮
কানাইলাল মল্লিক—নির্দল	—	১৬৬১

শীতলখুচী (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৮১৩৩

সুধীর প্রামাণিক—সি. পি আই (এম) (নির্বাচিত)	—	২৩৬৯৬
ব্যবধান—১৩৬০৪ ভোট		
বীরেন্দ্রনাথ রায়—কংগ্রেস	—	১০০৯২
ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ—জনতা পার্টি	—	৭২৪৩
গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ—নির্দল	—	৫০৬
যতীন্দ্রনাথ রায়—নির্দল	—	৪৯৩

মাথাভাঙ্গা (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৪২৫৯

দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া—সি. পি. আই (এম) (নির্বাচিত)	—	২২৪৯৩
ব্যবধান—১৩৭৩৫ ভোট		

প্রতাপচন্দ্র সিংহ—কংগ্রেস	—	৮৭৫৮
মুরারীমোহন পাটোয়ারী—নির্দল	—	৮৭১২
মধুসূদন সরকার—নির্দল	—	৪৮২৭

কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র

মোট ভোটার—৮৯৮৮৬

অপরাজিতা গোপ্পী—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	৩২৭৯২

ব্যবধান—২৪২০০ ভোট

বিমলচন্দ্র ধর—কংগ্রেস	—	৮৫৯২
অরুণকুমার ভট্টাচার্য—জনতা পার্টি	—	৫৪১৯
শ্যামলকুমার চৌধুরী—নির্দল	—	৩০০৮
দেবীপ্রসাদ নিয়োগী—সি. পি. আই	—	১৬৮৫
হরিদাস গুহ—নির্দল	—	৪১৭
সমর দে—নির্দল		৭৮

কোচবিহার পশ্চিম কেন্দ্র

মোট ভোটার—৯০৪২৬

বিমলকান্তি বসু—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	৩৩৫৯৫

ব্যবধান—২২১৬৮ ভোট

মকসুদার রহমান—কংগ্রেস	—	১১৪২৭
গণেশচন্দ্র কর্মকার—জনতা পার্টি	—	৫৫৫৩
রজতকুমার চক্রবর্তী—নির্দল	—	১৯০

সীতাই কেন্দ্র

মোট ভোটার—৯০৯১৩

দীপক সেনগুপ্ত—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	২৩৪০৫

ব্যবধান—২০৮৬১ ভোট

সুশীল রায় সরকার—কংগ্রেস	—	১২৫৪৪
আফসার আলী আমেদ—জনতা পার্টি	—	৭৬০১

দিনহাটা কেন্দ্র

মোট ভোটার—৯৭৪২৪

কমলকান্তি গুহ—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	৩৩৬৬০

ব্যবধান—২১২১৭ ভোট

অলোককুমার নন্দী—কংগ্রেস — ১২৪৪৩
সাধন বসু—জনতা পার্টি — ৬৯১২
যোগেশচন্দ্র সরকার—নির্দল — ৬৭৫১

নাটাবাড়ী কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৪৩৪৮

শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—সি. পি. আই (এম) (নির্বাচিত) — ২৬৩০০
ব্যবধান—১৩৮১৪ ভোট
সন্তোষকুমার রায়—কংগ্রেস — ১২৪৮৬
যতীন্দ্রনাথ সিংহ সরকার—নির্দল — ৮৬৬৩
প্রভাতকুমার বসু—জনতা পার্টি — ৩৪৪৪

তুফানগঞ্জ কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৫৫১৮

মণীন্দ্রনাথ বর্মা—সি. পি. আই (এম) (নির্বাচিত) — ২৮৫৭২
ব্যবধান—১৭২১১ ভোট
সুরেন্দ্রনাথ রায় কোঙার—জনতা পার্টি — ১১৩৬১
মহেশচন্দ্র বর্মা—কংগ্রেস — ৮৪১৮

বিধান সভা নির্বাচন—১৯৮২

আসন সংখ্যা—৯

১৯৮২ সনের ১৯শে মে নবম বিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস দল অন্যান্য জেলায় কিছু আসন লাভ করিলেও কোচবিহারে একটি আসনও পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই। বামফ্রন্ট প্রার্থীরাই পুনঃ নির্বাচিত হন। এই সময়ে কংগ্রেস (ই) এবং কংগ্রেস (স) আসন সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। ৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস (ই) ৮টি এবং কংগ্রেস (স) ১টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। ইহা ছাড়াও আমরা বাঙালী, উত্তরখণ্ড প্রভৃতি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিলেও ভোটারের মন জয় করিতে পারে নাই। ইহারা কোন স্বীকৃত রাজনৈতিক দল নয়। নির্দল প্রার্থী হিসাবেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তবে তালিকায় দলের নাম উল্লেখ করা হইল। এই নির্বাচনেও বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং

কোচবিহার জেলা হইতে কমলকান্তি গুহ কৃষি দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী এবং শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

এই বিধান সভা নির্বাচনে কোচবিহার জেলার প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৮৫.৩৮।

মেখলীগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—১০৩৯৮১

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৭৭.৭১

সদাকান্ত রায়—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ৪০৯৫৮=৫০.৬৯

ব্যবধান—১২৪৩০ ভোট

নীরেন চৌধুরী—কংগ্রেস (স) — ২৮১২৮=৩৫.৩০

অরুণ রায়—এস. ইউ. সি — ৬৪২ = ৭.৯৫

শিবেন্দ্রনারায়ণ রায়—আমরা বাঙালী — ১৬২৮— ২.০১

মণীন্দ্রনাথ রায়—উত্তর খণ্ড — ১১১৪= ১.৩৮

বাতিল ভোট — ২১৫৩= ২.৮৭

প্রদত্ত ভোট — ৮০৭৩৮

শীতলখুচী (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৯৫৮৯১

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৫.৮৬

সুধীর প্রামাণিক—সি. পি. আই (এম) (নির্বাচিত) — ৪৫৫২৭=৫৫.৩০

ব্যবধান—১১৮৭৩ ভোট

বীরেন্দ্রনাথ রায়—কংগ্রেস (ই) — ৩৪৩৩০=৪১.৭০

কর্ণেশ্বর বর্মণ—আমরা বাঙালী — ৪৫৬= ০.৫৫

বাতিল ভোট — ২০১৬= ২.৪৫

প্রদত্ত ভোট — ৮২৩৩২

মাথাভাঙ্গা (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৯৫৮৩৭

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৫.১০

দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া—সি. পি. আই (এম) (নির্বাচিত)— ৪৪৭২৫=৫৪.৮৪

ব্যবধান—১০০৯০ ভোট

হিতেন প্রামাণিক—কংগ্রেস (ই) — ৩৪০৪৫=৪১.৭৪
কর্ণেশ্বর বর্মণ—আমরা বাঙালী — ৭৪২= ২.৯১
বাতিল ভোট — ২০৪৭= ২.৫১

প্রদত্ত ভোট — ৮১৫৮৪

কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র

মোট ভোটার—১০১৩৩৫

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮২.১৬

অপরাজিতা গোপ্পী—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ৪৬৮১০=৫৬.২২

ব্যবধান—১২৯৩৭ ভোট

সুনীলকুমার কর—কংগ্রেস-ই — ৩৩৮৭৩=৪০.৬৪
রবীন্দ্রনাথ সরকার—আমরা বাঙালী — ৭৬৬= ০.৯২
ভবেশ্বর দাস—নির্দল — ৪৫৮= ০.৫৫
বাতিল ভোট — ১৩৫৪= ১.৬৩

প্রদত্ত ভোট — ৮৩২৬১

কোচবিহার পশ্চিম কেন্দ্র

মোট ভোটার সংখ্যা—১০৮৯৮১

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৫.৮১

বিমলকান্তি বসু—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ৫৩১৭০=৫৬.৮৫

ব্যবধান—১৬১০৫ ভোট

শ্যামল চৌধুরী—কংগ্রেস-ই — ৩৭০৬৫=৩৯.৬০
জাহির উদ্দিন মিঞা—কংগ্রেস-সংগঠন — ৬১৭= ০.৬৬
নরেন্দ্রপ্রসাদ কার্যী—আমরা বাঙালী — ৬৪৬= ০.৭০
জনাব উদ্দিন ব্যাপারী—উত্তরখণ্ড — ২২৭= ০.২৪
বাতিল ভোট — ১৭৯৯= ১.৯২

প্রদত্ত ভোট — ৯৩৫২৪

সীতাই কেন্দ্র

মোট ভোটার—১০৭৬৪৬

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৭.৬৯

দীপক সেনগুপ্ত—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ৫১৩১২=৫৪.৩৬

ব্যবধান—১১৮৬৬ ভোট

ডাঃ মহঃ ফজলে হক—কংগ্রেস-ই	—	৪০২২৬=৪২.৬১
প্রসন্নকুমার বর্মণ—আমরা বাঙ্গালী	—	১০২৩= ১.০৮
বাতিল	—	১৮৫৩= ১.৯৫
প্রদত্ত ভোট	—	৯৪৩৯৬

দিনহাটা কেন্দ্র

মোট ভোটার—১০৮৯১১

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৬.৪৬

কমলকান্তি গুহ—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	৫৩৪৬০=৫৬.৭৭

ব্যবধান—১৪৮৩৩ ভোট

রামকৃষ্ণ পাল—কংগ্রেস-ই	—	৩৮৬২৭=৪১.০২
শ্যামলকুমার রায়—আমরা বাঙালী	—	২৮১= ০.৩০
বাতিল ভোট	—	১৭৯৮= ১.৯১
প্রদত্ত ভোট	—	৯৪১৬৬

নাটাবাড়ী কেন্দ্র

মোট ভোটার—৯১০৪০

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৯.১৪

শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—সি. পি. আই (এম) (নির্বাচিত)	—	৪৫০৫৪=৫৫.১৫

ব্যবধান—১০০২০ ভোট

সন্তোষকুমার রায়—কংগ্রেস-ই	—	৩৫০৩৪=৪২.৮৮
ধীরেন্দ্রনাথ দাস—আমরা বাঙ্গালী	—	৩২০= ০.৩৯
বাতিল ভোট	—	১২৯০= ১.৫৮
প্রদত্ত ভোট	—	৮১৬৯৮

তুফানগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৯১১৩৮

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৮.৮৯

মণীন্দ্রনাথ বর্মা—সি. পি. আই. (এম) (নির্বাচিত)	—	৪২৮৮৮=৫৩.০৭

ব্যবধান—৫৬৯৬ ভোট

শঙ্কর সেন ঈশোর—কংগ্রেস-ই	—	৩৫১৯২=৪৩.৫৫
সুরেন্দ্রনাথ রায় কোঙার—ভারতীয় জনতা পার্টি	—	৭৭৮= ০.৯৬

সাধনকুমার দাস—আমরা বাঙ্গালী	—	৫০৭= ০.৬৩
বাতিল ভোট	—	১৪৪৯= ১.৭৯
প্রদত্ত ভোট	—	৮০৮১৩

বিধান সভা নির্বাচন—১৯৮৭

আসন সংখ্যা—৯

১৯৮৭ সনের ২৩শে মার্চ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট তৃতীয়বার একাদিক্রমে ক্ষমতা দখল করে। কোচবিহার জেলাতেও এই বামফ্রন্টের আমলে কোন কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হইতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট। ১৯৮৪ সনের ডিসেম্বর মাসে লোকসভার নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস (স) কংগ্রেস-ই দলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস সি পি. আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের সঙ্গে নির্বাচনী লড়াইয়ে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অথচ ১৯৮৪ সনের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রাপ্ত আসন দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে বিধান সভা নির্বাচনেও বিশেষ সাফল্যের অধিকারী হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহারেও কংগ্রেসের ভরাডুবি হইল। তিনবারই একই প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছে, তবে জয়ের ক্ষেত্রে ভোটের কিছু হেরফের হইয়াছে মাত্র। এই নির্বাচনে যেমন বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে বিক্ষুব্ধ সি. পি. আই (এম) নির্দল প্রার্থী হিসাবে ছিলেন, তেমনি প্রাক্তন কংগ্রেসী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেসের বেশ কিছু প্রার্থীও নির্দল হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন, তবে এই সব প্রার্থীগণ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ভোটার বর্তমানে প্রায় দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় পক্ষের অবস্থা বড়ই করুণ বলিয়া মনে হয়। তিনবারই লড়াই হইয়াছে বামফ্রন্ট বনাম কংগ্রেস দলের মধ্যে। এইখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে কোচবিহার জেলা হইতে এইবারের নির্বাচনেই প্রথম দুইজন মহিলা প্রার্থী নির্বাচনের আসরে নামেন এবং একজন পূর্বের ধারা অনুসরণ করিয়া সফলকাম হন। পশ্চিমবঙ্গে প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৭৫.৬৬, তাহার মধ্যে বামফ্রন্ট পায়—৫২.৯৫ এবং কংগ্রেস পায়—৪১.৮১।

এই নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকের কমলকান্তি গুহ কৃষি দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী রূপে এবং সি. পি. আই (এম)-এর দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া

তপশীল জাতি-উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী রূপে দায়িত্ব পান। কোচবিহার হইতে এই প্রথম দুইজন পূর্ণ মন্ত্রী হইলেন।

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার বিশেষ নির্বাচনী সংখ্যায় (১ ও ১৬ এপ্রিল, ১৯৮৭) গত বিধান সভা নির্বাচন বিষয়ে জেলা ভিত্তিক যে পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরা হইয়াছে, সেইখানে কোচবিহার জেলার চালচিত্রটি নিম্নরূপ—

মোট ভোটার—১০,৬৩০৬২
প্রদত্ত বৈধ ভোট—৮৬৯০৮৬ (৮১.৭৫)
প্রদত্ত বাতিল ভোট—১৪১০১ (১.৬০)
সি.পি.আই (এম)—২০০০৮৫ (২৩.০২)

কংগ্রেস—৩৮৮৫৩৯ (৪৪.৭১)
বি. জে পি—২৬৩২ (০.৩০)
ফঃ বঃ—২৬৭৫১৬ (৩০.৭৮)
এস.ইউ.সি.আই—১৬৮৩ (০.১৯)
নির্দল—৮৬৭১ (০.৯৯)

মেখলীগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—১১৩৬০১

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৭৯.০৭

সদাকান্ত রায়—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ৪৮০৭১=৫১.২৬

ব্যবধান—৯০৩৭ ভোট

মধুসূদন রায়—কংগ্রেস	—	৩৯০৩৪=৪১.৬২
যদুনাথ সরকার—বি জে পি	—	৯৬ = ১.০৩
অবিরাম রায়—এস. ইউ সি	—	১৬৮৩= ১.৭৯
গোপালচন্দ্র রায়—নির্দল	—	২৩৮১= ২.৫৪
বাতিল ভোট	—	১৬৪ = ১.৭৬
মোট প্রদত্ত ভোট	—	৯৩৭৭৭

শীতলখুচী (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—১১৬৩৭১

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৫.৭০

সুধীর প্রামাণিক—সি. পি. আই (এম) (নির্বাচিত)— ৫০৬৮০=৫০.৬০

ব্যবধান—৩৪৭১ ভোট

সবিতা রায়—কংগ্রেস	—	৪৭২০৯= ৪৭.১৩
শচীন্দ্রনাথ বর্মা—নির্দল	—	৫১২= ০.৫১
বাতিল ভোট	—	১৭৬১= ১.৭৬
মোট প্রদত্ত ভোট	—	১০০১৬৫

মাথাভাঙ্গা (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—১১৫৭৮৭

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮২.২২

দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া—সি. পি. আই (এম) (নির্বাচিত)—		৪৯০৯০=৫১.৫৭
ব্যবধান—৫৩৭০ ভোট		
যতীন্দ্রনাথ বর্মণ—কংগ্রেস	—	৪৩৭২০=৪৫.৯০
কর্ণেশ্বর বর্মণ—আমরা বাঙালী	—	৭০৯= ৯.৭৪
বাতিল ভোট	—	১৬৭৯= ১.৭৬
মোট প্রদত্ত ভোট	—	৯৫২০৪

কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র

মোট ভোটার—১১৬৮৫৫

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৭৮.০৫

অপরাজিতা গোপ্পী—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	৪৯১৭২=৫৩.৯১
ব্যবধান—৯৭৮০ ভোট		
মিহিরকুমার গোস্বামী—কংগ্রেস	—	৩৯৩৯২=৪৩.১৯
কমলেশ্বর সরকার—আমরা বাঙ্গালী	—	৪১৯= ০.৪৬
শ্যামলকৃষ্ণ সরকার—বি. জে. পি	—	৬১৫= ০.৬৭
সন্তোষকুমার নন্দী—রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস	—	২৪৩= ০.২৬
বাতিল ভোট	—	১৩৭৬= ১.৫১
মোট প্রদত্ত ভোট	—	৯১২০৮

কোচবিহার পশ্চিম কেন্দ্র

মোট ভোটার—১২৯২৪০

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮২.৬৮

বিমলকান্তি বসু—ফঃ বঃ (নির্বাচিত)	—	৫৯৩৪২=৫৫.৫৩
ব্যবধান—১৪১৭৯ ভোট		
শ্যামল চৌধুরী—কংগ্রেস	—	৪৫১৬৩=৪২.২৭
নীরেন্দ্রপ্রসাদ কার্য্যী—নির্দল (আঃ বাঃ)	—	৩১২= ০.৩০
সৈয়দ ওসমান গণি—নির্দল (বিক্ষুব্ধ সি. পি. এম)	—	৫৩৬= ০.৫০
বাতিল ভোট	—	১৪৯২= ১.৪০
মোট প্রদত্ত ভোট	—	১০৬৮৫৪

সীতাই কেন্দ্র

মোট ভোটার—১২২৫৯৯

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৫·৬৫

দীপক সেনগুপ্ত—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ৫৩৫৯২=৫১·৫৪

ব্যবধান—৪৬৫৪ ভোট

ডাঃ মহঃ ফজলে হক—কংগ্রেস — ৪৯৯৩৮=৪৬·৬০

বাবলু বর্মণ—আমরা বাঙালী — ৭৫৫= ০·৭২

বাতিল ভোট — ১৭২১= ১·৬৪

মোট প্রদত্ত ভোট — ১০৫০০৬

দিনহাটা কেন্দ্র

মোট ভোটার—১২৫৪৩৫

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৪·২০

কমলকান্তি গুহ—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ৫৭৩৩৯=৫৪·২৯

ব্যবধান—১০৯১৪ ভোট

অলোককুমার নন্দী—কংগ্রেস — ৪৬৪২৫=৪৩·৯৬

মনোহরি বর্মণ—আমরা বাঙ্গালী — ৪০৪= ০·৩৮

বাতিল ভোট — ১৪৫০= ১·৩৭

মোট প্রদত্ত ভোট — ১০৫৬১৮

নাটাবাড়ী কেন্দ্র

মোট ভোটার - ১১০৭২৫

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার - ৮১·৫৫

শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—সি. পি. আই (এম) (নির্বাচিত)

— ৪৯২৬৪=৫২·৩২

ব্যবধান—৮০৭৭ ভোট

সন্তোষকুমার রায়—কংগ্রেস — ৪১৪৮৭=৪৩·৮০

অমলেন্দু দেব—বিক্ষুব্ধ সি. পি. এম — ৯৮৩= ১·০৪

মণিভূষণ সিংহ সরকার—নির্দল — ৮৮৮= ০·৯৪

হরিবলা রায়—আমরা বাঙ্গালী — ২১৮= ০·২৩

বাতিল ভোট — ১৫৮৮= ১·৬৭

মোট প্রদত্ত ভোট — ৯৪৭২৮

তুফানগঞ্জ (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—১০৬৯৪৫

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৪.৭৪

মণীন্দ্রনাথ বর্মা—সি. পি. আই (এম) (নির্বাচিত)— ৫০৭৪৮ = ৫৬.০০

ব্যবধান—১৩৫৮০ ভোট

শিশিরকুমার ঈশোর—কংগ্রেস	—	৩৭১৭৮ = ৪১.০১
সুরেন্দ্রনাথ রায় কোঙার—বি. জে. পি	—	১০৩৬ = ১.১৪
দলেন্দ্রনাথ রায়—আমরা বাঙ্গালী	—	২৯১ = ০.৩২
বাতিল ভোট	—	১৩৮৫ = ১.৫৩
মোট প্রদত্ত ভোট	—	৯০৬২৮

কোচবিহারে লোকসভা নির্বাচন

১৯৫২ সনে লোকসভার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এই তিনটি জেলা লইয়া উত্তরবঙ্গ কেন্দ্র গঠিত হয়। এই কেন্দ্র হইতে সাধারণ, তপশীল এবং উপজাতিদের মধ্য হইতে তিনজন প্রার্থী নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে তিনজন কংগ্রেস প্রার্থীই জয়ী হন। নির্বাচিত প্রার্থীরা হইলেন—অমিয়কান্ত বাসু (সাধারণ), উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (তপঃ), বীরেন্দ্রনাথ কাঠাম (তপঃ-উপজাতি)। অমিয়কান্ত বাসু কলিকাতার অধিবাসী, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার গোপালপুর গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থানের ঠিকানায় ভোটার তালিকাভুক্ত তবে জলপাইগুড়ির অধিবাসী এবং বীরেন্দ্রনাথ কাঠাম জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারের নিকটবর্তী কাঠামবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা।

১৯৫৭ সনে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাকে লইয়া নির্বাচন কেন্দ্র গঠিত হয়। দুইটি আসনযুক্ত এই নির্বাচনে দুইজন কংগ্রেস প্রার্থীই জয়ী হন। বিরোধী দলগুলি প্রার্থী দিলেও আশাপ্রদ ফল দেখাইতে পারে নাই। নির্বাচিত সদস্যদ্বয় হইলেন—সন্তোষকুমার ব্যানার্জী (সাধারণ) ও উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (তপঃ)। উভয়েই জলপাইগুড়ি নিবাসী।

সন্তোষকুমার ব্যানার্জীর মৃত্যুর ফলে ১৯৫৮ সনের এপ্রিল মাসে লোকসভার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেস প্রার্থী নলিনীরঞ্জন ঘোষ জয়ী হন। ইনিও জলপাইগুড়ি সহরের অধিবাসী।

১৯৬২ সনে কোচবিহারে একটি আসনযুক্ত তপশীল নির্বাচন কেন্দ্র গঠিত হয়। নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী উপেন্দ্রনাথ বর্মণ ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী দেবেন্দ্রনাথ কার্যীর কাছে পরাজয় বরণ করেন। এই প্রথম কোচবিহার হইতে অকংগ্রেসী প্রার্থী নির্বাচিত হন।

দেবেন্দ্রনাথ কার্যীর মৃত্যুতে ১৯৬৩ সনের ডিসেম্বর মাসে লোকসভার কোচবিহার কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া কংগ্রেসের পরেশচন্দ্র বর্মণ নির্বাচিত হন।

১৯৬৭ সনের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে পুনরায় কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হন। এই নির্বাচনে বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী এবং সি. পি. আই (এম) সমর্থিত। কিন্তু ১৯৭১ সনের নির্বাচনে দাস চৌধুরী কংগ্রেস দলে যোগদান করেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জয়ী হন। এই সময়ে বিরোধী মোর্চা ছিল না। তাহার পর দেশের রাজনৈতিক চালচিত্রের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কংগ্রেস দলের মধ্যে যেমন অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়াছে, তেমনি দেশের অবস্থা বিচারে ১৯৭৫ সনের ২৬শে জুন দেশে জরুরী অবস্থা জারী করা হইয়াছে। তাহার পর জরুরী অবস্থা শিথিল করা হয় ১৯৭৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী।

১৯৭৭ সনের ১৬ই মার্চ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কোচবিহারে দ্বৈরথ সমর দেখা যায়। সেই সময়ে কেন্দ্রে এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার ছিল, কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রে মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে জনতা দলের সরকার গঠিত হয়, যাহার ফলে কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় আসে। কোচবিহারে জনতা সমর্থিত বামফ্রন্ট প্রার্থী নির্বাচিত হন।

১৯৭৫ সনে নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনর্গঠন হয়। যাহার ফলে কোচবিহারের ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দুইটি অর্থাৎ তুফানগঞ্জ ও মেখলীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র দুইটি অপর লোকসভা কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হয়। তাহার পর ১৯৭৭ সনে এই বিভাজন অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রে জনতা সরকারের পতনের পর ১৯৮০ সনের ৬ই জানুয়ারী লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বামফ্রন্ট বিরাট সাফল্য লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে কংগ্রেস দল মাত্র ৪টি আসন লাভ করে। কোচবিহার জেলায় বামফ্রন্ট সমর্থিত ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হন। তবে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতার

গঠন করেন। নির্বাচনী সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা কেবলমাত্র দুইটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। জনতা দলের অবস্থাও খুব করুণ হয়। অন্যান্য দলের অবস্থাও পরিসংখ্যানে পরিষ্কার।

আততায়ীর হাতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৮৪ সনের ৩১ অক্টোবর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সনের ২৪ ডিসেম্বর অষ্টম লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল বেশ কয়েকটি আসন দখল করিলেও কোচবিহারের আসনটি বামফ্রন্টের ফরোয়ার্ড ব্লক দলের দখলেই থাকে। পরপর তিনবার অমর রায় প্রধান বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ৬. ১২. ১৯৮৪ তারিখে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় রাজবাড়ী ময়দানে নির্বাচনী ভাষণ দেন।

কোচবিহার হইতে লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচিত প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের তালিকা

লোকসভা নির্বাচন—১৯৫২ (উত্তরবঙ্গ কেন্দ্র)

আসন সংখ্যা—৩ : মোট ভোটার—৮৯৩৪২২

অমিয়কান্ত বাসু—কংগ্রেস (সাধারণ) (নির্বাচিত) — ১৫৮৬২০
উপেন্দ্রনাথ বর্মণ—কংগ্রেস (তপঃ) (নির্বাচিত) — ১৭৭৬১৮
বীরেন্দ্রনাথ কাঠাম—কংগ্রেস (তপঃ-উপঃ) (নির্বাচিত) — ১৬৩৬০৪
গঙ্গারাম ওরাঁও—কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি — ৭৭১৮১
উপেন্দ্রনারায়ণ দাস—ফঃ বঃ — ৭৭২০৫
হিমাংশুকুমার নিয়োগী—নির্দল — ৮৬৯৭৩
নগেন্দ্রনাথ মহলানবীশ—নির্দল (হিন্দু মহাসভা সমর্থিত) — ৫৯৩৪৭
এল আর যোশী—নির্দল — ৭১৫১০

লোকসভা নির্বাচন—১৯৫৭ : আসন সংখ্যা—২

সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—কংগ্রেস (সাধারণ) (নির্বাচিত) — ২৪৭৭৮০
উপেন্দ্রনাথ বর্মণ—কংগ্রেস (সংরক্ষিত) (নির্বাচিত) — ২২০৫৭২
শিবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য—ফঃ বঃ (সা) — ১৭০৩৯২
কমলকৃষ্ণ রায় সিংহ—ফঃ বঃ (সং) — ১২৭৫০৩

লোকসভা উপ-নির্বাচন—১৯৫৮

নলিনীরঞ্জন ঘোষ—কংগ্রেস (নির্বাচিত)

লোকসভা নির্বাচন—১৯৬২

কোচবিহার (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৫৩১৭২৩

দেবেন্দ্রনাথ কার্যী—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ১৪১৪৩৬

ব্যবধান—৩১৭৬০ ভোট

উপেন্দ্রনাথ বর্মণ—কংগ্রেস — ১০৯৬৭৬

বাতিল ভোট — ৮৩৫১

প্রদত্ত ভোট — ২৫৯৪৬৩

লোকসভা উপ-নির্বাচন—১৯৬৩

মোট ভোটার— ৫৩৫৮৫১

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৪৪·০০

পরেশচন্দ্র বর্মণ—কংগ্রেস (নির্বাচিত) — ১২২২০৫=৫২·০২

ব্যবধান—৫৯৫৯৪ ভোট

বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী—ফঃ বঃ — ৬২৬১১=২৬·৬৫

ধর্মনারায়ণ বর্মা—স্বতন্ত্র পার্টি — ২৩২৪৮= ৯·৯১

দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া—সি. পি. আই — ১৭৭৬০= ৭·৫৬

আনন্দকুমার বর্মা সাউদ—নির্দল — ৮৬৮= ০·৩৭

বাতিল ভোট — ৮২১২= ৩·৫০

প্রদত্ত ভোট — ২৩৪৯০৪

লোকসভা নির্বাচন—১৯৬৭

মোট ভোটার—৫০৭২৭২

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৬৭·৩৩

বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ১৬৭৯৭১=৪৯·১৮

ব্যবধান—৪৩৮৩৬ ভোট

পরেশচন্দ্র বর্মণ—কংগ্রেস — ১২৪১৩৫=৩৬·৩৪

সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার—স্বতন্ত্র পার্টি — ৩৩৪৩১= ৯·৭৯

বাতিল ভোট — ১৬০১৮=৪৬·৯

প্রদত্ত ভোট — ৩৪১৫৫৫

লোকসভা নির্বাচন—১৯৭১

মোট ভোটার—৬২০৫৫৮

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৫৮·০০

বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী—কংগ্রেস-শা (নির্বাচিত)— ১৫০৮৬৯=৪১·৯৪

ব্যবধান—৭০৬০৪ ভোট

নগেন্দ্রনাথ রায়—সি. পি. আই (এম)	—	৮০২৬৫=২২·৩০
অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান—ফঃ বঃ	—	৭৭০৯০=২১·৪২
প্রসেনজিৎ বর্মণ—কংগ্রেস-সং	—	৩৪৮৭৪= ৯·৭০
রবীন্দ্রনাথ সরকার—নির্দল	—	৪৬৬০= ১·৩০
বাতিল ভোট	—	১২০৩০= ৩·৩৪
প্রদত্ত ভোট	—	৩৫৯৭৮৮

লোকসভা নির্বাচন—১৯৭৭
কোচবিহার (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৫৯৫৭৮৯

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৬৩·৮১

অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ২২৬৫২১

ব্যবধান—১০২৮৫৮ ভোট

বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী—কংগ্রেস — ১২৩৬৬৩

লোকসভা নির্বাচন—১৯৮০
কোচবিহার (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭০৮৮৯০

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৭২·২০

অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান—ফঃ বঃ (নির্বাচিত) — ৩০৪১৫৮=৫৯·৫

ব্যবধান—১১৮১৪৬ ভোট

অম্বিকাচরণ রায়—কংগ্রেস-ই	—	১৮৬০১২=৩৬·৪
ধর্মনারায়ণ বর্মা—লোকদল	—	১১৫৩২= ২·২
দুর্গাচরণ রায় কায়েত—আমরা বাঙ্গালী	—	৬৭৫২= ১·৩
পরেশ বর্মণ—জনতা	—	২৮০৯= ০·৫
সুরেন্দ্রমোহন রায়—কংগ্রেস-সং	—	৬০৯= ০·১

লোকসভা নির্বাচন—১৯৮৪

কোচবিহার (তপঃ) কেন্দ্র

মোট ভোটার—৭৭৭০২৪

প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার—৮৫'০৫

অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান—ফঃ বঃ নির্বাচিত	—	৩৪৫১৬০=৫২'২৩
ব্যবধান—৪৫৫১৭ ভোট		
প্রসেনজিৎ বর্মণ—কংগ্রেস	—	২৯৯৬৪৩=৪৫'৩৪
দুর্গাচরণ রায় কায়েত—আমরা বাঙ্গালী	—	৫৯১৪= ০'৮৯
বাতিল ভোট	—	১০১৪৬= ১'৫৪
প্রদত্ত ভোট	—	৬৬০৮৬৩

কোচবিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ সদস্য

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের ইতিহাস তাৎপর্যময় হইলেও তাহার অবলুপ্তি কাল পর্যন্ত যে কয়জন সদস্য কোচবিহার হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

যতীন্দ্রলাল সিংহ

শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী—কংগ্রেস—স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন কোচবিহার কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত।

উপেন্দ্রনাথ বর্মণ—সদস্য এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান, সময়কাল ১৯৬০ সনের ৫ই জুন হইতে ১৯৭০ সনের ৮ঠা জুন, কংগ্রেস প্রার্থী।

সুধীরচন্দ্র নিয়োগী—কংগ্রেস, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন—কোচবিহার কেন্দ্র হইতে, নির্বাচিত। সময়কাল ১৯৬৪ সনের ৫ই জুন হইতে ৪ঠা জুন, ১৯৭০।

কোচবিহার হইতে রাজ্য সভার সদস্য

রাজ্য সভায় জেলা ভিত্তিক কোন সদস্য নির্বাচনের আইন না থাকিলেও এখন পর্যন্ত কোচবিহার হইতে বিভিন্ন সময়ে যে কয়জন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নরূপ :—

আনছার উদ্দিন আমেদ—কংগ্রেস, ১৯৫৮ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৬৪ সনের মার্চ মাস।

প্রসেনজিৎ বর্মণ—কংগ্রেস, ১৯৭৬ সন হইতে ১৯৮২ সন।

দেবেন বর্মণ—সি. পি. আই (এম), জুলাই ১৯৮১ হইতে ৯ই জুলাই ১৯৮৭।